# একই বৃন্তে

আবুল বাশার

২০-এ, সুকিয়া ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ :
জানুয়ারী, ১৯[illegible]৭

প্রচ্ছদ : কৃষ্ণেন্দু চাকী

বর্ণলিপি : প্রবীর সেন

ছবি : আশিস চৌধুরী

জয় গোস্বামীর উদ্দেশে

## প্রজ্ঞা প্রকাশনের কয়েকটি বই

- বাংলা দেহতত্ত্বের গান
  সুধীর চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত
- আবৃত্তি চর্চা
  উৎপল কুণ্ডু
- দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনচরিত
  মোহিত রায় সম্পাদিত
- সদর-মফস্বল
  সুধীর চক্রবর্তী

## প্রকাশিতব্য বই

- আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়
  সুমিতা চক্রবর্তী

## কথামুখ

আবুল বাশার (জন্ম ১৯৫১) বছর তিন আগে শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় 'ফুলবউ' উপন্যাস লিখে সাধারণ সাহিত্য পাঠকদের চমকে দেয়। সেই সুবাদে প্রাপ্ত আনন্দ পুরস্কার তাকে পরিচিতির পাদপ্রদীপে নিয়ে আসে। সেই থেকে সে আর পিছন ফিরে দেখেনি। লিখে চলেছে নতুন নতুন বিষয়ে। তার কাহিনীর ভাণ্ডার অফুরান, দেখার চোখ উদগ্র। এ তো তার হঠাৎ অর্জন নয়। অনেকদিন ধরে তিল তিল ক'রে গড়ে-ওঠা তার বিশ্বাস আর প্রত্যয়, মেধা আর মনন। জীবনকে এত বিস্তারে দেখেছে বাশার, এত গভীরে, যে তার এক শতাংশও বুঝি এখনও রূপ পায়নি। গ্রাম থেকে মফস্বলের যে উর্ধ্বাধঃ বিস্তার ও বিন্যাস, হিন্দু-মুসলমান দুই অসহায় প্রাণী, নিসর্গ ও ধর্ম— এসবই তার দেখা জানা। প্রগতিবাদী রাজনীতির তত্ত্বদর্শন আর লোকায়ত সমন্বয়ী জীবন, দুটোই তার যাপিত অভিজ্ঞতা। গ্রামিক জীবন-অভিজ্ঞতা আর প্রত্যক্ষ রাজনীতি করার অভিজ্ঞতা তাকে মাটি-মানুষের ঘনিষ্ঠ তাপে ভরিয়েছে। গ্রাম ছেড়ে প্রত্যক্ষ রাজনীতি ছেড়ে সে এখন শাহরিক ও সাহিত্যিক। কিন্তু তার দুর্বার জীবনপ্রণালীর মধ্যেও রয়ে গেছে সেই তরঙ্গিত গ্রামিক চেতনা, সুস্থ অসাম্প্রদায়িক বোধ। আধুনিক তরুণ কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে শৈবাল মিত্র ও আবুল বাশার নিবন্ধও লেখেন। এই তথ্যটুকু দ্যোতক। অর্থাৎ এই দুজনেরই অভিজ্ঞতা ও দর্শন, কাহিনী-ব্যতিরিক্ত কিছু জানাতে চায়। তা ব্যক্ত হয় নিবন্ধে। 'যদিও স্বপ্ন স্বপ্নহীন' নামে বাশারের যে নিবন্ধ গ্রন্থটি আছে তা পড়লে গল্পলেখক মানুষটিকে বোঝা সহজতর হয়। সেখানে সে নাম-নিবন্ধটির এক জায়গায় লিখেছে :

> আমার মস্তিষ্কে আদি ত্রাস লেগে আছে। বন্যাকে ভয়, দাবানল, যুদ্ধকে ভয়। দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে ভয়। গোষ্ঠীরণ দেখে আমি থেঁতলানো ত্রস্ত পশুর মতন পালিয়ে বেড়াই সেই শৈশব থেকে।

এই ত্রস্ত ভীত জীবন বাশারকে সমৃদ্ধ করে। সেইসঙ্গে তার জন্মসঙ্গী ছিল দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্য। তার মনে হয়েছে :

> আমার ধারণা, দারিদ্র্যের চাপে আমার মানসিক গঠন কখনও মানুষের মত সম্পূর্ণতা পায়নি। মানুষ হিসেবে যে আত্মগত সাহস শক্তি

> সামর্থ্য লাগে, নিজেকে পুরোপুরি মানুষ মনে করার জৈব দাবী, দেহ গঠনের জন্য যা যা জৈব উপাদান খাদ্যাভ্যাস থেকে পূরণ করতে হয়, করতে হয় প্রকৃতি ও মাতৃগর্ভ থেকে তা কখনই ষোলআনা পাইনি। মনে হয় আমার দেহে শিরাতন্তু কম, ২০৬ খানা হাড় নেই, রক্তের মাত্রা ঠিকমতো বহে না, মস্তিষ্ক আধুনিক মানুষের মতন ভরাট ও যোগ্য নয়।

অথচ সে বেছে নেয় কথাকারের অনিশ্চিত ও পরিশ্রমী বৃত্তি। কবিতা ছাড়ে, রাজনীতি ছাড়ে, গ্রামও ছাড়ে। নাকি গ্রাম তাকে ছাড়তেই হয়?

বস্তুত যেদিন থেকে ঠিক করে বাশার যে গল্প লিখবে, সংকট সেদিন থেকেই। কেননা তার গল্পের বারো আনা বিষয় হ'লো মুসলমান সমাজ ও ধর্মাচারের স্ববিরোধ। এই বিষয়ে কলম ধরলে আমাদের গ্রামিক অশিক্ষিত-প্রায় শরীয়তী সমাজে কি স্বস্তিতে থাকা যায়? বাশারও স্বস্তিতে থাকে নি। তাকে বহুদিন একঘরে থাকতে হয়েছে নিজেরই সমাজে। কর্মক্ষেত্রে জুটেছে ভ্রূকুটি। এসেছে শাসানি-দেওয়া চিঠি। তবু বাশার লিখেছে 'নাস্তিক'-য়ের মত গল্প, 'ফুলবউ'-এর মত মুসলিম সমাজ কাঁপানো উপন্যাস। আর, অনেকে হয়ত লক্ষ্য করেন নি, আবুল বাশার ত্যাগ করেছে তার ইসলামি নাম, একেবারে প্রথম থেকে। বন্দুর জানি, আবুল বাশারের আগে 'মহম্মদ' অভিধাটি ছিল পারিবারিক সূত্রে। তা যে আর অনেকদিন নেই তার নানা কারণ থাকতে পারে। তবে সবচেয়ে বড় কারণ তার অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মুক্তবুদ্ধির সবলতা। এর পরেও কি বাশারের বলা সাজে যে 'মানুষ হিসেবে আত্মগত সাহস শক্তি সামর্থ্য' তার নেই? তার গল্প কতটা সফল, কতটা কালজয়ী, কতটা সাহিত্য গুণান্বিত সে বিচার না হয় যথা সময়ে হবে, এখন কিন্তু একথাটা জোর করেই বলার সময় এসেছে যে তার গল্প সাহসী ও বিবেকী, জীবনস্পর্শী ও অসাম্প্রদায়িক। মানুষের ভেদবুদ্ধি তাকে ব্যথা দেয়, হননবৃত্তি করে কাতর, দ্বিজাতিতত্ত্ব তাকে কাঁদায়। মেধাবী বাশারের মনে হয়,

> মানুষ মিলন ভালবাসে। নারীতে-পুরুষে মিলন, হিন্দু-মুসলমানে মিলন, উপর তলায়-নিচের তলায় মিলন, ইতরতা আর ভদ্রতার মিলন, চাষার সঙ্গে শিক্ষিতের মিলন, সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ভ্যান গখের মিলন, কালো মানুষের সঙ্গে সাদা মানুষের মিলন, শিখের সঙ্গে

অ-শিল্পের মিলন, সর্বোপরি সৎ গ্রন্থের সঙ্গে মানুষের বন্ধুতা—সেও এক মিলন।

[ শ্লোগান থেকে শ্লোকে। 'রক্তমাংস'-৪, গ্রীষ্ম-বর্ষা ১৯৯০ ]

লেখক হিসাবে বাশারের এই মিলন প্রত্যাশা সর্বস্পর্শী, বিচিত্র এবং বহুমাত্রার সন্দেহ নেই। কিন্তু তাকে লিখতে হয় মানুষের গল্প, তাই ফাঁকি চলে না। বেরিয়ে আসে নানারকম ক্ষত আর চটার দাগ। তার গল্পে দেশকাল ঘনিয়ে আসে। বোঝে সে অসহায় দীর্ঘশ্বাসে যে, মিলনই সবচেয়ে অলীক। বিশেষত কুরাষ্ট্রে এবং ভ্রান্ত ধর্মধারণায়। তার আবার লড়াই শুরু হয়। শংকিত তবু সুনিশ্চিত সেই লড়াই। তার গল্পে তাই আসে মোল্লাতন্ত্রের সঙ্গে মুক্তমন মুসলমান জীবনের লড়াই, শরীয়তের সঙ্গে মারফতী সাধক সাধিকার লড়াই, হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি বজায় রাখার লড়াই। হিন্দু-মুসলমান, শিয়া-সুন্নীর করুণ অন্তর্বিরোধ সে লক্ষ্য করে এবং বুঝতে পারে রাজনৈতিক মানুষরা সব বাতি নিবিয়ে পথে কাঁটা ছড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু 'কাঁটা সরাবার লোক আমরা দেখি না'। সত্যিই কি দেখি না? বাশার নিজেই তো লালন ফকিরের মত বলতে পারেন—

সরাতে পথেরও কাঁটা
হতে পারি যেন ঝাঁটা।

এক দিক থেকে ভাবলে বাশারের গল্প বোঝবার জন্যে কোনোরকম কথামুখ বা ভূমিকার দরকার নেই। কিন্তু বর্তমান গল্প-সংকলনে (যার নাম লেখক দিয়েছেন 'একই বৃন্তে') যে অনুক্ত অভিপ্রায়টি রয়েছে তার ধরতাইটুকু বোঝা দরকার। গল্পগুলি সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী এই কথাটুকু বললেই বোধহয় সবটা বলা হয় না। বাশার আরেক ধাপ এগিয়ে বলেন, 'মানুষের ধর্ম ভাল। ধর্মবুদ্ধি খারাপ। বোধ আর বুদ্ধি তো এক কথা নয়। বোধের মধ্যে থাকে মায়া, বুদ্ধিতে থাকে যুক্তির আস্ফালন।' এখনকার যে ধর্মধারণা তার মূলে মায়া নেই, লেখক বোধহয় সেটাই বোঝাচ্ছেন 'নিশি-কাজল' গল্পে পিসিমার সংলাপে—'হ্যাঁরে! জীবন থেকে সেই মায়া, বাবা বলতেন মায়াবোধি, সেইটে হারিয়ে গেল যে'।

'একই বৃন্তে'-র অন্তর্গত কয়েকটি গল্পে এই সম্প্রীতিবোধ এবং সম্প্রদায়গত পারস্পরিক বিশ্বাসের স্খলনজনিত খেদ আছে। 'নিশি কাজল' গল্পে দেখা যায়, যে জনপদে সান্ধ্য আজানের ধ্বনি শুনে বরাবর পিসি সাঁঝপ্রদীপ জ্বালাতে অভ্যস্ত ছিলেন, সেই জনপদে জাগে অবিশ্বাস ও সংশয়। তার থেকে জাগে ভয়। তাই হত্যা ঘটে। আজান বন্ধ হয়। পিসিও সাঁঝপ্রদীপের সময়ের দিশা হারান। ব'লে ওঠেন 'জীবনের অভ্যাস কী অদ্ভুত দ্যাখ। ভুল হ'য়ে যাচ্ছেরে। আজান পড়বে, প্রদীপ ছোঁয়াব। তাই না? ভুল তো হবেই। ছন্দটা যে হারিয়ে যাচ্ছে রে। সুরটা যে কেটে গেল বাছা!' এমনই সুর কেটে যায় 'জন্মান্তর' গল্পে, যেখানে সুধারাণীর গৃহদেবতার চাল বরাবর ছেয়ে দেয় যুগীন (জাতে মুসলমান) অথচ অন্যের প্ররোচনায় সে কাজে বাধা আসে। কেননা, 'সমাজে নাকি কথা উঠেছে মুসলমানকে দিয়ে দেবী-ঘর বানানো অশুচিতা'। বাশার বলে, 'চোখের মায়া জিনিসটাই আসল। সেটি নষ্ট হলেই মানুষ পাষাণ হয়ে যায়'।

এই অবধি প'ড়ে কেউ যদি ভাবেন, বাশারের গল্পের মূল ভিত্তি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক আর সম্পর্কচ্যুতি, তবে ভুল হবে। মুসলমান সম্প্রদায়ের ভেতরের সূক্ষ্ম বিভাজন ও ভেদরেখা তার রচনায় সমগুরুত্বে উঠে আসে। 'কাসীদ'-গল্পে সিয়া-সুন্নির আত্মবিচ্ছেদ দারুণ নৈপুণ্যে গাঁথা। তেমনি 'অন্য নকসি' গল্পে দেখা যায় মুসলমান ধর্মছুট রুহুল ফকির নির্যাতিত হয় মৌলবী মিজানজীর মৌলবাদী সংকীর্ণতায়। ফকিরের সর্বকেশ রক্ষার গুহ্য আচার ধ্বস্ত হয় বলাৎকৃত ক্ষৌরীকরণে। তার সাধনসঙ্গিনী তনু ধর্ষিতা হয়। তবু অস্খলিত দোতারা আর কাঁথা হাতে ফকির আর তনু নতুন পথে এগোয়। রুহুল বলে, 'ওরা চিরকাল এম্নি করে মেরেছে আমাদের।' বাশার এ গল্পে মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে মানবতাবাদীদের নিঃসঙ্গ কিন্তু অমোঘ সংগ্রামকে জয়ী করেছে।

কিন্তু বাশারের মনে একথাও জেগেছে যে মানুষ কেন খুন করে, কেন অপরাধ করে। 'বড় জোর দুই মাইল' গল্পে গৌরাঙ্গ দারোগার মুখ দিয়ে লেখক বলেন, 'মানুষ যে অপরাধ অন্যায় করছে সবখানি তার নিজের করা নয়। ভগবান বা শয়তান করাচ্ছে, তাও বলব না। মানুষ খুব বিকল আর অসহায় হয়ে, দিশেহারা হয়ে এই সব করছে।' এই বক্তব্যের প্রসারণে, পরের

কথাটা আসে এইরকম যে, 'মানুষ একলা কখনও আপনাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। মানুষের চাই সংঘশক্তি···অথচ মানুষ আজ নিতান্ত একা। গোটা সমাজ তার বিরুদ্ধে চলে গিয়েছে। এই একাকিত্ব ভয়ংকর। মানুষ যে খুন করে, একা হলেই খুন করে। একা হয়ে গিয়ে মানুষ খুন করে ফেলে। ···যে মানুষটা খুন হয়ে গেল, খুন হওয়ার সময় তার নিজের বলতে কেউ ছিল না। সেই একাকিত্ব কী সাংঘাতিক! আবার যে খুন করল, সেও কিন্তু ঠিক ততটাই একা। তারও কেউ নেই। কেউ রয়েছে, ভাবলে মানুষ খুন করতে পারে না। কখনই পারে না।'

তাহলে একাকিত্ব সংকট আনে অথচ যূথবদ্ধতা আনে পারস্পরিক অবিশ্বাস আর নানা ধরণের আত্মখণ্ডন। এর মূলে থাকে ভ্রান্ত ধর্মবোধের পাঁচিল। সেই পাঁচিল কেবলই ভেঙে যায় বাশারের গল্পে। তাই দেখি 'কান্নার কল' গল্পের প্রধান মুসলিম চরিত্রটির নাম সতী। 'দুই অক্ষরের গল্প'-তে নাজিয়া W অক্ষরের বদলে U অক্ষরকে বেছে নেয়। অর্থাৎ স্বধর্মী ওয়াশেফের বদলে হিন্দু যুবক উৎপলকে। মুসলমান ঘরামী যুগীন সুধারাণীর চোখে খুঁজে পায় 'সোলেমানী চোখ' যা নাকি 'মিঠেলি খয়রা'। এইভাবেই ধর্মধ্বজীদের পরিকল্পনা ভেঙে যায়। মাহিষ্য আর মুসলমান লাঠি হাতে মুখোমুখি ফুঁসতে ফুঁসতে হঠাৎ ভুল বুঝতে পারে 'চোত পবনের কেচ্ছা' গল্পে। কিংবা 'চন্দ্রদীপ' গল্পে একজন ফেরারী সন্ত্রাসবাদী কেবলই নাম পাল্টে জনারণ্যে মিশে যায়। চন্দ্রদীপ থেকে রসুল মিঞা, রসুল থেকে মুরারি। নাম যেন খোলস। সেখানে ধর্মের বিভাজন নেই, বিশিষ্টতাও নেই। কেননা একজন পলায়মান ত্রস্ত ফেরারি, আসলে, বাশারের চোখে, 'জাতিধর্মগোত্র হীন মানুষ। গৃহহীন। পথহারা'। তাই ব'লে মুসলমান ধর্মের আভ্যন্তরীণ বিরোধ বিদ্বেষ চোখ এড়ায় না লেখকের। 'অন্য নক্সি' গল্পে জানা যায় নানা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বার্তা। ফরাসী (ফরাজী?) আর হানাফীদের বিবাদ, একবারে তিন তালাক আর তিন মাসে তিন তালাকের মর্মভেদী তফাৎ। জুম্মাবারে মসজিদে এক আজান না দুই আজান, মাথার টুপি গোল না চৌকো, মৃতদেহ কবরে কাত হয়ে শোবে না চিৎ হবে -- বিসম্বাদ তা নিয়েও। সেই বিবাদ থেকে ঘর পোড়ে। মাথায় ঘোল ঢালা হয়, মুণ্ডুপাতও হ'তে পারে।

এত সব দেখিয়েও বাশার তাঁর যুগীনের মুখ দিয়ে শেষকালে বলেন, 'সর্বাঙ্গ মুসলমান, সর্বাঙ্গ হিন্দু কোথাও তুমি পাবে না। জন্মের উপর খোদার হাত। আমরা সব মিশেলি মানুষ দিদি।' আবুল বাশার তার সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী গল্প শুনিয়ে মানুষের এই বিচিত্র মিশেল বা মিশ্রণের নানা অনুপাত আমাদের দেখান। কেননা সে আসলে ভেতরে ভেতরে মানুষভজা।

সুধীর চক্রবর্তী

গল্পক্রম

# চন্দ্রদীপ

চন্দ্রদীপ বিপ্লবী-জীবনের সেই গল্পটি জানত। একদা এক বিপ্লবীর নামে এক দেশের সরকার হুলিয়া বার করে যে, অমুক লোকটির মাথার দাম পঞ্চাশ হাজার টাকা—তাকে জীবিত অথবা মৃত যে কোন অবস্থায় ধরে দিতে পারলে ওই পরিমাণে টাকা ইনাম মিলবে। এরকম হুলিয়া কত হয়। ডাকাতের বেলায় হয়, বিপ্লবীর বেলাতেও হয়। তা মিঃ জেডের বেলাতেও সেই ধারা হুলিয়া জারি ছিল। ধরা যাক সেই বিপ্লবীর নাম মিঃ জেড।

মাথার উপর পঞ্চাশ হাজার টাকার হুলিয়া—জেড তখন দেশ ছেড়ে গোপনে সীমান্ত পার হয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আত্মগোপন করার জন্য পাড়ি দিয়েছে। সীমান্ত এলাকায় সীমান্তরক্ষীদের কড়া পাহারা মোতায়েন। কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্র বলে সীমান্ত ডিঙনোর বিরাম নেই সাধারণ জনের। রক্ষীদের উপর কঠোর নির্দেশ আছে, সাধারণ আদমি হলেও সবারই যত্ন করে বডি সার্চ করতে হবে। গরুর দালাল হলেও তার মাথার পাগড়ি সার্চ করতে হবে। সেই সময় বিপ্লবীরা প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র শরীরের তলে গোপনে আড়াল করে রক্ষীদের চক্ষু ফাঁকি দিয়ে পারাপার করত। দেহ তল্লাশি করে ধরা পড়েছে অনেক। জেড যখন পার হচ্ছে, ওকেও পাকড়াও করল রক্ষীরা, তারপর সার্চ করল আগাপাশতলা। শেষে শুধালো, কিছুই তো দেখছি নে, কী ব্যাপার তুমি চোর নও বটে, তবে দেশদ্রোহী নিশ্চয়।

জেড সঙ্গে সঙ্গে বলল—আমি কী তা জানি নে। তবে চোর অবশ্যই। একটা জিনিস বহে নিয়ে যাচ্ছি, সেটা তোমরা সার্চই করলে না।

রক্ষীরা হই হই করে উঠল—কী? কী জিনিস সেটা?

জেড তার মাথাটার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল—এটা

রক্ষীরা তখন দাঁত বার করে হাসতে লাগল। ভাবল, লোকটা বদ্ধ পাগল। ওকে ছেড়ে দিলে ওরা।

জেড তখন তার পঞ্চাশ হাজার টাকা দামের মাথাটা নিয়ে সীমান্ত পার হয়ে গেল। সেই মাথার দাম কত কে জানে! শুধু ইনাম ছিল পঞ্চাশ হাজার। দিনে দিনে সেই পরিমাণও বেড়ে যাচ্ছিল। এক লাখ। দেড় লাখ। দু'লাখ। জেড জানত, সে মিথ্যেও বলেনি। অথচ রক্ষীরা তাকে পাগল ভেবেছিল।

একজন বিপ্লবী তার সারা জীবন একটি আশ্চর্য উন্নত মস্তিষ্ক বহন করে। চন্দ্রদীপ সে কথা জানত। গল্পটিকে তার এক মুহূর্তের জন্যও ভোলবার জো ছিল না। কারণ সেই সময় সে এবং তার মস্তিষ্ক—এ ছাড়া আর কেউ নেই। মাথার উপর হুলিয়া আছে। সবখানে পুলিশ আর সরকারী গোয়েন্দার সতর্ক চক্ষু তাকে তাড়া করে ফিরছে।

এখন চন্দ্রদীপের কাছে মিঃ জেডের গল্পটি ছাড়া আর কোনই গল্প অবশিষ্ট নেই। তামাম সংসারের সঙ্গে তার সমূহ প্রত্যক্ষ যোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এমনকি পার্টির কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে, কোন লোকাল কমিটির সঙ্গেও তার যোগ নেই। সব ছত্রভঙ্গ, দর্পণ চূর্ণের মত শতধা তার পার্টি। সেই খণ্ডচূর্ণ দর্পণে মুখ দেখার গ্লানি জমছে। দিনে দিনে। পার্টি এত ক্ষুদ্র খণ্ডে ভাঙা যে তাতে ফলিত হয় না নিজেরই মুখচ্ছবি, দেখা যায় না কিছু। আদর্শের ভিতরে কি কোথাও কোন এভাবে ভেঙে পড়ার উপাদান জোড়া ছিল?

চন্দ্রদীপ যেন এক মরুযাত্রী। তার পিছনে পিছনে আসছিল মরুযাত্রীর দল, উটের শ্রেণী, কাফেলা। অনেকটা পথ অতিক্রম করার পর হঠাৎ কী মনে করে সে পিছন ফিরে দেখল, তারা কেউ নেই। শুধু ধুলো। পিছনে ফেলে আসা দিগন্ত অবধি ছড়ানো ধুলোয় আচ্ছন্ন পথ। হঠাৎই চন্দ্রদীপ চমকে উঠল। এই ধুলো তার একার পায়ের আঘাতে পথ আর দিগন্ত ভরে তুলেছে, আর কেউ নেই। ছিল যে তার কোন চিহ্নই তো দেখা যায় না।

অথচ নিজেকে এরকম সঙ্গহীন না ভেবে সে আর কী করবে? তবে মিঃ জেডের গল্পটি তো রয়েছে, একমাত্র সঙ্গী। একখানা তীব্রধার অস্ত্রের মত। মরুপথের উদ্যান যেন। ক্রমাগত একটি জলের উৎসের মত গল্পটি জীবনকে তাজা করে রেখেছে।

গল্পটি যতদিন তার নিজের কাছে আছে, ততদিন সে ধরা পড়বে না। এই দৃষ্টান্ত তাকে এতদূর চালিয়ে এনেছে। তার বিশ্বাস সে আবার যোগাযোগ করে উঠবে নেতৃত্বের সঙ্গে। এখন সে যে-এলাকায় রয়েছে এই চর

এলাকায় জনবসতি কম, ওদিকে একটা পুলিশ ফাঁড়ি আছে বটে, কিন্তু ওদের লক্ষ্য চোরামাল চালান এবং সীমান্তের ওপারে গরু চালানের দিকে। বি. এস এফ -রা ওইখানে বাঁশের মাচায় বসে চা খায় সকাল বিকাল।

এখানে তার নাম রছুল মিঞা। খেতমজুর। চন্দ্রদীপ লুঙ্গি পরে, পায়ে টায়ারের চটি পরে, বেনিয়ান ধরনের জ্যাকেট গায়ে দেয়, ঘাড়ে গামছা। মুখে দাড়ি, খাটো করে ছাঁটা, গোঁফ কামানো।

—বাজার বাগু কে যায় হে?

—জী। রছুল। রছুল মিঞা যায়। সাকিন নলবাট্টা। মহকুমা নালবাগ। থানা কাপাসডাঙা।

—ওহো! নলবাটার রছুল, তাই কও। বলি কি বাপজী, নলকে লল, লালকে নাল কইলেই কি চাষী হওয়া যায়? খুব সাবধান, এ তোমার কঠিন মজদুরি লালবাবু। মাছি লাগতে দেরি নাই, হাওয়া খারাপ। ঘন ঘন কালো গাড়ি খেয়া মারছে গো।

এ জীবন যে কঠিন মজদুরি সন্দেহ কি। একজন খেতমজুর সেজে কালপাত করা রছুল মিঞা আসলে রক্তাক্ত বিপ্লবে বিশ্বাসী এবং সে যে বাবু সম্প্রদায়ের লোক, মানুষ তা বোঝে। বোঝে এবং আদরও করে। থাকবার জন্য মাটির কোঠাবাড়ির উপরতলার একটি ঘর তাকে দিয়েছে; ওই বাড়ির মেয়েকে ইচ্ছে করলে শাদি করে সে এখানে বসত বানাতেও পারে—এ রসিকতাও কোন কোন মুরুব্বি চালু করে দিয়েছে। ইতিহাসে লেখা হয়, এ দেশের এইসব বিপ্লবীরা জনসাধারণের মধ্যে কখনও মিশে যেতে পারেনি। মাছ যেমন জলের ভিতর থাকে, বিপ্লবী থাকবে জনগণের ভিতর। মা-ও-জে-দঙ-এর এই উপমা বিফল হয়েছে, কিন্তু সর্বত্র নয়। চন্দ্রদীপ মনে করে, সে এখন রছুল।

মনে করাই নয়। এ তার বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। রক্তের মত সত্য। যদি সে এখনও চন্দ্রদীপ থেকে গিয়ে থাকে, তাহলে যতটুকু এখনও সে চন্দ্রদীপ ঠিক ততটাই সে ব্যর্থ। এই ব্যর্থতা মেনে নেওয়া তার পক্ষে রীতিমত যন্ত্রণার।

এতক্ষণ তাকে মাছি লাগার ভয় দেখিয়ে, কালো গাড়ির খেয়া মারার দুঃসংবাদ পেশ করা বৃদ্ধলোকটি যে বকবক করছে, তার কাছে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় চন্দ্রদীপ। বৃদ্ধের মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে বলে—হেই নগেন দাদা, শুনছ? আমি বাবু লই গো!

বুড়ো মানুষটি চোখে ভাল দেখে না। চৌকা মাচায় বসা, থুতনিতে ধরা বাঁশের লাঠি, ঘাড় মৃদু দোলায়—হাঁ বাবা। নও বটে।

—তা হলি কও কেনে শুনি!

—আর ক'ব না। এই তোমার তিন কিরা শিবের নামে, তিন কিরা কৃষ্ণের নামে, তিন কিরা নবীর নামে, মা ফতেমার নামে তিন কিরে বাপ! এই তোমার তিন তিরিখি ন' আর তিন সত্যি, বারো দফা সত্যি কাটলাম ভাই—ক'ব না। তুমি যে মাটি চষা বাবু, আমাদের স্নেহ কর জানি। দ্যাশে কি বিপ্লব হবে রহুল ভাই? কত জান নষ্ট করলে তোমরা! কত মাথাঅলা সোনার চাঁদ ছেলেরা বলি হয়ে গেল!

—তবু আমায় বাবু বলে ডাকছ নগেন দাদা!

—বেশ বেশ। আর ক'ব না। ঝিঙেদহর মোড়ে তোমার পানা এক কমরেডকে গুলি করল পুলিশ, কোন কারণ নাই। কোন কৈফিয়ত নাই। দুজনকে ফাটকে ভরল, পেটালো, মেরে ফেলল। এই সব ছেলেদের মা বাবা ছিল, সংসার ছিল। সেসব কোন ঠিকঠিকানা থাকল না।

—জনগণই যার ঠিকানা, তার আর সংসার কিসের! মৃত্যুর টিকিট না কাটলে এই দলে ঢোকা যায় না। সেই হল তোমার এন্ট্রি-ফি। এভাবে না মরলে তোমরা আমাদের বিশ্বাস করবে কেন? যখন দলে এসেছিলাম তখনই একটা শপথ করেছি, আমার মধ্যবিত্ত পরিবারের বাপ মায়ের দেওয়া রোমান্টিক নামটা ভুলে যাব। কবিতার মত সুন্দর আমার একটা নাম ছিল। তার একটা মায়া আছে। এই মায়া কিন্তু সত্য নয়। সেটা তখনই প্রমাণিত হবে যখন আমি রহুল হতে পারব। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যদি প্রমাণ করা যায় তাহলে মরেই তা প্রমাণ করতে হবে। এই চ্যালেঞ্জ নিজের কাছে। প্রমাণ তো একটা চাই যে ছেড়ে এসেছি এবং মিলিত হয়েছি। 'ছেড়ে এসেছি' ভুলতে না পারলে, মিলেছি বা হয়েছি বলা যায় না। আমি তো রহুল হতে পারিনি নগেন দাদা। সে কথা তোমরাই ভাল বোঝো।

—ভাই রহুল! বলতে গিয়ে এবার বৃদ্ধের গলা ভারী হয়ে কেঁপে গেল।

চন্দ্রদীপ আর সেখানে দাঁড়ালো না। 'রহুল' নামটির ভিতরে সে এখন নিজেকে যাপন করছে। যাপিত এই নামটির ভিতরেই রয়েছে তার চাষী-জীবনের অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতার চেয়ে সত্য কিছু নেই। এ কোন কেতাবি সত্য নয়। এ যে হয়ে ওঠার সত্য। যেদিন চন্দ্রদীপ বুঝবে সে বাস্তবিক হয়ে উঠতে পেরেছে, তখনই তার জীবনের লক্ষ্য পূর্ণ হবে। দেশে বিপ্লব না হলেও তার যাপিত জীবন ব্যর্থ হবে না। বিপ্লব একটি বড় ঘটনা এবং তা ইতিহাসের সত্য। কিন্তু চন্দ্রদীপ যখন রহুল হয়ে ওঠে, এ তার নিজেরই ভিতরের সত্য, তাই-ই আসলে বিপ্লব। ইতিহাস যদি সেই হয়ে ওঠার খোঁজ না রাখে তাতেও একজন ব্যক্তি ব্যর্থ হয় না। এই হয়ে ওঠার আনন্দ আছে। আর সেই আনন্দই সার্থকতা। কেবল মন যেন বলে উঠতে পারে,

চন্দ্রদীপ তুমি হতে পেরেছো। ওই একটা ঘোরের মধ্যে থাকা, তা যেন এক তীব্র সংগীত, যেন অবধিহারা সুরের দিগন্ত স্পর্শ করার মত পাল্লা—চন্দ্রদীপ চলেছে তো চলেইছে।

কিন্তু তার আগে সবকিছু এভাবে ভেঙে পড়ছে কেন? দল টুকরো হয়ে গেল। সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। সব সরে গেছে কত দূরে। আজকাল শুধু দুটি দৃশ্য তার চোখের উপর ভেসে ওঠে। সেই দুটি দৃশ্যের আড়ালে ছিল তার পরীক্ষা।

একান্তে এখনও তার মাকে মা বলে আপন মনে নিঃশব্দে ডেকে উঠতে মন চায়। চন্দ্রদীপ এখন চরের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে।

হাঁটতে হাঁটতে চরের ফাঁসিতলায় এল। এখানে এসেই সে একা বসতে পারে। একটা ডোবা মতন, এখানকার মাটি এঁটেল, চারদিক ঘিরে বাবলা তাল খেজুরের সারি, নানা রকম লতাগুল্মের ঝোপ, কাশের শক্ত গোড়া জলের কাছাকাছি, ব্যায়না ঘাসের গোড়ালির চাপ ডোবার পাড়ে, জায়গাটা শীতল আর ভয়ানক নির্জন। ফাঁসিতলা নাম শুনেই গা ছমছমায়। ডোবায় জল আর কাদা। তবে ঘোলা খুব নয়।

এখানে কার ফাঁসি হয়েছিল কেউ জানে না। কেন হয়েছিল তারও কোন হদিস নেই। তবে নামটাই বিদঘুটে। কিন্তু চন্দ্রদীপের মনে ভয় নয়, ভর করে গভীর নির্জনতা। কোন শোক, কোন যন্ত্রণা থেকে নয়, এমনকি স্পষ্ট কোন হতাশাও নয়—সে আসে অকারণ। এসে চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে। যেন নির্জনতারই একটা নিজস্ব পীড়ন আছে। সে অস্ফুট ডাকে—মাঃ মা গো!

কেউ শোনেও না। কেউ দেখেও না। ডাকতে ডাকতে চন্দ্রদীপের মনে এক ধরনের আরাম প্রলিপ্ত হয়—এ যেন একটা যোগাসন তার। অলৌকিক কোন দেবীকে নয়, মাকে পাওয়া। সে আপন মনে বোঝাপড়া করে দেখেছে, এরকম ডাকাডাকির সঙ্গে বিপ্লবের কোন বিরোধ আছে কি না! মনটাকে তার বাজিয়ে বাজিয়ে দেখেছে—এ কি তার পিছুটান! তার কি ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করে!

সে জানে, সেসব কিছু নয়। ঘরে ফেরার প্রশ্নই ওঠে না। ঘরে ফেরাও যায় না। ফিরলেই পুলিশ হানা দেবে। ধরে নিয়ে যাবে। একবার সে ধরা পড়েই যাচ্ছিল। তখন সে মুরারি নাম নিয়ে বিড়ির কারিগরদের সঙ্গে রয়েছে জিতেনপুরে। সেই সময় সে বিড়ির মুখ বাঁধত, হাজার প্রতি চারআনা। রুপোর পাতি দিয়ে মুখ আর পশ্চাত মোড়ানো চাকরি। পাতি মানে খড়কে মত একটা কাঠি। তাই তার জীবিকা, তার জীবন। একটা সামান্য কাঠির উপর বেঁচে থাকা যে কী, তা সে দেখেছে। দশ আনা পয়সা কামাতে দাঁড়া

কনকন করত, দেহের খাঁচা দুমড়ে যেত, গাঁটে খিল ধরে যেত। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডাকত—মা। মা গো!

এই ডাক সে কারিগরদের কাছে পেয়েছিল। ওরা একঘেয়ে কাজের নির্জন ফাঁকে ফাঁকে রামপ্রসাদী গায় আর মা মা করে। তাদের বুকে যক্ষ্মা। স্যাঁতসেতে ঘর, হেজে ওঠা পাতা জড়ানো চটের বাণ্ডিল। ঠিক যেন তাদেরই হৃদয়। দেবী-মাকে ডাকে ওরা। ওরা সন্ধ্যায় কুপি জ্বালে। একটা কুপি আর দুখানি হাত। বড়জোর সেই কাঠিটা। যেন তা দিয়ে জীবনকেই গুঁতোচ্ছে।

মেটে সেখ ওর পিঠে হাত রেখে বলল—কেবলই মা মা করছ, যাও একবার মায়ের কাছে থেকে ঘুরে এসো। এত মা ডাক ভাল নয়। আমার দুইখানা বউ, একটা মায়ের মত, অন্যটা বোনের মত। তোমার তো সেসব কিছু নেই।

মেটের দুই বউ। একটা হিন্দু, সিঁদুর পরে। অন্যটি পরে না—সেটি মুসলমান। একথা বিদিত। কিন্তু একটি যে মায়ের পানা, অন্যটি বোনের মত, সেকথা সেই প্রথম শুনল। এমন উক্তি জীবনে একবারই সে শুনছে। মেটে ছিল সেয়ানা দার্শনিক। নারীর কাছে থেকে সে মায়া চাইত আর বলত ওরা তো মায়াবী। দুটি বউ করার যুক্তি ছিল অদ্ভুত। একটা মারলে আরেকটায় রাখবে। একটা যদি রাক্ষুসী হয়ে ওঠে, অপরটি স্নেহ করবে। নারীর ওপর বিশ্বাস যেমন ছিল, ঘোর অবিশ্বাসও ছিল। জীবনের এমন চেহারা কোথায় আর দেখতে পেত চন্দ্রদীপ! দুই সতীনে কখনও বিবাদ হতে দেখেনি। ছোট বউ বিড়ির সুতো পাকিয়ে রোল করতে পারত না। সেটাই আসল কারিগরি। চন্দ্রদীপও পারত না। ছাঁচে পাতা কাটা আর মুখমারা—এই ছিল ছোট বউ আর তার মজদুরি।

মেটে বলত—দু'জনে কাটামারা করো। আমরা জড়াচ্ছি আমরা মারকাট করে বেরিয়ে যাব। বড় বউ ছিল শ্লথ। স্বামীর কাছে মার খেত। কাজে ফাঁকি ছিল না। কিন্তু মার খাওয়াটা ছিল ভাগ্য। সকাল বিকাল লাল চা দিয়ে কয়েদ রুটি ছিল খাদ্য। মধ্যরাতে পাতা কেটে কোমর ভেঙে যেত। প্রচণ্ড ঘুম পেত তখন ছোটবউ রান্না চড়াত ভাত, ভর্তা, তরকারি।

মেটের কথা শুনে চন্দ্রদীপ মাকে দেখতে গিয়েছিল। মা ছিলেন সেদিন প্রতিবেশীর বিয়ে বাড়িতে। চন্দ্রদীপ ভাবল, এই সুযোগই শ্রেয়। ভিড়ের ভিতর মাকে দেখবে। কথা বলবে। মাকে স্পর্শ করবে। মা কান্নাকাটির সুযোগ পাবেন না। মাকে দেখার আগে মা-ই তাকে দেখতে পেলেন ভিড়ের মাঝখানে, থইথই করা বিয়ে বাড়ির গন্ধ বর্ণময় উল্লাসের ভিতর। মা ডেকে উঠলেন—চন্দ্রদীপ!

ঠিক তখনই পুলিস ঢুকল সেখানে। কে একজন মায়ের কানের কাছে চাপা গলায় বলল—পুলিস কেন মাসিমা!

বলতে না বলতেই মাথায় ক্যাপ-পরা, হাতে রুল নাচানো এক ধূর্ত অফিসার মায়ের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ঈষৎ কড়া গলায় যেন উৎসাহ দিচ্ছেন এমন স্বরে বললেন ডাকুন মা! ছেলেকে ডাকুন! ভয় করবেন না। আমরা কথা বলব, চলে যাব।

মা বুঝলেন, কথা বলা নয়, পুলিস তাঁর ছেলেকে ধরতে এসেছে। এই সময় চন্দ্রদীপ তার মাকে দেখতে পেল। মায়ের বুক ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। মনে মনে বললেন, চন্দ্রদীপ, বাবা তুমি কাছে এসো না!

তথাপি ডেকে উঠতেই হল—চন্দ্রদীপ!

চন্দ্রদীপ মায়ের কাছে এসে প্রণাম করল। তারপর ঘাড় তুলে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। হাসিখুশি মুখে বলল—আমি চলে যাচ্ছি মাসিমা। আমি মুরারি। জিতেনপুরের মুরারি। চিনতে পারছেন না? একবার সাগরপাড়ার কাঁচা রসগোল্লা এনে দিয়েছিলাম, চন্দ্রদা চেয়েছিল। আপনি ভুলে গেছেন দেখছি। থাক। চলি!

বলেই পুলিসের পাশ দিয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল চন্দ্রদীপ। অফিসার বললেন – আবার ডাকুন ছেলেকে!

মা ডাকলেন—চন্দ্রদীপ! তারপর হাইমাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

মুরারি ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল মুহূর্তে। পার্টি অফিসে পৌঁছতেই নেতা বললেন—তুমি কমপ্লিট মুরারি হয়েছ, এবার কাজ শুরু কর।

অথচ আজও সেই সংশয় ঘোচেনি সে সত্যিই হয়ে উঠতে পেরেছে কি না! চন্দ্রদীপ ডোবার জলে মুঠো করে একটি ঢিল ছুঁড়ে মারে। সঙ্গে সঙ্গে তার তার ভেতরটা মা মা ওঠে। মাকে এভাবে ডেকে ওঠার মধ্যে কী যে কামনা রয়েছে বোঝা যায় না! মনে হয়, এভাবে ডাকা ঠিক নয়। আসলে মুরারি বা রছুলের কোন মা নেই। মা বলে ডেকে উঠতে পারত চন্দ্রদীপ। এই চন্দ্রদীপ কতদিন আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। সেই নামে কেউ তাকে ডাকে না। নিজেই সে নামটি ভুলে গেছে। একটি নাম যদি দীর্ঘকাল ব্যবহৃত না হয় এবং ওই নামের ওপর যদি সকল মায়া শেষ হয়—এমনকি ওই নাম বলা বারণ থাকে; ভয়ানক পাপ বা অন্যায় বলে মনে হয়, তাহলেও কি সেই নামের অস্তিত্ব থাকে কিছু?

তাকে দল নানাভাবে পরীক্ষা করেছিল। বলেছিল—নিজের নামটি মানুষের এত প্রিয় যে, হঠাৎ প্রচুর ভিড়ের মধ্যে চলতে চলতে মনে হয়, কে যেন নাম ধরে ডাকছে।

প্রিয়নাথ নামে এক নেতা তাকে বুঝিয়েছিলেন—কে যেন নাম ধরে ডাকছে মনে হয় বটে, কিন্তু চারিদিকে অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখার পর, আঁতিপাতি খোঁজার পর, দুচার দণ্ড, দশ বিশ দণ্ড অপেক্ষা করার পর বোঝা যায়, কেউ নেই। কোথাও কেউ নেই। কেউ আমায় ডাকেনি। কিন্তু আমি স্পষ্ট শুনেছি, আমার নাম ধরে ডেকেছে একজন। সেই একজনকে কখনও খুঁজে পাওয়া যায় না। খুব যারা 'সেন্সিটিভ' তাদের মনে হয়, আমি নিজেই কি নিজের নাম ধরে ডেকে উঠলাম তাহলে? না। আমি তো ডাকিনি।

প্রিয়নাথের চশমার আড়াল থেকে চোখ দুটি অস্বাভাবিক জ্বলজ্বল করছিল। আজও সেই তীব্র চোখ মনে পড়ে। বর্শার মত তীক্ষ্ন সেই চোখ। যেন বিদ্ধ করে, গেঁথে রাখে আদর্শের কেন্দ্রে। তিনি বলেওছিলেন—এমন কেন হয়? এর উত্তর যাই হোক। মনে রাখবে এই একজন যে তোমায় ভিড়ের মধ্যে ডেকে ওঠে অথচ সামনে আসে না—একদিন পুলিস তোমায় এইভাবে ডেকে উঠতে পারে।

কথা শুনতে শুনতে চন্দ্রদীপের বুকের ভেতরটা ধক করে উঠেছিল অকারণ। প্রিয়নাথ বলেছিলেন। এইভাবে আমাদের অনেক কমরেড ধরা পড়েছে। মনে রাখবে সমস্ত ডাকই পিছুডাক, কখনই সাড়া দেবে না। এই এক ভয়ানক সময়, যে-কোন মুহূর্তে তুমি ধরা পড়ে যেতে পার। তোমায় পরীক্ষা করা হবে।

চন্দ্রদীপ সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তাকে পরীক্ষাও দিতে হয়েছে। সে বলেছিল—আমি তো পরীক্ষা দিয়েছি। আমি এখন মুরারি। মা আমায় ডেকেছিলেন, আমি সাড়া দিইনি। এরপরও কি কোন পরীক্ষা আছে?

—হ্যাঁ আছে। সেদিন তুমি জানতে, মা তোমায় ডাকছেন। কে ডাকছে জানা থাকলে চুপ করে থাকা সহজ। কিন্তু সেই যে একজন তোমায় ডাকবে, সামনে আসবে না, মনে রাখবে এইই তোমার শত্রু। পুলিসের লোক এমনভাবে ডাকবে যে তুমি টের পাবে না যে তুমি ধরা পড়ে যাচ্ছ। মুরারি নামটাও এবার তোমায় বদলে ফেলতে হবে। গোয়েন্দা বিভাগ এই নামও সন্দেহ করেছে···প্রিয়নাথ গম্ভীর মুখে বলে সেদিন আর দাঁড়ালেন না। তারপর আর প্রিয়নাথের সঙ্গে দেখা হয়নি।

আবার একটি ঢিল ছুঁড়ল জলে। রছুল সেখ জলে ঢিল ছুঁড়ে মেরে শিউরে উঠল। ডোবার ওপারে ওটা কী? তার সমস্ত শিরদাড়া প্রথম শক্ত হয়ে উঠে একটা হিম স্রোত বইয়ে দিল। পায়ে পায়ে রছুল এগিয়ে গেল। মৃত দেহটির উপর ঝুঁকে এল সে। উপুড় হয়ে পড়ে আছে। রছুল দেহটিকে চিত' করে দেবার পর ভয়ানক চমকে উঠল। মেটে সেখের মৃতদেহ এখানে এভাবে পড়ে আছে কেন?

রছুল আর দাঁড়ায় না। দ্রুত ফাঁসিতলার ডোবা ছেড়ে কোঠা বাড়ির দোতলায় চলে আসে। বুঝতে পারে, রছুল নামটাও তাকে বদলে ফেলতে হবে। নাম বদলানো মানে স্থান বদলানো। আবার তার অন্য কিছু, অন্য কেউ হওয়া।

রাত্রে শুয়ে ঘুম আসে না রছুলের। তারই আদর্শের ছোঁয়ায় মেটে জিতেনপুর এলাকায় দলের নেতৃত্ব গড়ে তুলেছিল। বিড়ি বাঁধা অত্যন্ত সাধারণ একজন মানুষ কত যে বদলে গিয়েছিল! বিড়ি শ্রমিকের ভিতর তার প্রভাব কম ছিল না। অনুমান করা কঠিন নয় যে পুলিস তাকে ডেকেছিল।

নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়েছে। মুখের উপর শক্ত কিছু দিয়ে আঘাতের দাগ। মনে হয়, রছুলকেই কোন সংবাদ পেঁৗছে দেবার জন্য চর এলাকায় এসেছিল। অথবা যেকোন কারণেই হোক সে বাড়ি ছেড়ে এসেছিল। রছুল ঠিক করল, সে আর রছুল নয়। সে এখন থেকে জয়দেব পরামানিক। সাকিন নিমগাঁ।

বৃদ্ধ তাকে ডাকল—কে যায় হে বাজার বাগু?

—আজ্ঞে জয়দেব যায়। নিমগাঁয়ের লোক।

বৃদ্ধ অবাক হল। রছুল কাছে এসে বলল—যাচ্ছি। চলে যাচ্ছি নগেন দাদা। আর দেখা হবে না।

বৃদ্ধের দুটি নির্জীব চোখ সহসা ঝাপসা হয়ে উঠল। গলা কেঁপে গেল—রাত্রে কালো গাড়ি এসেছিল। বললে, এ গাঁয়ে নতুন কোন লোক এসে রয়েছে, নাম ধরুন মুরারি কি মেটে সেখ? বললাম, কে তার তালাশ রাখে বাবু। তা মুরারি বলছেন, মেটেও বলছেন, কে কাকে চান? পুলিস বলল, আসলে একই লোক, দু'রকম নাম। বললাম, এ গাঁয়ে এধারা নাম নাই। প্রশ্ন করল, তাহলে চাঁদদীপ নামে কেউ···ইয়ে চাঁদ নয় নগেন দাস, বললে পুলিস, চন্দ্রদীপ নামের একজন কি এসেছে? বললাম, অত ভাল নাম এখানে কেউ রাখে না। দারোগাবাবু। তখন গাড়িটা আর দাঁড়াল না। সামনে কালোগাড়ি, পেছনে জিপ···

জয়দেব আর শুনতে চাইল না। বাসস্ট্যান্ডের দিকে হাঁটতে শুরু করল। দ্রুত।

একটার পর একটা নামকে অতিক্রম করেছে সে। জয়দেব নামটিকেও ছেড়েছে অতঃপর। মেটে আর মুরারি যে একই ব্যক্তি এই এক চরম যন্ত্রণা তার বুকে রইল। মৃত্যুকেও অতিক্রম করল সে: মনে হল এরপর সে কী করবে? মেটের দুটি বউয়ের মুখ মনে পড়ল। একটি বোনের মত, অন্যটি মায়ের মত। সেই মায়াবী নারীদের মেটে ছেড়ে গেছে ডোবার জলের কাছে কাশবনে। কে যেন ডেকে উঠল তাকে।

কে যেন ডাকল—মিস্টার জেড ! ও মিস্টার ? শুনছেন ? সেদিন বাসের জানালা দিয়ে বাইরে চেয়েছিল সে। সহসা চোখে পড়ল একটি পুলিশ-জিপ পাশে পাশে চলেছে। দারোগার পাশে বসে আছে নগেনদাদা। মিঃ জেড বুঝতে পারছিল, নগেনকে সঙ্গে নিয়ে চলেছে জিপটা। নিশ্চয়ই তাকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য নগেনকে পুলিস ব্যবহার করতে চাইছে। সে অতএব জানালার দিক থেকে মুখ টেনে উল্টো দিকে চাইল।

এখন বাসটি জিতেনপুরের উপর দিয়ে চলেছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সদর শহর এখান থেকে মাত্র সাত মাইল। পাকা সড়কের পাশের গাঁ জিতেনপুর। হঠাৎ সে বাসের ঘণ্টা বাজানোর দড়ি ধরে টেনে দেয়। বাস থামে। বাস ছেড়ে যায়। বাস এবং জিপ সদরের দিকে চলে যায়। যখন সে নামে, জিপটা কিছুক্ষণের জন্য সামনে এগিয়ে গিয়েছিল ! জিপের যখন খেয়াল হবে, বাসের লোকটি নেই, তখন কী হতে পারে ? নিশ্চয়ই রাত্রে মেটের বাড়ি হানা দেবে। তথাপি মিস্টার জেড নেমে পড়েছে। সূর্য ডুবে যাওয়ার রক্তিমা চোখে পড়ে।

সে এসে ভয়ানক কালো বিশালবপু বকুলগাছটির তলায় দাঁড়ায়। কী করবে স্থির করতে পারে না। সন্ধ্যা ঘনাল ক্রমশ কালো গাছটার মত গাঢ় হয়ে আসা স্তব্ধতায়। জোনাকি উড়তে লাগল। জেড শিথিল পায়ে মেটের বাড়ির কুপির আলোর দিকে এগিয়ে চলল।

মৃদু শীতের রাতে কামিনী ফুল ঝরেছে পথের উপর। তা মাড়িয়ে মাড়িয়ে এল মুরারি। হঠাৎ তার মনে হল সে মেটে সেখ। তখনই তার বুকে প্রবল আন্দোলন হতে লাগল। মিস্টার জেডের বুকের ভিতর একই সঙ্গে মুরারি আর মেটের আলাদা আলাদা অস্তিত্ব একাকার হয়ে ছলছল করে উঠল। সে কিছুতেই নিজেকে মেটে সেখ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারছিল না।

ভুলবশত পুলিশ ভেবেছে মুরারি আর মেটে একই লোক। পুলিস নানারকম বিভ্রান্তির শিকার হয়। কিন্তু মিস্টার জেডের মানসিক অবস্থা এমনই যে তার মনে হচ্ছে সে মেটে। ক্রমাগত একটি মানুষ নানান নামের ভিতর বাস করতে করতে বুঝতে পারছিল একটি স্থায়ী নাম তার দরকার যখন দল ভেঙে টুকরো টুকরো হয়েছে, লোকটি একা আর বিচ্ছিন্ন, তখন হঠাৎ তার কোথাও ফিরতে ইচ্ছে করে। এই মুহূর্তে দুই বউয়ের সংসারে তার ফিরে আসতে মন চাইছিল। একটি বোনের মত, অন্যটি মায়ের মত। আসলে চরের সীমান্ত গ্রামে খবর পৌঁছে মেটে এরকমই রাতে ঘরে ফিরে আসত। কামিনী ফুল ঝরে থাকত পথে।

সে ডাকল—মালতি বউ, টগর বউ ?

দুটি নামই ফুল দিয়ে। অনেকক্ষণ কেউ সাড়া দিল না। আবার ডাকল

লোকটি। এবার মালতি কুপি হাতে এগিয়ে এল। বাতাসে কেঁপে কেঁপে নিবে যাওয়ার মত করছে। ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে মালতি। কুপি তুলে ধরল লোকটির কপাল তক। অস্ফুট ক’কাল।

ঠিক তখনই বাতাসের ঝাপটায় আলো নিবে গেল। অন্ধকার যেন পুকুরের পানার মত সরে এল চারধার থেকে। মালতি হু হু করে কেঁদে ফেলল।

কান্না থামলে মালতি লোকটির হাত ধরে ঘরে টেনে আনল। টগর বলল—আমাদের দুই সতীনের বেঁচে থাকার ব্যবস্থা আছে, দুঃখ করবেন না।

দুই নারী লোকটির দু’পাশে বসেছে। অকারণ কথা বলতে গিয়ে মুরারির গলা কাঁপল। বলল—এখন আমি কী করব?

টগরই বলল—দুদিন লুকিয়ে থাকুন। এখানে পুলিশ পাত্তা পাবে না। ভাঁটাতলায় যান। মহাজনকে বিড়ি দিতে যাওয়ার পথে খাবার দিয়ে আসব দুপুরে।

হঠাৎ মুরারি বলল—তোমরা কি জানো মেটে আর মুরারি একই লোক? জানলে আর খাতির করতে সাহস হত না।

মালতি বলল—দ্যাখেন কমরেড, বিড়ি বেঁদে খাই। খাওয়া পরা নিজের, মরদ শুদু আগলায়। মরদকে আমরাই খাওয়াই। আপনি তেনার বন্দু লোক। গায়ের গন্দ এক। আমরা বাঁচলে আপনিও বাঁচবেন।

—এভাবে লুকিয়ে থেকে থেকে গায়ের রঙ হলুদ হয়ে গেছে টগর মালতি। আমার এখন ধরা পড়ার সময়। মেটে মরে গিয়ে সংকেত রেখে গিয়েছে।

—তুমিও যদি এমন বল, তাহলে আমরা দুটি কোথায় যাই? মেয়েদের মনের যা সাহস তোমার তা নাই। আমরা তো বাঁচতে চাইছি!

বলতে বলতে টগর ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল।

মালতি বলল—আমরা তোমাকে আগলাব। তেনারও কথা ছিল, মেটে আর মুরারি এক। কতদিন বলেছে। বলেছে, যদি আগে মরি, মুরারি তোদের দেখবে। তুমি নিজেও সে কথা শুনেছ! আচ্ছা, আমরা কি খারাপ? আমাদের সঙ্গে থাকলে তোমার জাত যাবে চন্দ্রদীপবাবু? জীবনের গতিক যখন মন্দ, তখন কোন বাবুই দেখে না—সব ফাঁকা আওয়াজ! গরিবের আশ্রয় কোথা?

—এভাবে বোলো না টগর মালতি! আমার ধরা পড়লে চলবে না। আবার আমি আসব!

কী মনে করে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল মিস্টার জেড।

ছোটবউ বলল—তোমার বাঁচার ইচ্ছে করে, আমাদের করে না? এই যে এমন করে লাফিয়ে উঠলে, তোমার চোখ জ্বলে উঠল, কেন জ্বলে উঠল অমন করে? বাঁচার ইচ্ছে! জীবনটাই ওই ধারা…

মুরারি আবার ধীরে ধীরে বসে পড়ে। মালতি বলল তেনার তো বাঁচার বাসনা ঢের বেশি ছিল গো। দুইখানা বউ যে করে, তার শখ আরো গাঢ়—বাঁচার শখ, থাকার শখ, আমায় বলত মায়ের মতন, টগর ছিল বোনের মতন! দুই পাশে দুইটা বেহেশ্‌ত। দুইখানা দর্পণ। সে বেচারি ঠিক করতেই পারত না, কার চোখ অধিক টলটলে। আসমানের ছায়া কার চোখে অধিক হয়। আমার না টগরের। টগরের নাকি আমার? সেই 'বন্দন' তুমি বুঝবা না চন্দ্রদীপ।

রাস্তা দিয়ে একটি জিপ চলে যাওয়ায় হর্ন শোনা গেল। মুরারির বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। আবার উঠে দাঁড়াল লোকটি। বড়বউ এবার হি হি করে হেসে ফেলে বলল—এত ভয় তোমার? তবে এই লাইনে এসেছিলে কেন?

টগর বলল—তেনার মরণ তো কম কথা না। ভয় তো সেই থেকে। আগে এমন ছিলেন না উনি।

—ঠিক বলেছ টগর। মেটে মরে গিয়ে আমায় ভীতু আর লোভী করে গেল। আমায় বাঁচতেই হবে।

—তারপর কী করবে?

সে কথার কোন উত্তর লোকটির জানা ছিল না। সে যখন পা বাড়াল দুই জোড়া সকরুণ কামনা-বধির বিহ্বল চোখ অসহায় তারকার মত জ্বলে উঠল, হিম শিশিরে ধুয়ে গেল রাত্রি। মেটে নয়, মুরারি নয়, সে এখন মিস্টার জেড। তাকে এই জেলা অতিক্রম করে যেতে হবে।

ভাঁটাতলায় এভাবে পড়ে থাকার কোন মানে হয় না। তার জীবনটা তো একটা মশলায় তৈরি হয়নি, তার বিচিত্র ফোড়ন, নানা ঝাঁঝে-স্বাদে মাখানো—দুটি রমণী তাকে ঘিরে যে ব্যূহ রচেছে, তা মিঃ জেডের সীমান্তের চেয়ে কড়া। সীমান্ত মানে একটি রেখা, কিন্তু ভাঁটাতলা মানে দুর্গের প্রাচীর মোড়া দেশ। মুরারি মেটে রছুল জয়দেব—বিড়ি বাঁধা, হালধরা, ক্ষেত মজদুরি করা, অবশেষে একটি অদ্ভুত সংসারে ধড় রাখা—জীবনের এ যেন এক বিচিত্র সমষ্টি। অথচ কোন অংশেই সে ঠিক জীবনের সম্পূর্ণতা পায়নি। সে হয়ে উঠতে পারেনি।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়তেই ভাঁটাতলার আবছা আঁধারে টগরের চোখে কামনার বহ্নি ফুলকির মত নড়ে। যেন চোখ দুটি আকাশের মত গভীর। মনে পড়ে, চন্দনা তাকে চেয়েছিল। চন্দনার চাওয়াও ছিল অবোধ অবধিহীন। পাশের বাড়ির মেয়ে, বিয়ের দিন, সাজনকোরা চন্দনা বিয়ের আসর ছেড়ে খিড়কিপথে তার ঘরে চলে এসে বলেছিল—আমায় নাও দীপদা। আমাকে নিয়ে পালিয়ে চলো। আমায় পায়ে রাখো তোমার। তোমাকে ছাড়া বাঁচব না।

—তা হয় না চন্দনা।

—কেন হয় না ?

—আমার পার্টি তো জানিস, সংসার-জীবন থেকে আলাদা। তোকে নিলে আমার গায়ে দোষ লাগবে চন্দনা—তোকে ফের কোথায় বয়ে নিয়ে যাব। আমার তো ঘর নেই। তোকে রাখার ঠাঁই নেই কোথাও।

—তোমার কি মন নেই দীপদা ? সেখানে রেখো।

—তাই রাখব ! যদি বাঁচি, তোর এই কনে-সাজা মুখটা ভুলব না ! যা, ফিরে যা।

—কী কষ্ট, তুমি বুঝবে না।

—জানি।

—কিছুই জানো না তুমি ! আসর ছেড়ে এসেছি, না ফেরালেই পারতে। কী হত। আমি কি পারতাম না।

—কী পারতিস চন্দনা ?

—ভালবাসলে মেয়েরা সব করতে পারে। আসর ছেড়ে এসেছি, জীবন ছেড়েও চলে যেতে পারি।

—অমন কথা ভাবতে নেই চন্দনা। পাগলামি দিয়ে জীবন চলে না ! যা, ফিরে যা। লোকে দেখলে খারাপ হবে।

সজল দুটি চোখ কিছুতেই ভোলা যায় না। শেষ মুহূর্ত অবধি চন্দনা তাকে প্রত্যাশা করেছিল। কামনার সেই সুতীব্র আবেগ মেয়েটির বুকের ভিতরই মাথা কুটেছে নিরন্তর।

দুটি বউ দু'পাশে, নানা বিভঙ্গে কামনার স্ফুলিঙ্গ জ্বলা, মাঝে অন্য এক চন্দনলিপ্ত মুখের শুভ্রতা—আজ স্মৃতি আর ঘন-বাস্তবে মাখামাখি হয় —চন্দ্রদীপের এখন ফিরতে ইচ্ছে করে। যা থেকে যেতে ইচ্ছে করে। জীবনের এ এক আশ্চর্য উপত্যকার মত, যে-পথ সে ভেঙে এসেছে তা জীবনের পাদদেশে নির্জনতায় পড়ে আছে। অথচ হাতের মুঠোয় মিঃ জেড ছাড়া আর কোন কাহিনী নেই—লঙ্ঘন যার মন্ত্র, নেশার মত চলাই যার নিয়তি, নিজেকে এতদিন সে বদলে বদলে এসেছে—আজ আর বদলানোর কিছু নেই। সে এখন শ্যাওলার মত একটি শীতল কলসের ভিতরের দেওয়ালে আঁকড়ে থাকতে চায় জল। এই ভাঁটাতলার ছায়ায় যে ছায়ান্ধকার নিবিড়তা, তা যে শ্যাওলার মত স্থির আর শান্ত।

অথচ গভীর রাতে পুলিসের কালোগাড়ি গ্রাম-প্রদক্ষিণ করে যায়। টগর মালতি হাহাকার করে। বলে, তবু থাকো তুমি। খাওয়াব, পরাব, তেলেজলে শাসেবাসে রাখব, পুরুষহারা মেয়ের জীবনকে আগলানোতে পাপ নাই। কথা ছিল, তুমি থাকবে।

—পারব না টগর মালতি।

—কেন পারবে না ?

—লোকে তো বুঝবে না। খারাপ হবে।

—সহায় যার নাই, তাকে আগলানো কি খারাপ ? কী করতে চেয়েছিলেন মহাশয় ?

—বিপ্লব।

—সেইডে হল হুলোহুলি বাবু! খুব চেঁচামেচি হয়েছে—রণ শেষ, জয়ঢাক ফেঁসে গিয়েছে। ফল হল, স্বামীখেগো বেধবা হলাম দুই সতীনে।

—এর কি দাম নেই বলছ ?

—দামডাই তো চাইছি গো!

—পারব না বউ।

—মুরারি ভাই, তুমি তো পারবে মনে হত! এখন দেখছি, হও নাই কিছু। শুধু নাম নিয়ে ঘুরেছ। যদি মুরারিই হতে, আজ তক্ক করতে না। যাও, চলে যাও। আমরা লোক জোগাড় করে নেব। খাও, নিশ্চিন্দিতে খাও। লজ্জা ভয় কোরো না। দিদি পথের উপর পাহারায় আছে।

মাথা নিচু করে ভরপেটে রওনা দিল চন্দ্রদীপ। টগর আর মালতী তাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। মুখের প্রতিটি গ্রাসে ছিল অসহায় অপমান। দুটি চোখ জুড়ে জীবনের খরতাপ হতাশার গহন থেকে কী এক কথা হানাহানি করছিল অবিশ্রান্ত। চন্দ্রদীপ আর সহ্য করতে পারছিল না। পাশে বসে তালপাখা নেড়ে বউ দুটি তাকে মমতা আর কামনার ঢলঢল লাবণ্যে কী যে করেছে—খাওয়ানোয় শোয়ানোয় ; তার পীড়ন এখন বুকের শ্বাস রুদ্ধ করে দিতে চাইছে।

চন্দ্রদীপ এই কষ্টকে বুকে করে তার পার্টির বিভিন্ন কেন্দ্র ঢুঁড়ে চলেছিল, যদি কাউকে পায়। গোপন আস্তানাগুলি, অতি গোপন কক্ষ সে হানা দিচ্ছিল। সবই জনশূন্য, কোথাও রুদ্ধ, কোথাও ঘরের পাল্লা হাটখোলা—কেউ নেই। চৌকির তলার কুকুর পায়ের উপর মুখ রেখে ঢুলছে। কানখাড়া করে পায়ের শব্দ পেতে চাইছে। এই প্রাণীটি চরম উত্তেজক বক্তৃতার সময় দূরে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ত।

চন্দ্রদীপ তার ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছিল। বাড়ি ফিরতে পারবে না। মায়ের সঙ্গে দেখা হবে না। পুরনো বন্ধুদের আড্ডায় গেলে ওরা হয়ত ওকে চিনতেই চাইবে না। এর পর জীবন কেমন হবে ? চাকরি-বাকরি হবে না। পুলিসে ধরলে কত বছর শ্রীঘরে থাকতে হবে ঠিক নেই। কিছুই ঠিক নেই। না জীবন, না মৃত্যু! ···আচ্ছা, চন্দনা কেমন আছে ? চন্দনার আর এক নাম ছিল বুড়ি! কেমন আছে সেই সালংকারা চন্দন-বিন্দু-শোভিত মুখ ?

মেটের বউ দুটি যদি এমন না করত, তাহলে এতকাল পরে চন্দনার মুখ মনে পড়ত না। একটা চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে চা খেতে খেতে মনে হল চন্দ্রদীপের। শহরের এই দোকানটায় কতদিন সে চা খেয়েছে দলের সহযোদ্ধাদের সঙ্গে! সামনের ওই ক্লাবটাতেও আড্ডা দিত। পুলিস এই চায়ের দোকান, ওই ক্লাব—সন্দেহের চোখে দেখেছে এতদিন। আজ সেখানে কোন কমরেডই চা খেতে আসে না। কোথায় গেছে তারা কে জানে! এই নিঃসঙ্গতা ভয়াবহ। শোনা যাচ্ছে, অনেকেই ধরা পড়ে গিয়েছে।

চায়ের দোকানে কথাবার্তা হচ্ছে. বিপানকে পুলিশ ওই বটতলার নিচে ধুনুরিদের ভিতর থেকে ধরেছিল। বিপান ধুনুরিদের সঙ্গে দোস্তি করেছিল, অমন মিশুকে ছেলে হয় না। পুলিস যখন ওকে খুঁজছে পাগলা শেয়ালের মত, ও বটতলায় সেদিন ধুনুরিদের চটের উপর গিয়ে বসে যায়। হাতে তুলে নেয় ধোনার যন্ত্র, তুলো পেঁজিয়ে ওঠে তার ধুনে। ক্রমাগত ধুনের শব্দ, তুলো ওড়ে, ওর চোখ মুখ ভরে যায়।

চোখমুখ তুলায় ভৌতিক, চুলে তুলার লেগে থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডেলা, সাদা হয়ে ওঠা কাঁচাপাকা বিপানকে পুলিস কখনই চিনতে পারত না। ওকে ধরিয়ে দিয়েছিল অন্য এক রাজনৈতিক দলের কেষ্টবিষ্টুর দল।

পুলিস শুধালো আপনি বিপানবাবু?

—না মশয়। ছেত্রীলাল নামধারী। নামধারী টাইটেল।

—কত নামই তো ধরেছেন। আসল নাম বলুন। জাতি বলুন। ধর্ম বলুন। গোত্র বলুন। আপনি বৈদ্য। বিপান দাশগুপ্ত, পিতা নরেশ দাশগুপ্ত।

—বৈদ্য কোন জাতি নয়। এই হল পেশা। নামধারী বৈদ্য নয় মশয়। খান ঠাট্টা করবেন না।

ধুন তুলে বিপান পেশার দাখিল দেয়।

পুলিশ বলে নামধারী সবক'টাকে আমরা চিনি। তবে হ্যাঁ, আপনাকে চেনার সাধ্য এই আপনার কেষ্টবাবু সঙ্গে না থাকলে অসম্ভব হত! আসুন, উঠে আসুন! অনেক ধুনেছেন—আর নয়!

প্রকাশ্য এই পথের উপর কেষ্টবাবুরা পুলিসের সামনে বিপানের গালে চপার মারে, চোখে অ্যাসিড ঢেলে দৃষ্টি ঝলসে শেষ করে দেয়।

শুনতে শুনতে শিরদাঁড়া শক্ত হয়ে ওঠে চন্দ্রদীপের। যে-লোকটা এভাবে বিশদ কাতরতায় বিপানের কথা বলে চলেছিল তাকে চন্দ্রদীপ কখনও দেখেনি। লোকটির গায়ে নোংরা শার্ট, পরনে পা-ছেঁড়া পাজামা। চটি জোড়া নতুন। জুলফি পাকা, চুল পাকেনি।

হঠাৎ লোকটি চোখের চশমা চোখ থেকে নামিয়ে কোলের উপর রেখে

বলল—মুরারি একজন নামধারী। বিপানরা যত নামই ধরুক, লোকেই তাদের ধরিয়ে দেয়। চন্দ্রদীপ যখন ধরা পড়েছে, মুরারিও পড়বে।

বলতে বলতে লোকটি উঠে দাঁড়াল। গা মোচড়াল। দেওয়ালে ফেলে রাখা সাইকেল উঠিয়ে নিয়ে দোকানের মালিকের সামনে পকেট থেকে মুঠোয় রেজ্গি বার করে মেলে ধরে বলল—তুলে নেন ভাদুবাবু।

তারপর আর লোকটি দাঁড়াল না। ভাদুবাবু চন্দ্রদীপের চোখে খুব ক্ষীণ ইশারা করল দুর্বোধ্য। কাছে এগিয়ে গেল চন্দ্রদীপ। ভাদুবাবু গলা অত্যন্ত খাটো করে বলল—পুলিশের লোক। পালাও।

হৃৎপিণ্ডটাই যেন চমকে উঠল। ভাদুবাবু বলল—রাস্তায় ওই ধারা প্রচুর পুলিশ নেমে গিয়েছে। চেনা যায় না। সব সিভিল ড্রেস। বুঝতে পারছ, ইচ্ছে করেই বানিয়ে কথা বলছে—ভয় ছড়াচ্ছে। অমুক ধরা পড়েছে বললে ধরিয়ে দেওয়ার উৎসাহ পাবে অনেকে। শালা মাছি, ভনভন করে বেড়াচ্ছে। তুমি আর এ শহরে থেকো না চন্দ্র। সত্বর ইস্টিশনে চলে যাও। পিছন থেকে চেনা গলায় ওই মাছিরাই ডাকবে—যেন তুমি কতকালের দোস্ত। এখন শুনছি মেয়েদের দিয়ে ডাকাচ্ছে, যেন তোমার মা বা বোনই ডাকছে। কত রকম বুদ্ধি। ওদের একটা বুদ্ধি থাকলে তোমার হাজারটা কৌশল থাকা দরকার। কথা হল কারু ডাকেই কান দেবে না। এমনকি, আপন নাম ধরে মনে মনে নিজেও ডাকবে না। বিপান যে নিজেকে নামধারী বলেছিল, তখন ওর আর উপায় ছিল না। নামধারী বলা মানে নিজেকে আসল নামে চেনানো—সেই দৃশ্য ভাবা যায় না চন্দ্র। চোখ দুটি ঝলসে দিলে ভাই। গাল কেটে দিলে।

চন্দ্রদীপ সর্বাংশে সতর্ক এখন। জাতিধর্মগোত্রহীন মানুষ। গৃহহীন। পথহারা। একজন ভারতবাসী কি না তাও সে বলতে পারে না। সে এখন ইংরেজির একটি অক্ষর মাত্র। মিঃ জেড। এই সংকেতও তার ভেতরের শত্রুটাও জানে না। সে জাতিধর্মগোত্রবর্ণ বিভুষিত দেশের মানুষ হয়েও সবশেষে একটি অর্থহীন অক্ষরে পর্যবসিত হয়। কারণ সে তার সুন্দর চোখ দুটি হারাতে চায় না। এই চোখ দিয়ে চন্দ্রদীপ বিপ্লবের অগ্নিক্ষরা অক্ষরগুলি পাঠ করেছে, কাব্যসাহিত্য পাঠ করেছে, ভারতবর্ষের দুঃখকে দেখেছে। এই চোখ মুক্তির স্বপ্ন দেখেছে।

জনস্রোতের ভিতর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে চন্দ্রদীপ। সে আর তার দামী মস্তিষ্ক—সঙ্গী কেউ নয়। এতদিন মিঃ জেডের গল্পটি সে পকেটে করে বইছিল। এখন সে নিজেই মিঃ জেড হয়ে গেছে। অতএব তার লঙ্ঘন ছাড়া আর কোন কাজ নেই। লক্ষ্য নেই, কিন্তু অতিক্রম আছে।

দু'বার সে মনে মনে ডাকল—মা! মা গো! তারপর বলল—এই স্টেশনে তুমি আমাকে ডেকো না।

এগিয়ে চলতে থাকল চন্দ্রদীপ। বলল—ভাই মেটে, তুমিও আমাকে ডাকবে না। ভাই টগর মালতি, তোমরাও না। এই চক্ষু দুটি যেন কারুকেই আর দেখতে না পায়। ওই তো টিকিট কাউন্টার। ট্রেনও প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে।

ট্রেনে উঠে পড়তে পারলেই এই জেলার সীমান্ত ছেড়ে যেতে পারবে সে। চন্দ্রদীপ টিকিট করল। গেট পার হল। এমন সময় সত্যিই তাকে ডেকে উঠল কেউ—দীপ দা!

এই নামে সুদীর্ঘকাল কেউ ডাকেনি। এই নাম পুলিস জানে না। আবার ডেকে উঠল - দীপ দা! চন্দ্র দা!

এ কি তার নিজেরই ভেতরের কণ্ঠস্বর! চন্দ্রদীপ নিজেকে রোধ করতে পারল না। পিছন ফিরে চাইল।

সামনে দ্রুত ছুটে এল চন্দনা। বলল—তোমাকে সেই কখন থেকে ডেকে চলেছি।

চন্দ্রদীপ দেখল আজও খুব সেজেছে চন্দনা। কতকাল পর! সমস্ত গা ঝলমল করছে।

চন্দনা শুধালো—আমায় তুমি চিনতে পারো না।

—কোথায় এসেছিলে তুমি!

এই এখানে, এক বন্ধুর বাড়ি! শুনলাম, তুমি এই ডিস্ট্রিক্টে থাকো। ভাবতেই পারিনি দেখা হবে!

ঠিক এই সময় দুটি পুলিশ কোথা থেকে ছুটে এসে ওদের দুজনকে ঘিরে দাঁড়াল।

বুদ্ধিভ্রষ্ট হলেন মিঃ জেড। ফ্যালফ্যাল করে কেবলই তিনি একটি সুন্দরী গৃহবধূকে চেয়ে দেখতে থাকলেন। তাঁর মনে হল, জীবনসীমান্তের এই নারী অলঙ্ঘ্য।

চন্দনা তীব্র আবেগে কঁকিয়ে উঠল - আগে জানলে কখনও তোমায় ডাকতাম না দীপ দা! কখনও পিছু ডাকতাম না!

চন্দ্রদীপ বলল - তোর দোষ নেই চন্দনা! একটা ঘোর মতন হল! কে যে ডাকছে! অবশ্যি টগর মালতি আমাকে বধ করল রে! তোকে মনে করিয়ে দিলে!

হাতকড়া এগিয়ে এল মিঃ জেডের হাতের দিকে। একটি কাহিনী চন্দ্রদীপের পকেট থেকে বার হয়ে স্টেশনের জনস্রোতে ভেসে বেড়াতে লাগল।

———

# জন্মান্তর

গৃহদেবতার আস্তানা গোলাঘরের মতন খড়ের গোল চাল দিয়ে তৈরি। সেই ঘরের ফুটো চাল মেরামতির জন্য ভাতশালার যুগীনের ডাক পড়েছিল। যুগীন ঘরামি খুবই পুরনো লোক। ঘরামি হিসাবে এই দিগরে যুগীনের যশ আছে। বছর পাঁচ আগে যুগীনই গোয়াল ঘরের টালির ফ্রেম তালগাছের বর্গাতীর দিয়ে বানিয়ে দিয়ে গেছে। আজকাল যুগীনের চোখ দুটি ঈষৎ নরম হয়ে এলেও হাতের কাজে এখনও তার ধারে-কাছে হাতধরার লোক নেই। দেবকুটিরের মাথার সুদৃশ্য বাহারি মুকুট বরাবরই যুগীনই বানায়। সেটা যেন শিল্পের মতন একটা কারুকৃতি। যুগীন ছাড়া অন্য কেউ এ জিনিস অমন করে গড়ে দিতে পারে? তাছাড়া মানুষের বিশ্বাসটাই অন্য রকম। সুধারানী মনে করেন ঐ মুকুটের খাতিরেই একটা লক্ষীপেঁচা চালে এসে বসে রাত্রিবেলা, সেটা যুগীনের হাতের গুণ। এই বিশ্বাসের উৎস সুধারানীর একান্ত নিজস্ব মন, তারও গড়ন পুরনো।

এটি লক্ষীদেবীর বাস্তু। পুজাবিধিও সহজ। পিতলের জলপূর্ণ ঘট ঘরের পৈঠার গোড়ায় বারোমাস সুরক্ষিত। সুধারানী প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পাঁচ এয়োস্ত্রী মণ্ডলীর মাঝে পুজা করেন, উলুধ্বনি করে পরস্পর সিঁদুর পরান, প্রতিবেশিনী এয়োস্ত্রীদের নির্মাল্য আর প্রসাদ বিতরণ করেন। খুব শুদ্ধাচার হয়। প্রদীপ জ্বলে। ধুপধুনা দিয়ে গললগ্ন আঁচলে প্রণাম করেন দেবীকে। ঘটের উপর আম্রশাখা, তাতে সিঁদুর আর চন্দনের ছাপ শুকিয়ে ওঠে, গঙ্গাজলের ছড়ায় ভিজে সুঘ্রাণ বাতাসে মেশে। শ্রীশ্রীলক্ষীপুজায় ঘণ্টা বাজে না। কেমন নিঃশব্দ আরতি। খানিকটা ধ্যানের মতন।

তাছাড়া দেবীর কোন বিসর্জন নেই। এমন যে গৃহী মানুষের সিধে শাশ্বত অর্চন, একই মুদ্রায় নমনীয় শুদ্ধাচার দেখে আসছে যুগীন কতকাল। যুগীনের সব মুখস্থ হয়ে গেছে।

যুগীন ঘরামি গাঁওয়ালের কবি। রসিকজন। ভারবোল বেঁধে দেয় পৌষ-পার্বণীর ছেলেদের। পৌষল্যা কার উৎসব, নবান্নই বা কার, কখনও বিচার করেনি যুগীন শেখ। ভাতশালার মুসলমান ছেলেরা তার তৈরি ভারবোল গেয়ে বাড়ি বাড়ি চাল বেগুন কুমড়ো কলা ফল-ফলকারি সংগ্রহ করে পৌষল্যা করেছে, বিচারের বালাই ছিল না। আর সে লক্ষীবাস্তুর আস্তানা গড়েছে সুধারানীর গেরস্তির উঠোনে, কখনও মনেই হয়নি, তার নামটা হিন্দুর হলেও, জাতে সে মুসলমান। আজ সব কিছুই ভেতরে ভিন্নধারা খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে একে একে, সব ভাবনা কেমন আলগা হয়ে যাচ্ছে।

সুধারানী যুগীনের খড়ের আস্তরণে হাতচালানি লক্ষ্য করতে করতে সহসা মন্তব্য করলেন—যুগীন নামটা তোমার ঠিক হয়নি যুগীন।

সহসা এমনধারা কথার ধাক্কা কেন-বা, যুগীন বুঝতে পারে না। বলে—আজ্ঞে দিদি, ঠিক নয়। আমাদের কোন নামটাই বা ঠিক আছে বলো। ভাতশালা নামটাই কি ঠিক আছে? গরিব মুসলমানের গাঁ। ভাত নাই, ইদিকে নামখানা খুব বাহারি, ভাতশালা। সেইটে নিয়ে ঠাট্টা করে একবার ভারবোল্ বেঁধেছিলাম। এক যুগ হয়ে গেল সেই কথা। 'ভাতের হাঁড়ি ঠনঠনায়, ভাতশালাতে ভাত নাই, ভারবোল কিসে করি। দুখু বেজারি ভারবোলার গলায় দিয়ে দড়ি।' হেঃ হেঃ! সেইজন্যই তো আপনাদের কাছে আসা দিদি। কষ্টেসৃষ্টে ঘরামির কাম জানি বলে দুমুঠো পেটে এখনও যাচ্ছে। এখনতো কামেরই আকাল দিদি।

সুধারানীর কথার মধ্যেই সাত-সকালে তখন শিবকালীতলার ব্রহ্মাপদর থানে মাইক চালু হয়ে গেল। একেবারে তুঙ্গিসুরে আটপ্রহরের নামকীর্তন শুরু হয়। গতকাল সন্ধ্যায় যুগীন যখন সুধারানীর এখানে কাজে আসে, তখনই পথে লোকমুখে শুনেছে। কীর্তনিয়ার দল মহেশপুরার লোক, মূল অধিকারী হলেন বাসবচন্দ্র দাস। যুগীন চেনে, এই লোক এককালে গুনাইযাত্রার ছোকরা ছিলেন। মওকা বুঝে হরিনাম সংকীর্তন দল গড়েছেন। ধর্ম এখন শুদ্ধাচারের স্নিগ্ধপ্রতিমা নয়, নমনীয় ধ্যানের মুদ্রা নয়, ধর্ম এখন উতলা ক্ষ্যাপা হাওয়ার চণ্ড উন্মাদনা, ক্ষুব্ধ রোষের তপ্ত লু। কথাটা বোঝে না যুগীন এমন বাক্য বটে, কিন্তু সরল চেতনায় তারও ঘা লেগেছে। দুঃখ হয় যে তার নাম যুগীন। হিন্দু নাম। সে একটি ক্ষ্যাপা হাওয়ার আর্তনাদ শোনে মাইকের তুঙ্গিসুরের দাপানিতে এইবেলা। কেন এমন হচ্ছে, যুগীন বুঝে পারছে না। ভাবাছ, দিদি ঠিকই বলেছে,

তার নামটা ঠিক হয়নি। অথচ তার হাতে দেবআস্তানার যে মুকুটটা তৈরি হবে, সেটি মন্দিরচুড়ার শিখার মতন গড়া। কে বলবে যে, এমন চুড়োর নকশা একজন শেখজি গড়েছে, দরিদ্র মুসলমান কবিয়ালের ছাঁচ? এই চুড়োয় এসে বসবে লক্ষীর বাহনটি, সুবর্ণ পাখি। বাহনটি কি বোকা যে মুসলমানের স্পর্শ-দোষ মানে না, বোঝেও না। কিন্তু সুধারানীই কি বুঝতেন? মনে হচ্ছে, এ বছর সুধারানী কেমন বদলে গিয়েছেন। যুগীনের কাজে আসা ঠিক হয়নি। যুগীনই সে কথা ভাবল।

মটকায় উঠে বেণী-বাতার বেড়ে সুতলিদড়ির গেরো বাঁধছে আর সিঁথির মতন পাট করে খড়চালুনির হাত ফেরাচ্ছে যুগীন। চোখ যায় রাস্তার দিকে। খাকি হাফ-প্যাণ্ট আর মার্কিনের সাদা জামা পরে একদল ছেলে-ছোকরা হাতে লাঠি আর তলোয়ার নিয়ে হৈ হৈ করে ছুটছে গঞ্জমুখে। ওরা কোথায় যাচ্ছে যুগীন বোঝে। চককালীতলার হাটে বাইশ-প্রতিমার মণ্ডপে ওদের মহড়া। সুধারানীর ঘর থেকেও পান্তা খেয়ে দুটি বাচ্চা বেরিয়ে গেল। টিনের ভয়ংকর খড়্গ হাতে। বড়রাও রাত্রে ফেরেনি ব্রহ্মপদর থান থেকে। সেখানে গভীর রাত্রে নেড়া গৈরিক স্বামীজী গোপন মন্ত্র দেবেন। হিন্দুধর্মেরও জেহাদ আছে যুগীন জানত না। ওদেরও লাঠি-সোটার মহরমী চাল আছে, কখনও দেখেনি। ওরা যুদ্ধ করবে কার সঙ্গে? মহরমঅলাদের সঙ্গে? ভাবতে গিয়ে স্বাদু সরল মুখখানা পানসে হয়ে শুকিয়ে যায় যুগীনের। তলে তলে হিন্দুরা এসব কী করছে? কেমন মাতোয়ারা হুঁশহারা অবস্থা! লোকমুখে নানাবিধ রটনা শুনছে যুগীন। রেডিওতে, খবরের কাগজে বিচিত্র খবর প্রচার হচ্ছে। শিক্ষিত লোকেরা গাওনা করছে। বাবরি মসজিদ না কি একটা কী যেন মন্দিরের ঘটনা নিয়ে খুব মাথাগরম অবস্থা হয়েছে। শংকরপুরের জিরাত মাস্টার সেদিন জুম্মার মসজিদে বোঝাচ্ছিল সেই ছুতোনাতার কথা। খবর বেরিয়েছে শাজাহানের তাজমহলটাও নাকি হিন্দুদের মন্দির ভেঙ্গে তৈরি। তা সবই যখন হিন্দু, তাই সই। তা ঐসব কথা অমন করে শোনাচ্ছে কেন হিন্দুরা। মুসলমানদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলছে। যুগীন মোটামুটি বুঝে ফেলেছে বৃত্তান্ত। ভাতশালা ছেড়ে কোথায় যাবে যুগীন! একটা সুন্দর ভাত-তরকারির দেশে যদি হিন্দুরা আমাদের রেখে আসে, তাহলেও না হয় ভাববার একটা মজা হয়। ভাতশালায় ভাত নেই বলেই তো দিদির গাঁ গৌরীপুর আসা। তবু দ্যাখো, দিদি কেমন মুখ বেজার করে আছে। ভয়ে গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, কোথায় যাই দ্যাখো দিকিনি, সড়কি ভড়কি তলোয়ার, ঐসব দিয়ে শাসাচ্ছ দিনমান, রাতে ষড়যন্ত্র করছ কিনা জানা নেই, ভাবলেই মনে হয়, আমরা এতকাল পরে তোমাদের কেমন পর হয়ে গেলাম। শেষকালে এই কি তোমার অন্তরের কথা হল দিদি, যুগীনকে তাড়িয়ে দেবে?

ভাবতে ভাবতে হাতের কাজ থেমে যায় যুগীনের, বুকে কেমন জটিল কষ্ট হয়। তীক্ষ্ণ অভিমান বাজতে থাকে। বলে—আমার নামটার কী দোষ বলো সুধাদিদি! সবই তো জন্মের ঘাট। জন্মের সময় আমার গলায় জড়িয়েছিল নাড়ির পৈতে দিদি গো! মা-মাসির তো তা দেখে রা সরে না! যে দ্যাখে তারই মুখে এক কথা। বামুনের জাতক। হিন্দু ঘরের ভুল-ভাসানি পোনা, কী সোঁতায়, কিসের টানে এসে গিয়েছে। সামলে রেখ, অযত্ন করো না। তা সেই জন্মের দোষ বলো আর গুণই বলো, তোমার মন্দিরের খড়-চুড়োর মুকুটটা আমি ভালোই বানাই। মা কিন্তু বিশ্বাস করত, আমি হিন্দুর ছেলে।

—তা কী করে হয় যুগীন! ওটা তোর গল্প-গাছা। মুসলমানের জন্মান্তর নাই। বললেন সুধারানী।

যুগীন বলে—মুসলমানের নাই, কিন্তু হিন্দুর তো আছে। তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না কিসে থেকে কী হয়! ধরো আমি যদি হিন্দুই হই, সে কথা তো ভগবান নিজে এসে কারুকে বলে যাবে না কার পেটে কে জন্মাবে সেটা তো খোদার ইচ্ছে। সব জাতকের কি গলায় নাড়ির পৈতে থাকে বলছ।

—এসব কথা তোর ধর্মে সইবে না যুগীন! ভারী অনাচারী কথা। আমি তোর কথা বিশ্বাস করি না। সুধারানী গম্ভীর হয়ে থাকেন।

যুগীন বলে—বিশ্বাসের উপর তো কারু হাত নাই দিদি! তোমার চোখ জোড়া যে সোলেমানী চোখ, সে কথা বললে তুমি তেড়ে আসবে কিন্তু অমন চোখ তো কোথাও দেখিনি।

কিসের চোখ? ভ্রূ-ভঙ্গি করেন সুধারানী।

—সোলেমানী চোখ! মিঠেল খয়রা। সেই চোখ কোথায় পেলে বলো দেখি।

—কার চোখ? সোলেমানের চোখ? কে বটে সেই লোক?

—মুসলমানের বাদশা। পয়গম্বর। তোমার দেবীগুলোর চোখ তো কালো। কোথায় পেলে তাহলে? খোদাই তোমাকে দিয়েছে।

সিদ্ধান্ত করে ফেলে যুগীন অনায়াসে।

সুধারানী অবিশ্বাসের সুরে মন্তব্য করেন—সবই তোর গল্পগাছা। বিশ্বাস করি না।

যুগীন বলে—করো আর নাই করো। সর্বাঙ্গ মুসলমান, সর্বাঙ্গ হিন্দু কোথাও তুমি পাবে না। তোমার চোখজোড়া মুসলমানের, আর আমার হাতজোড়া হিন্দুর। নইলে দ্যাখো, কী করে মুকুট বানাচ্ছি, আর সেই মুকুটে হিন্দু না হলে লক্ষ্মীর বাহন পেঁচাটা আসে কী করে, বাহন তো গন্ধ পাবে!

তুমিই কথাটা বাজিয়ে দ্যাখো, জন্মের ওপর খোদার হাত। আমরা সব মিশেলি মানুষ দিদি।

বলেই হাতের খড়গুলি দুলিয়ে মেশাতে থাকে যুগীন। দিদি গজগজ করতে থাকেন সোলেমানের চোখ। ইস! বললেই হল! আদিখ্যেতা! আমি তোকে আজ প্রসাদ দেব না যুগীন, এই তোকে বলে রাখলাম। দুপুরে ওজুর জল দেব না, মসজিদে সোজা চলে যাবি। বরাবর তুমি এমনি করে আমাকে ভোলাতে আসো, যা মনে আসে তাই গাওনা কর। একলা মেয়েমানুষ পেয়ে হিন্দু সেজে প্রসাদ চাও। দেব না। কিছুতেই দেব না। তোকে এর পর আর কাজে ডাকব না বলে দিলাম। তোকে আমি পর করে দিলাম আজ থেকে! যা, চলে যা!

কথাটা বলে ফেলেই সুধারানীর বুকে অদ্ভুত কষ্ট হয়। তিনি নিজেকে সামলাতে না পেরে ঘরে ঢুকে পড়ে একান্তে মৃদু শব্দে কেঁদে ফেলেন। বাড়ির ছেলেরাই কর্তা—এ-বছর যুগীনের কাজে আসা নিয়ে বিষম আপত্তি করেছে। সমাজে নাকি কথা উঠেছে মুসলমানকে দিয়ে দেবীঘর বানানো অশুচিতা। ছেলেরা মাকে যাচ্ছেতাই বকেছে। রাগে চোখ অব্দি পাকিয়েছে। মুসলমানরা বর্বর আর ভিনদেশী। শুধু তাই না, এককালে ওরা এমনই হিন্দু-নিধন করেছিল যে মৃত হিন্দুর পৈতের ওজন হয়েছিল ৭৪½ (সাড়ে চুয়াত্তর) মণ। সেই থেকে চিঠির মাথায় ঐ সাড়ে চুয়াত্তর কথাটা লেখা হয়। সে-কথাটা ভুলব কেমন করে? সুধারানী বলবার চেষ্টা করেছিলেন, যুগীনের কী দোষ! ও তো কখনও হিন্দু মারেনি। গরিব মানুষ, এমনিতেই মরে আছে, ও কাকে মারবে রে! উদোর পিণ্ডি কি বুদোকে দিতে হবে।…এইভাবে তর্কাতর্কি হয়। সুধারানী চোখ উল্টে বলেছিলেন -তা ঐসব চুয়াত্তরী কথা অ্যাদ্দিনে মনে পড়ল তোদের? তোরা কি আজকাল চিঠির মাথায় ভগবানের নাম না লিখে পৈতের ওজন লিখিস। কী কালচারে নেমেছিস কৈলাস!

সুধারানীর গোঁ অবশেষে যুগীনকে ঠেলে ফেলতে দেয়নি। পরে এই নিয়ে আরো কোন বিবাদ বিসম্বাদ হবে কিনা ভগবান জানেন। সুধারানী যুগীনের সঙ্গে ভাল করে কথা বললেন না, প্রসাদ দিলেন না। ওজুর জল দিলেন না। যুগীন দুপুরবেলা ঘাড় গোঁজ করে মাথা নুইয়ে কেমন নিঃসহায় বড়ো দুঃখীর মতন ও পাড়ার মসজিদে নামাজ পড়তে চলে গেল। ফিরে এসে এক মনে কাজ করে যেতে লাগল। গতকাল বৃহস্পতিবার গেছে, পুজো হয়েছিল যুগীনের চোখের সামনে। যুগীন প্রসাদ পেল না। পাবে কেন? আমার চোখ কি মুসলমানের চোখ যে ওর দিকে চাইলে দয়া হবে? আমার সর্বাঙ্গ হিন্দুর। পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা সবখানে হিন্দুত্ব। সবখানে হিন্দুত্ব চাই। মোহান্তরা সেই দীক্ষা দিচ্ছেন। যুগীন জানে না, আমরা

সম্পূর্ণ হিন্দু হয়ে গেছি। ও যেন আর না আসে। সুধারানী স্থির করেন, খুব স্পষ্ট করে যুগীনকে বলে দিতে হবে এই কথা।

যুগীন রাত্রে ভাল করে খায়নি। শুয়েছে বটে, ঘুম আসছে না, জেগে জেগে ভাবছিল, এই বুঝি শেষরাত্রি। দিদি আর ডাকবে না। তার চোখের মায়া চলে গিয়েছে। চোখের মায়া জিনিসটাই আসল। সেটি নষ্ট হলে মানুষ পাষাণ হয়ে যায়। যুগীনকে আর বিশ্বাস করে না দিদি। ভাবছে, সব কথার মধ্যে মতলব আছে। দু'মুঠো ভাতের জন্যই তো দিদির কাছে আসা। মতলব বলতে ঐটুকু। যাক গে। আমি আর আসব না। কিন্তু খারাপ লাগছে যে দিদি আমার মাকেও বিশ্বাস করল না। নিঃশব্দে চোখ দিয়ে জল গড়ায় যুগীনের। বিড়বিড় করে—

শ্রীনন্দ রাখিল নাম নন্দের নন্দন।
যশোদা রাখিল নাম যাদু বাছাধন ॥

সেটাই তো মায়া দিদি। আবার বিড়বিড় করে যুগীন—

উপানন্দ নাম রাখে ঠাকুর গোপাল।
ব্রজবালক নাম রাখে সুন্দর রাখাল ॥
সুবল রাখিল নাম ঠাকুর কানাই।
শ্রীদাম রাখিল নাম রাখালরাজা ভাই ॥

মাঠের রাখালের ধর্ম দিদি মোহান্তরা দখল করেছে। আবার বলে যুগীন—

কম্বমুনি নাম রাখে দেব চক্রপাণি। বনমালী নাম রাখে বনের হরিণী। বনের হরিণী পেঁচা আর ময়ূর সব ভালো দিদি। ধর্ম তো ওদেরই।

ওদের মুখেই ঠাকুরের নামগান মানায়। সবে কদরের রাতে যেমন গাছপালা নবীগান গান। মানুষকে ওরা ঘৃণা করে না। কিন্তু পেঁচাটা যে, এখনও এল না। পেঁচাও কি আমাকে পর করে দেবে? সুধারানী শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। মুকুটের দিকে চেয়ে ভাবেন আমার ঘৃণার কথা কি দেবীমায়ের বাহন টের পেয়ে গেছে? তোর কপালই মন্দ রে যুগীন! ভগবানও আর চায় না তোকে। তুই চলে যা। পালা তুই যুগীন! আসবে না রে! আর আসবে না!

যুগীনের সহসা মনে হয়, এই রাত্রেই চলে যাওয়া ভাল। সংকেত পেয়েছে সে। ভগবান ওকে চলে যেতে বলছে। যুগীন তৈরী হয়। এমন সময় ঘরে একটি বাচ্চা চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। দুঃসহ আচম্বিত আর্তনাদ। ঘুমের মধ্যে কেঁদে উঠেছে। সবাই হ্যারিকেনের আলো উসকে ছেলের কাছে ছুটে যায়। যুগীনও স্থির থাকতে না পেরে ছুটে আসে। বাচ্চার কাপড় রক্ত-মাখা। কাপড়টা সরিয়ে দেখা যায় ছেলের খৎনা হয়ে গেছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ছেলে। যুগীন অদ্ভুত পুলকিত হয়ে ওঠে। বাড়ির সবাই ভয়ে কেমন কেঁদে ওঠে।

যুগীন বলে—কেঁদো না। সব ঠিক আছে। দিদি কেঁদো না। ও কিছু নয় গো। খোদারই লীলা। টুটুনের পয়গম্বরী হয়েছে। ফেরেস্তা এসেছিল। সোনার ছুরি দিয়ে খৎনা করে গেল। নবীদের ঐ ধারা বিনিহাজামে হাজামৎ হ'ত। ঐ ছেলে তোমার মুসলমান ঘর থেকে এসেছে গো সুধাদিদি। নাও, এবার ঠেলবে কোথায় দ্যাখো দিকিন! বিশ্বাস তো করলে না, খোদা হাতে কলমে দেখিয়ে দিলে! আমি এখনই ওষুধ করে দিচ্ছি, ভয় পেও না।…যুগীন ওষুধের ব্যবস্থা করল। বলল—দিন পনেরো জামাল-কোটার রসের ফেনা মাখাবে দিদি, ঘা শুকিয়ে যাবে। ঐ দ্যাখো, বাহন বসেছে মুকুটে। তেনার ইচ্ছেয় সব হয়েছে। ঘাবড়ে যাচ্ছিলে তো আসেন কিনা। তিনি এসে পড়েছেন। আমি এবার যাই দিদি! নুরের হাওয়া বইছে!

যুগীন কাক-ভোরে ভাতশালার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। মুকুটে তখনও পেঁচা বসে থাকে। দিদি ভেঙে পড়েন। তাঁর হাতে প্রসাদের ডাবর। তখনও যুগীনের ভাগ জুগিয়ে রেখেছেন তিনি। উঠোনে নেমে ডাকছেন—যুগীন শেখ! লক্ষ্মী ভাই! চলে যাস নে। প্রসাদটুকু মুখে দিয়ে যা।

রাস্তায় অভিমানী যুগীন দিদির ডাক শুনতে পায় না। ঘাড়ে বস্তার থলিতে হাতিয়ার পাতি পিঠে লটকে নিয়ে ঈষৎ কুঁজো হয়ে যুগীন চলে যাচ্ছে। ঈশ্বরের পাখিরা ডালে ডালে গান করছে, অষ্টোত্তর শতনাম।

— —

# দুই অক্ষরের গল্প

মারিয়া খাতুনের তন্দ্রা টুটে গেল। পাশের ঘরে তাঁর স্বামী কড়া গলায় আল্লাহ-কবার আল্লাহকবাব করে জোহরের নামাজ পড়ছেন। অফিসের বড় সাহেব, অফিস থেকে এই দুপুরে বাড়ি ফিরে এসে নামাজ পড়তে শুরু করলেন, কখনও এমন ঘটে না। নামাজ পড়েন সকাল বেলা একবার, জায়নামাজে বসেই চা খান, বেড-টি-র বদলে নামাজ-টি। এটাই বরাবরের নিয়ম হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই দুপুরে নামাজ পড়ছেন বাড়ি ফিরে এলেন, নিশ্চয় কোন সুখবর কিংবা কোন দুর্ঘটনা, কোন গভীর দুঃখ কিংবা কোন গভীরতর খুশীর ব্যাপার ঘটেছে। নাজিয়ার হায়ার সেকেণ্ডারী পাশের খবর শুনে একবার এবং তার দাদীমার মৃত্যুর সময় একবার, এমিধারা হঠাৎ বাড়ি ফেরা এবং নামাজ পড়ার ঘটনা ঘটেছিল। দুটো খবরই তিনি ফোনে জানতে পেরে অফিস থেকে দ্রুত বাড়ি ফিরে এসেছিলেন।

স্বামীর কড়াগলার আওয়াজে খাটে শুয়ে থাকা মারিয়া শরীরে মৃদু নাড়া খেয়ে জেগে উঠলেন, চোখের পাতা হঠাৎ খুলে গেল। সেই ধাক্কায় বুকে রাখা বইখানা ছোট্ট চড় খাওয়ার মতো শব্দ ক'রে মেঝেয় প'ড়ে গেল। উনি একটা অল্প দৈর্ঘ্যের হাই তুলে মেঝেয় নামলেন। বইখানা হাতে ক'রে উঠিয়ে খাটের ওপর রেখে দিলেন। ঘুমটা গাঢ় হ'য়ে উঠছিল, এমন সময় ঘুমটা চটে গেছে; এই অবস্থায় কোন একটা নিঃশব্দ চিন্তা তিনি করছিলেন। সেটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ এখন মনে পড়ছে না। এই হয়, মনে পড়ে না। মনে না পড়লে একটা অল্প দরকারী ভাবনাও খুব জরুরী মনে হয়। মনে হয়, কোন বিপদ- টিপদ ঘটবে। এক্ষুনি মনে পড়া উচিত। চিন্তাটা

ছিল সাবধান হওয়ার চিন্তা, ঘুম থেকে উঠেই তাঁকে কী একটা কাজ যেন করতে হ'ত।

বাইরে বেরনোর সময় সিলিং ফ্যানটা এক পয়েণ্টে ঘুরিয়ে রাখলেন। বোর্ডে পয়েণ্ট ঘোরাতে গিয়ে অনেকদিন অনেক কথা মনে পড়েছে। বাইরে বেরিয়ে ঢাকা বারান্দায় হাঁটতে হাঁটতে শেষ প্রান্তে এসে বাথরুমে ঢুকে পড়লেন। বাথরুমে একটু অতিরিক্ত দেরী করলেন। এরপর সিঁড়ি ভেঙে নিচের তলায় ড্রয়িংরুমে যেখানে নাজিয়া তার বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়, দেখলেন কেউ নেই। খুব ছোট তেপায়া গোল কাঠের টেবিলে দুটি এঁটো কাপ। একটা চার্মিনারের প্যাকেট। প্যাকেটে এখনও একটা সিগারেট ভুলবশত থেকে গেছে। বাইরে যাওয়ার দরজাটা হাট-খোলা পড়ে রয়েছে। বে-আক্কেলে মেয়ে বাইরে যাবার সময় চাকরটাকে দরজাটা বন্ধ করতে ব'লে যেতে পারেনি। কিংবা চাকরটা দুপুর বেলায় কোথাও গেছে, আর তাই বাইরে বেরিয়ে যাবার আগে দোতলায় দরজার মুখে দাঁড়িয়ে নাজিয়া কি দরজা বন্ধ ক'রে দেবার কথা, তাঁকে ব'লে যেতে উঠেছিল একবার? তখন তিনি খাটে এলিয়ে পড়েছেন।

মনে পড়ছে না। শহরের অবস্থা খুব খারাপ। বেলডাঙ্গায় দাঙ্গা চলছে আজ পনর দিন। চলে যাবার আগে নাজিয়া নিশ্চয় মাকে সে কোথায় যাচ্ছে, কখন ফিরবে ইত্যাদি দরজার মুখে দাঁড়িয়ে বলে গেছে। ব'লে যাওয়াই উচিত।

দুটি এঁটো কাপ। সিগারেট। কোন একজন পুরুষ বন্ধুর সাথে গল্প ক'রেছে নাজিয়া। তারপর বেরিয়ে গেছে। কোথায় গেছে মারিয়াকে ব'লে গেছে ঠিকই, ব'লে গেলেও এই অবস্থায় কোথাও যাওয়া কি ঠিক? এখন বিপদ পায়ে পায়ে। বাপ তো এখনই জানতে চাইবেন, নাজিয়া কোথায়। যেভাবে নামাজ পড়তে ব'সেছেন, বোঝা যায়, এসময় মেয়ের খবর না জেনে, নিশ্চিন্ত না হ'য়ে, নামাজ প'ড়েও স্বস্তি হবে না। কোথায় গেছে মেয়েটি? আজ কলেজ ছুটি। বাড়িতে ব'সে ক্যারাম খেলতে পারতো। টোটো ক'রে বেরিয়ে পড়লে কেন?

উপরে উঠে এলেন মারিয়া। স্বামীর সামনে যেতে তাঁর ভয় করেছে। পাশের ঘরে, স্বামী যেখানে নামাজ পড়া শেষ ক'রে তছবী গুনছেন, সেখানে না গিয়ে নাজিয়ার ঘরেই আবার ঢুকলেন, যেখানে এতক্ষণ শুয়ে ছিলেন খাটে। বইখানা খাট থেকে তুলে হাতে নিলেন। মনে হ'ল, বইখানা ছুঁয়ে দেখলে, হয়ত তাঁর সব কথা মনে পড়ে যাবে। ঘুমোনোর আগে বইখানা তিনি পড়ছিলেন। তারই কোন ঘটনা তাঁর মনে অস্পষ্ট হ'য়ে লেগে রয়েছে হয়ত, যা তিনি মনে করতে পারছেন না এবং নাজিয়ার কথাও মনে পড়ছে না। বইখানা হাতে ক'রেই পাশের ঘরে এসে দেখলেন, স্বামী মোনাজাত শেষ ক'রে

ঘুরে বসলেন। উঠে দাঁড়িয়ে দেয়ালের কাঁটায় তছবীটা টাঙিয়ে দিলেন। প্যাণ্ট প'রেই নামাজে দাঁড়িয়ে প'ড়েছিলেন। লুঙ্গি পরেননি। আবার কি উনি বেরিয়ে যাবেন কোথাও। মুখখানা ভীষণ ভার ভার মনে হচ্ছে।

প্রথমেই কোন ভূমিকা না ক'রে যা ভেবেছিলেন মারিয়া, খানিক তলব করার সুরে, নাজিয়া কৈ? দেখছি না যে? ব'লে উঠলেন জাফর সাহেব।

—গেছে। লাইব্রেরি গেছে। দ্রুত বানিয়ে ফেললেন মারিয়া।

মুস্তাফাকে ফোন কর। বলো, নাজিয়া যেন দ্রুত বাড়ি চ'লে আসে।

—লাইব্রেরির ফোন নেই।

—ফোন নেই?

—ছোট লাইব্রেরি। ফোন থাকে?

—তবে ওখানে মেম্বার হওয়া কেন?

—বন্ধুরা হ'য়েছে।

—বন্ধুরা হ'য়েছে তাতে কি? দ্যাখো, বন্ধুত্ব জিনিসটা আমাদেরও ছিল। আমরা চারজন চার লাইব্রেরির মেম্বার ছিলাম। মাসান্তে চারখানা বই চারজনেরই পড়া হ'য়ে যেত। ওরা তো আর বই পড়ার জন্যে মেম্বার হয়নি। আড্ডা দেবার একটা জায়গা তো লাগে।

—আড্ডা তো বাড়িতেও দেয়া যায়?

—বাড়ির আড্ডা আর লাইব্রেরি-পার্কের আড্ডা তো এক নয়। আড্ডা দেবে বাড়িতেই দিক, আমি কখনও আপত্তি করিনি। কিন্তু লক্ষ্য করেছ, নাজিয়া আজকাল সন্ধ্যার পরও বাইরে কাটাচ্ছে। একতলার আড্ডা জমছে না।

—এই তো দুপুরেই একজন এসেছিল।

—একজন। দল নয়?

—সবদিন দল বেঁধে আড্ডা হয় নাকি? ওরা আগের মতো আসে না।

—এখন তবে একজন একজন আসছে? এই যে তুমি আর আমি, আড্ডা হয় বলো? প্রেম হয়, পরামর্শ কিম্বা কুৎসা হয়। দু'টি মেয়ে একত্রে আড্ডা সে যে কী পরম বস্তু বোঝা যায়। কিন্তু একটি ছেলে আর একটি মেয়ে······ বলতে বলতে জায়নামাজ গুটিয়ে দেয়ালের কোণে রেখে জাফর সাহেব বললে বেরুব।

—এলে যখন, বেরোবে কেন? চা করি একটু?

—না। ছেলেটা কে? আজকে কে এসেছিল?

—ছেলে না মেয়ে বুঝতে পারিনি। এসে বেশিক্ষণ থাকেনি। এসেই ডেকে নিয়ে চলে গেছে। চাকরটা দু'কাপ চা নিয়ে গিয়ে দিয়েছিল।

—বেশ হ'য়েছে! তুমি তো মাঝে মাঝে নিচে গিয়ে বসতে?

—সব দিন কি আর যাই?

—মাঝে মাঝে যাও। সব দিন যাও না। এখন একজন একজন আসছে। রোজই যাবে।

—আজ এভাবে কথা বলছ কেন তুমি? ওরা কেউ খারাপ ছেলেমেয়ে না। দীপক, অরুণাংশু, উৎপল, মনীষা, সীতা, অহল্যা প্রত্যেকে ভাল পড়াশোনা করে। নেকটাইটা যত্ন করে রাখলেন জাফর সাহেব। টুলের উপর পা তুলে জুতোর ফিতে বাঁধলেন। বললেন—ভালোরাও প্রেম করে মারিয়া। আমি কি ভালো লোক নই?

মারিয়া স্বামীর হাসির পাশে তাঁর চেয়ে একটু বেশি মিঠে ক'রে হাসলেন। জাফর সাহেব আবার বললেন—তাছাড়া ওরা কেউ অরুণাংশু, দীপক, কেউ উৎপল…

রুমাল দিয়ে মুখ ঘাড় মুছে পকেটে ঢুকিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে বললেন—তোমার মেয়ে কিন্তু নাজিয়া।

জুতোর শব্দ তুলে দ্রুত সিঁড়ির মুখে এগিয়ে এসে ঘুরে দাঁড়িয়ে কথাগুলো যেন ছুঁড়ে দিলেন জাফর সাহেব।

বেলডাঙ্গার কী অবস্থা শুনেছ? সাদিককে বাইরের দরজায় খিল তুলে দিতে বল—ওকি ঘুমুচ্ছে?

মনে মনে মারিয়া বললেন, কী ক'রে শুনব? তুমি তো এসেই চলে যাচ্ছ তারপর গলা তুলে বললেন—সাদিক নেই। কোথায় যাচ্ছ ব'লে যাও। জাফর সাহেব সিঁড়ি টপকে-টপকে নামতে-নামতে বললেন—লাইব্রেরি!

আজ পর পর দু'টি মিথ্যে কথা হ'য়ে গেল। একটি বানাতে হ'ল। একটি চেপে যেতে হ'ল। সব ঐ সর্বনাশীর জন্যে। তুমি কেমন ক'রে ব'লে গেলে যে সেকথা আমার মনে থাকল না! বারান্দায় চেয়ারে ব'সেই লাফিয়ে উঠলেন। নিচে নেমে টেবিল থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট উঠিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলেন। কাপ দুটো চৌকির তলায় রেখে ফ্যান খুলে দিয়ে গদির বেঞ্চে ব'সে বই খুললেন। স্বামীর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে না, সত্যিই কি ঘটেছে। লাইব্রেরিতে নাজিয়াকে পাবে না। বই উল্টাতেই কেমন একটু বুকের ভেতরটা শিরশির ক'রে উঠল। বইয়ের পাতার ভাঁজে গোলাপের শুখো পাপড়ি। তিনি একদিন বইয়ের দু'পাতার ভেতর একটি গোলাপ পাপড়ি ঝরিয়ে রেখে দিয়েছিলেন। যে ছেলেটি তাঁকে এই গোলাপটি হাতে তুলে দিয়ে ভয়ে ভয়ে ঠোঁটের উপর আলতো চুমু খেয়েছিল, সে আজ ইরানে চাকরি করছে। তারপর পরে আবার জাফরের সাথে ভালবাসা হ'ল। জাফরকে কখনও পাপড়ির কথা বলতে পারেননি মারিয়া। জাফর কেন, কেউ সেকথা জানে না। সারাজীবন বুকের মধ্যে কতকগুলো পাপড়ি প্রজাপতির মতো

ওড়াউড়ি করে। কেউ তা জানতে পারে না। হঠাৎ মনে হ'ল, নাজিয়া যথেষ্ট সন্দেহজনক। কিন্তু কী ক'রে স্বামীকে বলা যায় একথা ?

হঠাৎ রাস্তা দিয়ে ঢোল আর কাঁসি বাজতে বাজতে চলে যেতেই মারিয়ার মনে পড়ল, নাজিয়া, ব'লেছিল, মা আমরা পুজোর কালেকশনে যাচ্ছি। অতএব সে দুর্গাপুজোর কালেকশনেই বেরিয়েছে, তাই চা খাওয়ার পর বেশিক্ষণ বসেনি, সিগ্রেটের প্যাকেটটাও ভুলে রেখে গেছে ছেলেটি। উৎপল খুব ভুলো। গলার স্বরটাও বিকাশ রায়ের মতো ধারালো, দোতলা থেকেও কানে এসে লাগে। এতক্ষণ এসব কথা মনে পড়ল না কেন ? তাহলে সাহেবকে এই রকম পাগলের মত দৌড়তে হ'ত না! আমার খুব বলতে ইচ্ছে করে, উৎপল যথেষ্ট ভাল ছেলে, একটু বেশি স্মোক করে, কখনও বাজে কিছু দেখিনি। কিন্তু উনি আজকাল কেমন বিরক্ত হচ্ছেন। মারিয়া মনে মনে বোকার মতো ভেবে চললেন কত কিছু। সাদিক কি আজ ফিরবে না ? অনেকদিন কোথায় কোথায় পালিয়ে যায় ছেলেটা।

জাফর সাহেব ফিরলেন। মনের অবস্থা ভয়ানক খারাপ ক'রে ফিরে এসেছেন বোঝাই যাচ্ছে। কোন কথা বলছেন না। চুপচাপ ঘরে ঢুকলেন। পোশাক বদলে বাথরুম হ'য়ে বারান্দায় ইজিচেয়ারে সটান শুয়ে মাথার দিকে দু'হাত তুলে চোখ বুজলেন। মারিয়া পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই চোখ খুলে চোরাটানে দেখলেন ঘাড় একটু কাৎ ক'রে। আবার চোখ বুজে বললেন :

– নাজিয়া তোমাকে মিথ্যে ব'লে বেরিয়েছে। লাইব্রেরি ওরা যায়নি। ছেলেমেয়েরা কখন মিথ্যে বলে, এটা তোমার বোঝা উচিত!

কালেকশনে গেছে। আমার মনে ছিল না। মারিয়া অপরাধীর গলায় জানালেন।

—কালেকশন ? কেন ?

—বারোয়ারী পুজো।

না! যেন ধমকে উঠলেন জাফর।

—না কী ? দুর্গা মায়ের পুজো। বন্ধুদের না করতে পারে না!

—তা আমি বলছি না। আমি বলছি, ওরা কালেকশনে যায়নি, বেলডাঙ্গায় মার্ডার দেখতে গেছে। ভাবতে পারো ? কী হিম্মত!

— কালেকশনে যায়নি ? মারিয়ার কণ্ঠস্বর কেমন চিন্তিত শোনাল।

—মুস্তাফা কী মিথ্যে বলেছে ? বাসস্ট্যান্ডে নিজে চোখে দেখেছে, বেলডাঙ্গার বাসে উঠেছে নাজিয়া।

—নাজিয়া একা ?

—একা কি দোকা, মুস্তাফা কী ক'রে বুঝবে ? মুস্তাফা অন্যদের চেনে ?

বই জমা রাখে আর ইস্যু করে, এই তো পরিচয়। তোমার মেয়ের ক'টা বন্ধু, ক'টা কালো ক'টা ফর্সা তা সে জানবে কী ক'রে ?

—দ্যাখ! মুখটা তোমার বড্ড খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। নাজিয়া যায়নি। বেলডাঙ্গা যায়নি, আমি বলছি!

—বলছ ?

—হ্যাঁ বলছি। ও আমাকে কালেকশনের কথাই ব'লে গেছে।

—কেন ? কালেকশনে যাবে কেন ? হিন্দুর পুজোর কালেকশনে যেতে হবে কেন ? সেদিন কোন্ বন্ধুর বাড়ি থেকে কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে উঠে এলো, বললে, এটা রাবীন্দ্রিক! চমৎকার! চমৎকার! ঐ ফোঁটাটাকে সহনীয় করার জন্য রবীন্দ্রনাথকে টানা হ'ল। এভাবেই চলুক! গজগজ করতে থাকেন জাফর সাহেব। হঠাৎ দুম্ ক'রে বললেন ঃ

—কেন, সে একটু আধটু নামাজ পড়তে পারে না ? ওকে যদি শুধাও, তোমার মাবুদ কে, বলতে পারবে ? আচ্ছা, কোন্ নবীর আমলে মহা প্লাবন হ'য়েছিল আর নবীজী কিস্তি বানিয়ে তাবৎ সৃষ্টি রক্ষা করেছিলেন, শুধিয়ে দেখবে ত!

—ও জানে। এটা জানবে না ? সেদিন শুধালাম, বলল, নোয়া। ওটারই গল্প হচ্ছিল। হিন্দু মুসলমান ব'লেই না, সব ব্যাপারেই ওর আগ্রহ। ঠিক তোমার মতো। তুমি ওকে ভুল বুঝো না। নোয়ার কাহিনী অনেকেই জানে।

—নোয়া! নুহু নয় ? নুহু বলল না ? তা বলবে কেন ? মুশাকে মোজেস, ঈশাকে যেসাস, আজরাইলকে গ্যাবরাইল। আশ্চর্য!

—আরবী ইংরাজীর তফাৎ! একই তো কথা!

—না এক নয়। তছবী গোনা আর থলেয় হাত ঢুকিয়ে কেষ্ট কেষ্ট করা এক না। ঈদ আর পুজো এক ? একই যদি হবে, তবে বেলডাঙ্গায় এক ধাক্কায় এই মাত্র পাঁচ-পাঁচা-পঁচিশটা লাশ প'ড়ে গেল। সবগুলো মুসলমান। সব মসজিদ থেকে নামাজ প'ড়ে বেরিয়েছে, আর্মি বি. এস. এফ.-রা গুলি ছুঁড়েছে।

—গুজব।

—গুজব ?

—হ্যাঁ। ভোরেই শুনলাম, এক মুসলমান ঝাঁকাবালা একটা ঘোষের মেয়েকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, আবার শুনলাম, না, তা নয়। এই ঘোষই নাকি এক চাষীর আবাদ নষ্ট করছিল গরু চরিয়ে কোন্‌টা সত্যি ?

—গরু কিম্বা রেপ কোনটাই সত্য নয়। হয়ত তাই। কিন্তু মানুষ মরছে, এটা মিথ্যে না।

—তবে বাতাসে কান পেতে ব'সে ব'সে নিজেকে এরকম উত্তেজিত করছ কেন? তুমি গত বছরও দাঙ্গার সময় এরকমই নার্ভাস হ'য়ে রাত্রে ঘুমুতে না।

—দ্যাখো মারিয়া, বাইরের পৃথিবীটা তোমার ঐ ঠাণ্ডা নিস্তরঙ্গ সুখী সুখী চেহারার মতো নিরাপদ নয়। সেখানে অনেক দুঃখ। তা অনেক সর্পিল আর হিংস্র। ক্রুর। তার এক একটা ঝাপটা লাগে বাইরে থাকি ব'লে। স্বামীর কথার জবাবে বলতে গেলে কথার পিঠে কথা, অনেক কথাই ওঠে, সে এক মস্ত বিবাদ বেধে যায়। থাক ওসব। বাইরে নিশ্চয় খারাপ কিছু ঘটেছে। স্বামীর পাশে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে মিষ্টি ক'রে শুধালেন—বল না কী হয়েছে তোমার। আমি এমি সুখী হয়ে থাকি, তুমি কি চাও না?

—চাই ব'লেই তো কষ্ট পাই। নাজিয়া বেরিয়ে গেল, একজন এসে ডেকে নিয়ে গেল। কে একজন, তুমি জান না। এটা কী রকম কথা?

—জানি তো!

—জানো? তবে চেপে থাকছ কেন? তুমি নাজিয়ার অনেক কথা গোপন করছ আমাকে।

—গোপন নয়। আমি দেখিনি, কে এসেছিল, মনে হচ্ছে উৎপল।

—কী ক'রে বুঝলে?

—ছেলেটা সিগারেট খেয়ে ঠোঁট পুড়িয়ে ফেলেছে। নিচের ঠোঁটে শ্বেতীর মত দাগ। নিচে গিয়ে দেখি, একটা প্যাকেট, তাতে একটা সিগারেটও রয়েছে। ও ছাড়া কেউ না।

—তবে তো হ'ল!

—কী হ'ল?

—আরো মারাত্মক ব্যাপার। আজ ওরা দু'জন এক সঙ্গে ঘুরবে। তুমি মা হ'য়ে বোঝ না মেয়েটা প্রেম করছে?

মারিয়া একটু উদাস হ'য়ে বললেন—আমি কোন প্রমাণ পাইনি।

—আমি পেয়েছি।

—তুমি কিসের প্রমাণ পেলে?

—পেলাম।

চোখ তুলে বউএর মুখের দিকে চাইলেন জাফর সাহেব। যেন তিনি চূড়ান্ত কোন প্রমাণ হাতের মুঠোয় ধ'রে রয়েছেন।

—যাও, এক কাপ চা নিয়ে এসো।

সাহেব খুশীর সুরে বললেন।

মনে হ'ল, একটা মস্ত বড় রহস্যের কিনারা হ'য়ে যাবে এখনই, এ মুহূর্তে এক কাপ চা যেন তারই পুরস্কার। চুলের মধ্যে আঙুল থেমে গেল। মারিয়ার চারপাশে কতকগুলো গোলাপ পাপড়ি ডানা মেলে উড়তে লাগল। পূব কোণে

মেঘ জমল। সন্ধ্যা নামল পৃথিবীতে। বৃষ্টি হবে। কী এমন প্রমাণ, উনি পেয়েছেন, ভাবতে ভাবতে চা করলেন মারিয়া। চায়ে চুমুক দিয়ে জাফর এবার গম্ভীর আর বিষণ্ন হ'য়ে উঠলেন।

—আজ কেন দুপুর বেলা ঐভাবে বাড়ি চ'লে এলাম জানতে চাইলে না? প্রশ্ন করলেন তিনি। মারিরা বললেন তুমি নিজে থেকেই বলবে মনে করেছি। তাছাড়া সময়ই তো হ'ল না।

সাহেব বললেন - জামিল আজ ভোরবেলা মারা গেল। ওর কথা তোমায় কখনও বলিনি?

—না বোধ হয়।

—নিশ্চয় বলেছি। একজন পিয়ন মাত্র। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, আমার অফিসের একমাত্র মুসলমান ছোকরা। রোজ আমাকে দু'বেলা আস্‌সালামো আলাইকুম করত। যেই সে সালাম দিত, অম্নি আমার মনের মধ্যে আমিই যেন ব'লে উঠতাম, আমার নাম কাজী জাফর। পিতা কাজী আকবর। মাতা—আমিনা। দাদাজী কাজী সালাউদ্দিন। বউ-এর নাম মারিয়া। একমাত্র কন্যা নাজিরা। শুনছ ভাই, আমি কিন্তু একটি হিন্দু পাড়ায় থাকি। আমার দাদাজী আহাম্মক, তিনি সব থাকতে হিন্দুদের মধ্যে গিয়ে অট্টালিকা বানালেন। আর সেই দাদাজীকে গাঁয়ের মুসলমানরাই দাঙ্গার সময় হিন্দুদের দোষ লাগিয়ে গুম ক'রে দিল।

—কমপ্লেক্স।

মারিয়া মন্তব্য করলেন।

—তা বিচিত্র নয়। কিন্তু ছেলেটি আর কোন দিন আমায় সালাম দেবে না, আমি অফিসে গিয়ে কারুকে বলতে পারব না, ওয়ালেকুম্ আস্‌সলাম। এই জন্যেই তুমি অত ঘটা ক'রে নামাজ পড়লে। —মারিয়া গম্ভীর হ'য়ে বললেন। তিনি চাইছিলেন প্রমাণটা কী? বলুক না!

জাফর বললেন না। তার জন্যও নয়। এই দুঃসংবাদে অফিস যখন, যাকে বলে মুহ্যমান, তখনই এল তোমার ভাই ফারুক। সাথে সেই ওয়াশেফও ছিল। দুটি কারণে আজ নামাজ পড়া।

—ওয়াশেফও ছিল?

—হ্যাঁ।

—সে তো আমাদের বাড়িতে ওদের আড্ডায় মাঝে মাঝে আসে যায়।

তাই নাকি?

– তোমার খুব পছন্দ বুঝি?

—পছন্দ ফারুকের। ফারুক বললে, ভাইজান, ঐ হিন্দু পল্লী থেকে মাসখানেকের জন্য আমার গরীবখানায় উঠে আসুন। মারিয়াও ঢের দিন আসে

না। থাকবে দু'দিন। আর সেই ফাঁকে বিয়েটাও হ'য়ে যাবে। আমি বললাম, বিয়ে হোক বা না হোক, ওপাড়া থেকে আমাদের উঠে যাওয়াই দরকার। বারো মাসে তেরো পার্বন চলছেই। রছুলের হালুয়া রুটির উৎসবটাও ঠিক মতো হয় না বাড়িতে। বললাম, দ্যাখো, যা হয় করো। মারিয়া রাজী হ'লে কালই চলে আসতে পারি।

—যাবে নাকি? —মারিয়া স্বামীর মনের খবর জানবার চেষ্টা করেন।

স্বামী বললেন—সেটা তুমি ভেবে দেখো। কিন্তু আমি তোমাকে একটা অদ্ভুত কথা শোনাব এখন। সেদিন নাজিয়া চেয়ারে ব'সে চা খাচ্ছিল আমারই সামনে। কাঠের টেবিলে একটি ইংরাজী অক্ষর চায়ের কাপের তলার গোল-বৃত্তের জল টেনে টেনে লিখে যাচ্ছিল। ইংরাজীর ইউ। আমি একটু কড়া করে নজর ফেলতেই সে সেটাকে ডবল্যু ক'রে দিল।

—U-টা উৎপল, W-টা ওয়াশেফ? বলেই মরিয়া বাচ্চা মেয়ের মতো ঠোঁট ছুঁচলো ক'রে হাসলেন। জাফর সাহেব গলায় একটু অতিরিক্ত জোর দিয়ে বললেন—U-কে W করতে নাজিয়ার খুব বেশি কষ্ট হবে না। কতজন A-কে Z ক'রে দেয়। টিন-এজাররা এতটাই উল্টোপাল্টা করতে পারে।

মারিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—এখনও নাজিয়া এলো না। ব'লেই দ্রুত বারান্দার মোড়া ছেড়ে নাজিয়ার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন। —আমার মাথা ধ'রেছে। আর পারি না।

এই সন্ধ্যায় খাটে গড়িয়ে পড়লেন মারিয়া। স্বামী কিছুক্ষণ চুপচাপ ব'সে থেকে ইজিচেয়ারটা হাতে উঠিয়ে নিয়ে চলে এলেন নাজিয়ার দরজার মুখে। একটা কেমন আরামের শব্দ করলেন মুখ দিয়ে। তারপর ফের কাৎ হ'লেন। বললেন—তুমি কিন্তু ইউ আর ডবল্যুর ব্যাপারটা উড়িয়ে দিচ্ছ মনে হচ্ছে।

মারিয়া চোখ খুলে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলেন—জেড-এ জাফর। নামটা ইংরাজীর জেড দিয়ে শুরু। গোলাপ ফুলটির নাম আশিকুল। ইংরাজীর A তাঁর জীবনে Z হ'য়ে গেছে। কথাটা যেন বিদ্রুপের মতো বেজে উঠছে। একদিন আশিকুল পুষ্প প্রদর্শনির মেলায় ভীড়ের মধ্যে মারিয়ার হাত চেপে ধ'রে ঘুরছিল, এমনিতে নিতান্ত গরীব ব'লে ভীষণ ভীরু। তবু হাতটা মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে ঘেমে উঠেছিল, তার নাড়ির মধ্যে আশ্চর্য কম্পন টের পাচ্ছিলেন মারিয়া। এই আশিকুল একদিন সন্ধ্যার সময় শিবতলার চৌমাথায় এসে বলেছিল, চলো হাইরোডে উঠে যাই। মারিয়া মুচকি হেসে বুঝেছিল, আশিক নির্জনতা খুঁজছে। হাইরোড দিয়ে চলতে চলতে চলতে সন্ধ্যার অন্ধকারে ফাঁকা রাস্তার ওপর নতজানু হ'য়ে হঠাৎ কোমর জড়িয়ে ধরলো, দুই হাঁটু পাকা সড়কে রেখে নারকেল গাছের মতো দু'হাতে মারিয়াকে বেয়ে বেয়ে উঠতে লাগল, পাগলের মতো আবেগের ধাক্কায় কাঁদতে লাগল।

কী ছেলেনানুষী! মারিয়া আশিকের জীবনে একটি বিরাট দীর্ঘ নারকেল গাছ হ'য়ে থেকে গেছে, যার শীর্ষে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি, বরং উঠতে উঠতে ক্লান্ত হ'য়ে নিচে সড়সড় ক'রে পড়ে গেছে, তার বুক এবং হৃদয় ছড়ে গেছে, গাছের গোড়ায় নেমে গিয়ে আকাশে চোখ তুলে দেখেছে, এই গাছের মাথায় যে স্বপ্ন ঝুলছে, তা কখনও ছোঁয়া যায় না। ওটা কেবল চেয়ে চেয়ে দেখতে হয়। আশিক পাগলের মতো কেঁদে ছিল। সেই কান্নাটা এখন মারিয়ার বুকের মধ্যে মিউমিউ ক'রে কাঁদছে।

মারিয়া স্বামীর কথায় কোন উত্তর দিচ্ছেন না। স্বামী প্রসঙ্গটা ধীরে ধীরে পরিবর্তন করলেন—বেশ, ধ'রেই নিচ্ছি। এটা কোন প্রমাণ নয়। ওটা ইউ নয় কিম্বা ডব্লিউ নয়। কোনটাই নয়। কিন্তু তুমি মা, আর এটা হিন্দু পাড়া। তুমি তো জানো আর এস এস আমাদের পেছনে। এমন কি সন্তান-দলও আমাদের দেয়ালে রাম নারায়ণ রাম লিখে রেখে গেছে, এটার মানে হ'ল সাবধান, মেয়ে সামলাও, এরপর জুলুম চলবে, তোমাদের মেয়ে হিন্দু ছেলে-গুলোকে ক্ষ্যাপাচেছ।

—কুৎসিত! জঘন্য! ফুঁসে উঠলেন মারিয়া। তুমি প্রত্যেকবার দাঙ্গার সময় এই রকম সাম্প্রদায়িক হ'য়ে ওঠো, বাজে বকতে শুরু কর।

—সাম্প্রদায়িক হই কি সাধে! তুমি মোটেও জান না, হিন্দুরা তলে তলে মিটিং করছে বোমা মেরে কবে এই বাড়িটাই উড়িয়ে দেবে।

কথাটা ব'লে জাফর চেয়ারে বেশ মজা ক'রে দুলতে লাগলেন।

আমাদের বিপদ সব দিকে। হিন্দুরাও আমাদের ঠিক মতো নেয় না। আবার মুসলমানরাও কেমন দূরে দূরে থাকে। একবার এক হিন্দু বন্ধুই বলেছিল, কী যেন কথাটা! সবই তো আমার হিন্দু বন্ধু, কবে ছেলেবেলায় কারা যেন ছিল, সবই রাখাল পাখাল, একজনকে সেদিন দেখলাম ইয়া দাড়িবালা খতিব, বললে, শুনলাম, ভাই সা'ব তোমরা নাকি ধর্মান্তরিত হচ্ছ। শুনেই গা রি-রি ক'রে গেল। এই শালা খতিবদের ভালবাসা যায়! কিছু মনে ক'রো না, আমি সব খতিবদের কথা বলছি না। এদের কী ক'রে ভালবাসব, এরাই আমার দাদাজীকে গুম ক'রেছে। তা সেই হিন্দু বন্ধু ব'লেছিল, আমরা নাকি বড় মুসলমানরা হিন্দুদের গা-লাগা হ'য়ে থাকতেই ভালবাসি। এরা দু'পক্ষই আমাদের সন্দেহ করে। জিন্নাৎরা কেমন ড্যাং ড্যাং ক'রে ঢাকায় চলে গেল। আমাদের কোন মাটি নেই। শুনছ? এ্যাই? আমরা এপারে প'ড়ে সুজলাং সুফলাং করছি।

মারিয়া হঠাৎ খাট ছেড়ে উঠে এসে স্বামীকে ধমকেই উঠলেন—তুমি একটু চুপ করবে? বলছি না আমার মাথা ধ'রেছে।

—ধরবে না? একটু যদি ভাবনা হয় তো মাথা নিশ্চয় ধরে। এত রাত

হ'ল, অথচ মেয়েটি কোথায় রইল কেউ বলতে পারে না। ...এই রে, নাও সামলাও এখন। হ'ল তো?

—কী হ'ল?

দেখছ না আকাশে বিদ্যুত চমকাচ্ছে। বৃষ্টিও শুরু হ'ল।

বলতে বলতেই আকাশে ভয়ানক জোরে বাজ ডেকে দূরের একটি বিদ্যুৎ তার পুড়ে ঝলসে খানিক দূরে কেমন আলো জ্ব'লে পৃথিবী অন্ধকার হ'য়ে গেল। চেপে বৃষ্টি নামল।

রাত্রির অন্ধকার এবং বৃষ্টি আরো গাঢ় হ'ল। আশ্বিনের আঁধি নেমেছে আকাশ থেকে। চেয়ারে কতক্ষণ চুপচাপ ব'সে থাকলেন জাফর। তারপর আপন মনে ব'কে যেতে থাকলেন, মারিয়ার ঘুম আসছে না। জেগে জেগে স্বামীর ডায়ালগ্ শুনছেন।

—আমি দেখতে পাচ্ছি। দৃশ্যটা সেই রকম, যেমনটা সিনেমায় দেখা যায়। ওরা দু'জন বারান্দার শেডের নিচে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি আর হাওয়ার ঝাপটায় বিদ্যুৎ চমকের আলোয় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ভিজছে।

মারিয়া মনে মনে বললেন—ভিজুক।

আশিককে বার বার মনে পড়ছে তাঁর। বৈঠকখানার সেই বাঘ-গর্জানো দৃশ্যটিও। দাদাজী বাঘ ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু দয়ালুও ছিলেন। জীবনভোর কত গরিবের কত উপকার করেছেন। বাড়ির কিষাণকে পাঁচ বিঘা জমি লিখে দিয়েছিলেন। সেই কিষাণের ধুম-ধাম করে বিয়েও দিয়েছিলেন। সেই দাদাজীর মুখে গিয়ে প'ড়ে গেল ওরা। বৈঠকখানার দু'টি দরজা। বাড়ি থেকে বৈঠকখানায় এক দরজা দিয়ে ঢুকে অন্য দরজা দিয়ে বাইরে চলে যাওয়া যায়। ওরা দু'জন দোতলার সিঁড়ি ভেঙ্গে হৈ-চৈ ক'রে নেমে দৌড়ে বৈঠকখানায় ঢুকল, আশিক ওকে ধরবার চেষ্টা ক'রে পিছু পিছু ছুটছিল, বৈঠকখানায় ঢুকেই ভয়ে কুঁকড়ে গেল দুজনেই। ছিটকে চলে গেল বাইরের দরজার কাছে আশিক। এদিকের দরজার মুখে মারিয়া নিজে। তার চুলের জোড়া বিনুনি ঘাড়ে ঝুলছে। দুই চোখে কান্না এসে গেছে।

দাদাজী ভারী গলায় শুধালেন—মরিয়ম (দাদাজী মারিয়াকে মরিয়ম ব'লে ডাকতেন) তুই ওকে ভালবাসিস? এই দাঁড়াও, যাবে না। আশিককে ইঙ্গিত করলেন দাদাজী। আশিক মমির মতো নিষ্প্রাণ দাঁড়িয়ে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগল।

—বলো মরিয়ম! ভালোবাসো নাকি? ঠিক কথাটা বলবে। আমি কারো ক্ষতি করব না। বলতে হবে ভালোবাসো কিনা। উত্তর দাও। চুপ ক'রে থেকো না।

মারিয়ার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। মাথা নেড়ে বেণী দুলিয়ে

নিঃশব্দে ছোট্ট মারিয়া ( ১৬ বছর বয়স ) না না ক'রে উঠল। কিছুতেই বলতে পারল না, হ্যাঁ বাসি। ওর সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দাও দাদাজী। ···আজ মনে হচ্ছে, ওইভাবে কেঁদে মাথা না নাড়লে জাফর তার জীবনে ঢুকতেই পারত না।

দাদাজী বললেন—ভাল যখন বাস না, তখন এই কানামাছি বন্ধ হোক। যাও মরিয়ম, উপরে যাও। নিচে নামবে না। আর তুমি···আশিকের দিকে চোখ ঘোরালেন—এ বাড়ি কখনও এলে আমি তোমার নামে মামলা ঠুকে দেব। ব'লেই তিনি বাঘের মতো গর্‌র গর্‌র্‌ ক'রে হেসে উঠলেন। ১৬ বছর বয়স এমন কিছু কম নয়। ঠিক এই বয়সেই জাফর এসে দু'তলার ঘরে ব'সে তার সাথে প্রেম করল। তারই মামাত ভাই জাফর। দাদাজী প্রশ্ন করলেন না, আমি জাফরকে ভালবাসি কিনা। ···আমি বিদ্রোহ করেছি···মারিয়ার মন হু হু ক'রে উঠল।

স্বামী এসে মারিয়ার শুয়ে থাকা দেহের পাশে ব'সে ঝুঁকে মুখ নামিয়ে বললেন।

—কালকে যাচ্ছি তো আমরা? রাত দশটা বাজছে। মেয়ে ফেরেনি। যাচ্ছি তো? একটা সুযোগ হাতছাড়া হ'য়ে যাবে।

—না বহরমপুরে দাঙ্গা হবে না। তোমার বাড়ি কেউ পুড়িয়ে জ্বালিয়ে দেবে না। তুমি চুপ করবে কিনা বলো।

ব'লেই মারিয়া খাট ছেড়ে নেমে বারান্দায় এলেন। নিচের দরজার কড়া নেড়ে কে যেন বৃষ্টি আর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে মাসীমা মাসীমা ব'লে ডাকছে। সাদিকের গলা নয়। অন্য কেউ। নিশ্চয় নাজিয়া ফিরল। বৃষ্টিতে ওরা ভিজে গেছে। ঘরের বিদ্যুৎ চলে গেছে। কালি পড়া টেবিল ল্যাম্পের আলো হাতে দরজা খুললেন মারিয়া। উৎপলের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে নাজিয়া। একখানা পা সামনে তুলে আছে। পায়ে ব্যাণ্ডেজ। আঁৎকে এক বিঘৎ পেছনে স'রে এলেন মারিয়া। অস্ফুটে বললেন

—কী ক'রে হ'ল?

উৎপল বলল—এমন কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার নয় মাসীমা সামান্য কেটেছে।

—কিসে কাটল?

—কাচে।

—আচ্ছা দাঁড়াও। আস্তে আস্তে উঠবে।

ওরা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। সামনে আলো দেখিয়ে এক পা সিঁড়ি ভেঙ্গে দাঁড়িয়ে মারিয়া ওদের উপরে তুলে আনলেন। উপরের শেষ সিঁড়িতে ওঠবার সময় নাজিয়া উৎপলের ঘাড়ে মাথাটা আরো ঘনিষ্ঠ ক'রে নামাল।

চোখ বুজে ভিতরে শ্বাস টেনে ধরল। ১৯ বছরের নাজিয়া। শরীরের এই ভাষা চিনতে পারছেন মারিয়া। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাপের চোখ আলো অন্ধকারে দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলতে লাগল। উৎপলের চোখে মুখে কেমন একটা চাপা বেদনা পাথরের মতো শক্ত হ'য়ে চেপে ব'সে আছে।

বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ছোট্ট একটা যাচ্ছি ব'লে উৎপল ঘাড় একটু নিচু ক'রে দ্রুত বারান্দা পেরিয়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। নাজিয়া চোখ বুজে শুয়ে রইল। বাপ এসে প্রদীপ তুলে মেয়ের মুখ দেখে বেরিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন। ওদিকে দরজা বন্ধ ক'রে দেবার শব্দ শোনা গেল।

মারিয়া স্তব্ধ হ'য়ে মেয়ের পাশে খাটে বসলেন। রাত্রি ১১টা বাজছে। নাজিয়া চোখ খুলছে না। উৎপলের স্পর্শ সমস্ত রোমকূপ দিয়ে এখনও বাতাস আর বৃষ্টির মতো ঢুকছে ঝাপটা দিয়ে। নাজিয়ার শরীর ফুলে ফুলে উঠছে। মারিয়া দেহের নিরাকুল এই ভাষা স্পষ্ট পড়তে পারছেন। বললেন, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

নাজিয়া চোখ বন্ধ রেখেই বললে—কোথাও না।

কথা শুনে চমকে উঠলেন মা। বললেন—পাড়ার অবস্থা খুব খারাপ। আমাদের চলে যেতে হচ্ছে।

—কোথায় মা? আদুরে গলায় শুধালো নাজিয়া। চোখ খুলল না। বললেন—ছোট মামার বাড়ি।

—কেন মা?

মারিয়া বুঝলেন, কোন কথাই মেয়ের কানে ঠিক মতো ঢুকছে না।

—বললাম তো! এখানে থাকা চলবে না। তুমি বেলডাঙ্গা যাওনি?

—না।

—কোথায় ছিলে?

—সিনেমায়।

—এতক্ষণ সিনেমায় ছিলে?

—বৃষ্টি এল যে।

পা কাটল কেন।

—বৃষ্টির সময় দৌড়তে গিয়ে।

মারিয়া বড় দু'টি বাক্সে জামা কাপড় সাজাতে শুরু করলেন। নাজিয়া চোখ খুলে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকল। কিছুক্ষণ বাদে আবার এক প্রশ্ন করল—মামাবাড়ি কেন মা? কালই যেতে হবে?

হ্যাঁ। কাল খুব ভোর ভোর উঠে পড়বে।

—উঠব। কিন্তু সেখানে যাচ্ছি কেন আমরা?

—ছোট মামার ওখানে আমরা এক মাস থাকব। তোমার ছোট মামা খুব কড়া জাতের মুসলমান। বাইরে বাইরে মেয়েদের ঘোরাফেরা পছন্দ করেন না।

তোমার সফুরা ফুপুমা'র ছেলে ওয়াশেফ বাংলাদেশ থেকে এসে ফারুক মামার ওখানে থাকছে জানোই তো? ওয়াশেফ খুব ভাল ক্যারাম খেলে, ওর সাথে খেলবে তুমি। ঐসব উৎপল অরুণাংশুরা যেন ফারুক মামার ওখানে আড্ডা দিতে না ছোটে। ব'লে দিও।

—দেব। ওয়াশেফ ভাইতো মাঝে মাঝে আমাদের এখানেও আসেন।

—অবশ্য তুমি ইচ্ছে করলে ওয়াশেফের সঙ্গে বাংলাদেশও চলে যেতে পারো।

—আচ্ছা মা, আমি বাংলা দেশ গিয়ে যদি কখনও আর না ফিরি, তোমার বুঝি খুব কণ্ট হবে?

—কণ্ট হ'লেও তো থাকতে হবে মা! দূর পারে তোমার যদি বিয়ে হয়, ধরো বাংলাদেশেই যদি বিয়ে দিই, যদিও তা হ'য়ে যাচ্ছে এমন কোন কথা নয়, তবু ধরো কথার কথা, তাই যদি হয়, আমাদেরও তুমি ডেকে নেবে, আমরাও বাংলাদেশ গিয়ে থাকব। তোমার কাছেই না হয় বাকী জীবনটা কাটবে।

—বাংলা দেশের চাটগাঁ খুব ভাল জায়গা শুনেছি, পাহাড় আর সমুদ্র পাশাপাশি। ওয়াশেফ ভাই নিয়ে গেলে, আমি চ'লে যাব।

—তাই যেও। এখন একটু ঘুমোও। পায়ে কি খুব যন্ত্রণা হচ্ছে?

মারিয়ার কণ্ঠস্বরে মেয়ের ওপর হঠাৎ কেমন স্নেহ আর বিরক্তি ঝ'রে পড়ল। নাজিয়া একটু অবাক হ'ল। বলল—ঠিক আছে। কোন যন্ত্রণা নেই। তুমি ঘুমোবে না?

—ঘুমোব। এখনও কিছু গুছনোর কাজ বাকি।

ঘুম আসে না মারিয়ার। বারান্দার অন্ধকারে ঘুরে বেড়ান। দেখতেই পাচ্ছেন, বাপের কথাই ঠিক, U-এর W হ'য়ে উঠতে সময় এক মাসই যথেণ্ট। মেয়ে তাঁর, তাঁরই জীবনের পুনরাবৃত্তি মাত্র। শুধু W-এর মধ্যে একটি U চিরকাল লুকিয়ে থেকে মিউমিউ করবে।

বারান্দাতেই ইজিচেয়ারে ব'সে থেকে শেষ রাতে ঘুমিয়ে গিয়ে ভোর হ'য়ে গেল। চোখ খুলে এদিক ওদিক চেয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ মেঝেয় চোখ প'ড়ে চমকে উঠলেন মারিয়া। টাটকা রক্ত। নিশ্চয় মেয়েটা বাথরুমে গেছে। কিন্তু না, বাথরুম হবে কেন, এযে উল্টো দিকে সিঁড়ির মুখে নেমে গেছে। এই তো সিঁড়ির ওপর রক্তের দাগ। শেষ সিঁড়িটাতেও ছোপ লেগে রয়েছে। তারপর ড্রয়িংরুমের মেঝেয় কম রক্ত পড়েনি। তারপর চৌকাঠেও রক্ত। দরজা খোলা।

নাজিয়া চলে গেছে।

হঠাৎ যেন ১৬ বছরের মারিয়ার গালে চড় মেরে কে যেন ব'লেছে, বল্ ভালবাসি। বল্! মিথ্যুক কোথাকার! বেণী দুলিয়ে কখনও আর ওভাবে মাথা নেড় না।

বুঝলে?

# চোত পবনের কেচ্ছা

শাদা চন্দনের মতো মাটির রঙ। সব পুকুরেই এই ধরন এই বরণ মাটি পাওয়া যায় না। কোথাও বালি বেশি, কোথাও এঁটেল। দো-আঁশলা মাটিরও সব রঙ চন্দন নয়। চন্দন-মাটি বিশেষ মাটি। যুগি পাড়ার হিতেন দেবনাথের তড়াগে এই মাটির সন্ধান আছে। শিবানী সেই পরিচয় জানে। সখীদের সে বলেছে ঘাস-চাপাতি পটকা-লতি তুলতে তুলতে ! পটকালতির পটকা দেখতে হুবহু পটল। কিন্তু তা বলে বাস্তবিক পটল তো নয়। সেই রকম শাদা হলেই সব মাটি চন্দন হয় না। চন্দনমাটি চন্দনেরই মতন। সখীরা জানে শিবানী সর্বদা কথা ঠিক বলে। মাটি চেনে, ফুলফল লতাপাতা চেনে, জল চেনে, সাপখোপ চেনে। এমনকী সে শ্যামা ঘাস আর সুধান্যের গাছপাতার পার্থক্য দেখিয়ে দিয়ে বলে—এই হল শ্যামা আর ঐ হল বেগুন-বিচির ঝাড়। ধানের নাম বেগুন-বিচি সেকথা মেয়েরা শিবানীর মুখেই শুনেছে।

গত বছর বৈশাখে খয়রামারির একজন দাড়ি-অলা মুসলমান গাঁওয়াল-করা ফীরি-অলা এসেছিল আমলা বেচতে। আমলার সঙ্গে শুকনো আম-কড়ালি ( গুটি আম ) মিশিয়েছে। ধরে ফেলল শিবানী। মুখে খিস্তি দিয়ে বলল— শালা, তুমি মিশেলদার ঘুঘু, মেয়েদের আমলায় কড়ালি মেশাও, তোমাকে পুলিশে দেব, হারামি !

ভয়ে লোকটির দুই চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। আধেক দামে দুটি হাঁস-ডিমের বদলে আমলা কিনল শিবানী। সবাই কিনল যার যার মতন। মধুমিতা এক কুনকে গমের বদলে একঠোঙা বাগিয়ে নিয়েছিল। তা যাক গে। কথা হচ্ছে, মাটির কত রকম রঙ, গাছের কত রকম রঙ, গরুর কত রকম রঙ,

লতাপাতায় সবুজ রঙটাই কত রকম, জলের রঙও কত বর্ণ! আর গন্ধ? আমলার গন্ধ আর কড়ালির গন্ধ আলাদা এমনকী। মেটে-সিঁদুর আর রক্ত-সিঁদুর আলাদা। পিপল শুকালেই কি হলুদ হয়? এঁটোলি সরু ক'্যাট হলুদ হলই বা। সব ভিন্ন ভিন্ন। সেই কথাই হচ্ছে যে রক্ত-সিঁদুর আর মেটে-সিঁদুর দুটি আলাদা কিসিমের রঙদার জিনিশ। একটা ওঠে এয়োর সিঁথিতে, অন্যটি তেল মাখিয়ে শিবানী মোষের শিঙের গোড়ায় মাথায়। শিবানীরা চাষী মাহেশ্ব। যেবন মাহেশ্ব আর মাহেশ্বরী আলাদা। মাহেশ্বরীরা ইসলামপুর গঞ্জের বেনে মাড়োয়ারি। পাট কেনে, আড়তদার। মাহেশ্বরা পাট বেচে, গাঁড়াবেড়ের গেরস্ত। একজন বাবু, অন্যজন কাবু।

সেই সূত্রেই শিবানী গরু চরায়। শিবানীর সখীরা গরু চরায়। চাপাতি তোলে। আমলার 'পেন্ট' মাখে মাথায়, চন্দনমাটির 'স্যাম্পু' করে চুলে। সে-কথা শিবানীও জানে। 'স্যাম্পু' কথাটা শিবানীর না-শোনা নয়। কিন্তু শুনলেই তো হল না। ডিমের বদলে 'স্যাম্পু' কেনার সাধ্য তার নেই। তা হল 'স্যাম্পু'র অপমান, চন্দন-মাটিরও অপমান। তা যাক গে, বলেই দড়ির নথ টেনে মোষের মুখটা ফসল-পাতির দিক থেকে আইলের চাপাতি ঘাসের দিকে টানে। ঘাস-চাপাতি আর চাপাতি-ঘাস আলাদা তৃণ। তৃণ মানে ঘাস সে-কথাও জানে শিবানী। যেমন জানে ঘৃত মানে ঘি, মৃত মানে মরা। বিদ্যাসাগর মশাই লিখেছেন। আচ্ছা, কোন্ একটা 'স্যাম্পু'র মধ্যে নাকি ডিমের কুসুম থাকে, বাসবদাদা বলেছিল। হবেও বা। কিন্তু কিনতে গেলে ডিমের বদলে 'স্যাম্পু' তো হবে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুলের গোড়ালি হাতের ধাক্কায় পেছনে ঠেলে সুন্দর গ্রীবাভঙ্গি করে শিবানী। মোষের পিঠে চড়ে আছে কোনো এক বুনো সম্রাজ্ঞী। তার যে মোষ মাগীমোষ। পেছনে নথ-দড়ি-টানা বাচ্চা মোষ। সকাল থেকে দুপুর অব্দি গরু। বিকালে মোষ। সন্ধ্যা নাগাদ। কৃষক-দুহিতার মোষ হচ্ছে নাগর-দোলা আর হাতি-র ঝুলি। সে চরিয়ে ফিরছে একা। একাকিনী।

ফাল্গুনের শুরুতেই চরাচর শুকিয়ে এসেছে। হাটে সবজি শস্তা হয়ে গিয়েছে চোত-ধুলির মতন। বাবা গেছে চোত-বেগুন বেচতে সুপারি-গোলার হাটে। বাবাকে একটা নখ-পালিশ আনতে দিয়েছে মা। তার কারণ আছে। সে-কথা নিজেকে এখন আপনমনে শুনিয়ে বলবে না শিবানী। অভিমানে ওর ঠোঁট ঈষৎ স্ফুরিত হয়। দাঁতে ঠোঁট দংশায় সে। হাতের দড়ি টেনে মোষ সিধে করে।

মোষের ত্বক আর রূপসীর ত্বক কত আলাদা। অথচ দুই ত্বকই নাচার। কাদার হিম আর লতাগুল্মের গাছ-গাছালির নিবিড় ছায়া ভালোবাসে। ফাল্গুন চৈত্রের ধূলি-ধূসরিমার আচ্ছন্ন প্রকৃতিতে হিম তল্লাস করে তনু ও গতর।...

মোষের গতরে বিজলি খেলছে। মাদি মোষের পেট ঢোলা ঢোলা। পেট পুরলে দুপাশে কাৎ-মারা দুখানি কালো ঢালআকাশ। সে-কারণে মনে হয় আকাশে অর্থাৎ পেটের চামড়ায় বিদ্যুৎ খেলছে। কালো-নিকষ আকাশে বিদ্যুতের লতা দৌড়চ্ছে। সেটা কালোর নীচে নীচে চমকাচ্ছে, চোখে দেখলে বোঝা যায়। শিবানী সেই বিজলি-পারা চমকানি শরীরে ধারণ করে। গায়ে স্পষ্ট টের পায়। মোষের গন্ধ বিটকেল, দেবনাথের তড়াগে নাড়ামাজা করে নির্গন্ধ করে। সাফ মোষের গন্ধহীনতার বদলে মাটির গন্ধ মাখায় শিবানী। মোষের ঘাস খাওয়ার শব্দ বড়ই বিষণ্ন। ফেণায়েও। ধুধুতার মতন 'মন-কেমনিয়া'। শিবানীর জন্য শব্দগন্ধ আছে। প্রকৃতির চেনা স্পর্শ-স্বাদ ও বর্ণায়ন আছে। সবই দেহী হিসেব। দেহে ধারণ করে শিবানী, ভোগ করে। এখন যেমন করছে। মোষের বিদ্যুৎলতা তরঙ্গ ছড়াচ্ছে দেহে। পা বেয়ে উঠছে সেই বিদ্যুৎ। রক্তে গোপনে খেলা করছে। পা বেয়ে আসছে, দুপায়ের সন্ধিস্থ গোড়ায় এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে, সেই শিহরণ অদ্ভুত। দুপায়ের সন্ধিমূলে অনাঘ্রাত পদ্মর বয়স ১৬ বছর। সেই পদ্মমায়া বিধবা। সেই বিদ্যুৎ-কেন্দ্র পুরুষহীন। শিবানী পাপী। শিবানী মনে করে। কারণ সে সাপে-কাটা কিশোর স্বামীর সঙ্গে সহ-মরণ, সতীদাহ পায় নি। সে বঞ্চিতা। বাপ মোষ বেচে বর কিনে দেবে। আজও বৃদ্ধ শতাব্দীর কিনারে হিন্দু-ঘরে বিধবার বর দুর্লভ। বাপ বৃদ্ধ-বর চায় না, দোজবর চায় না, টাটকা এক নম্বর জোয়ানি চায়, বর্ষার ঘাসের মতন তেজি। হয় না।

শিবানী দেখল কোথায় ছায়াদান, সবই শুখা। চারিদিক শাপান্ত মাঠ। মাটি। তড়াগ। মোষের বিদ্যুৎ যে কষ্ট দেয় তাকে। বারবার চোখের সামনে কল্পনাতুর মন-বানানো স্মৃতির ছবি টাঙিয়ে দেয়। স্বামী ছিল তার। দুবছর আগেই তার বিয়ে হয়েছিল। দুজন পাশাপাশি শুয়েছে। দেহ নিয়ে ভাসাভাসা অনভিজ্ঞ খেলাও করেছে কোনো এক দুর্দান্ত কিশোর। তারপর? কোনো এক বর্ষারাতে মেঝে-সাপ মাটি ফুঁড়ে স্বামীকে খেয়ে গেল। দেহে দেহের ভাষা স্পষ্ট ফুটে ওঠার আগেই চিতা জ্বলল। শিবানী কেবল সেই তরঙ্গ মনে করতে পারে মোষের গায়ে জমা আছে। মোষ এখন ছায়ায় এসেছে, আউলা হাওয়ায় চুল উড়ছে, হিম-বাস মাখা ঠাণ্ডা ঢেউ। বুকের ভিতর আগাম চোত পবনের হুহু-করা চাপা চিৎকার শিবানীকে পিষছে। চারপাশে সতর্ক চেয়ে দেখল কেউ নেই। তারপর হিহি করে হেসে উঠল। মোষ বেচারি ঘাস থেকে মুখ তুলে গম্ভীর হয়ে মাঠের কিনারা অব্দি শূন্যতায় চেয়ে রইল একা। তারপর মুখ নাড়াতে লাগল আপনমনে। ফেণা উপচে উঠল না বটে, কষে দাঁতের ঘর্ষণ যেন শিবানীকে চিবিয়ে ফেলছে কলিজা অব্দি। বাপ সুপারি-গোলার হাটেও বর খুঁজবে শোনা যায়। বাবা কী বোকা, কোন গামছাবালা জোলা নাকি খবর

দেবে বলেছে! মেয়েমানুষ কি হাটের সামগ্রী? চৈত-বেগুন, ভেসে-বেড়ানো ধুলো? কে জানে এই জীবনটা কী ধারায় মাটিতে গড়েছেন ঠাকুর। আবার এ-কথা ভেবে খিল খিল করে হেসে উঠল শিবানী সরকার। আপনা আপনি চোখ টিপল কার সঙ্গে। গাড়াবেড়ের মাহেশ্ব। বাপ দুল্লুভ সরকার, সাধু ভাষায় দুর্লভ। মা সর্বানী। সর্বানী মাহেশ্ব। ছেলে কৈবর্ত। তা যাক গে, বলেই শিবানী দড়ি টানে আনমনা। কিন্তু ভাবনা তো মন থেকে যেতে চায় না।

মোষ আর শিবানীর গায়ে আমের ছায়া, কাঁঠালের ছায়া ভাসছে এইমাত্র। দূরে উঁচা ডিহি-পথে একটা ডেঁয়ো পিঁপড়ের পানা মানুষ আসছে দৌলতডিহি থেকে, রোদের তরঙ্গে কাঁপছে ছবিখানি। কে লোকটা? ডেঁয়ে পিঁপড়ের মতন দেখায় কে? সেই ব্যাপারিই বটে বা। কেননা ডেঁয়ো পিঁপড়ের পেছনে পুঁটুলি মতন ওটা চা-পাতি আইস-বাক্স। চা-পাতি আর চাপাতি আলাদা। এবং ডেঁয়ো পিঁপড়ে যখন মানুষ তখন সে-ও আলাদা বৈকি! আইসক্রিম বেচে দৌলতডিহির তুফানি। ওরাও সরকার। তবে মাহেশ্ব সরকার নয়, মুসলমান সরকার। ছ'মাস আগে লোকটা বউ ছেড়েছে। আর এই মাঠের নিঝুল নির্জনতায় এসে শিবানীকে বলেছে—তোর জন্যে আছমাকে ছাড়ান্ করলাম শিবানী।

কথা শুনে শিবানী কাঠ-ঢোক গিলেছে গলায়। তুফানি তো হরবোলা, আইসক্রিম বেচা সুন্নি পুরুষ। এ-কথা এই মাঠ-ছাড়া কেউ যেন না শোনে হরি! যত খাট এই মাঠের! এই ছায়ার! এই মোষের বিজলি খেলানো কালো গা-খানির! অমন পুরুষের শোভা দাঁড়িয়ে দেখতে, মোষের পিঠে বসে দেখতে মন চায় কেন? হায় ভগবান! সেই ডেঁয়োই তো আসছে এখন। ভাই মোষ, তুমি আমাকে টেনে নিয়ে পালাও হে হস্তিনী! দড়ি টানে শিবানী। মোষ হঠাৎ ছায়া পেয়ে গা আলগা দিয়ে দুইচোখে পৃথিবীর প্রতিচ্ছায়া শুষছে অন্যমনস্কে। কথা শুনছে না।

মোষ দেখলেই ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে বাচ্চা মোষের মতন অসভ্য করুণ গলায় কাঁদবে লোকটা।

দু'মাস আগে পেটের বাচ্চা প্রসব করেছিল মৃত। মৃত বাচ্চা শুঁকে দেখেছিল মোষেনি। সেই থেকে বাচ্চার ডাক শুনলেই কান খাড়া করে জঙ্গলে ঘুরবে। আগের (পূর্বের জাতক) বাচ্চাটা পিছুপিছু কাঁদবে, সে খেয়াল নেই। পিঠের উপর যে বিধবা রাণীর মতন শোভা পাচ্ছে, গাছগাছালিতে লতাগুল্মে গা কাটবে, সেই বিচারও তার নেই। এমনই পাগল হয়ে বাচ্চা খুঁজবে, মানুষের নকল গলাও চিনতে পারেনা। মাগি ভারি বজ্জাত! আর ঐ ফিকিরবাজ কুট তামাসা-করা সুন্নি নরেনের মায়ের এক দঙ্গল হাঁস গলায় কামুক

ডাক ডেকে গাড়াবেড়ে থেকে মেদিনীপুরের দহ-তে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, এতই হারামি তস্কর! নরেনের মা কেঁদে আর খিস্তি করে আকুল হয়েছে গত মাসে। সেই ডেঁয়ো আইসক্রিমের ভেঁপু বাজিয়ে মাঠে মাঠে ছুটছে। কে ওর ভেঁপু শোনে মাঠের অপদেবতা ছাড়া? মোষেনি সেই ভেঁপু শুনছে মনে হচ্ছে। চোখ দিয়ে গিলছে। তা কে জানে এক বাক্স বরফ নাকি এক বাক্স গলতে থাকা ঠাণ্ডা আ-ছোঁয়া ভালোবাসা! কে আসছে সাইকেল ঠেঙিয়ে এদিকে?

ঝোপের আড়ালে সাইকেল লুকিয়ে দাঁড়াল তুফানি সরকার। ভেঁপু থামিয়ে বাচ্চা মোষ হয়ে গেল। কান-খাড়া হয়ে উঠল মোষেনির। লেজ নড়ল। লেজ-তুলে শিবানীর খালিপিঠে মারল ছুরি-গাছার মতন শক্ত ঝাঁটি। গায়ের কাপড় বুকের দিকে প্রস্থ করা। ফলে পিঠ খালি ছিল। চমকে মৃদু আর্তনাদ করল শিবানী। শিবানীর পিঠ চিরল, রক্তাভ দাগ পড়ে গেল। বুকের ভিতরটা রি রি করে উঠল। ভয়ানক রাগ হচ্ছিল নিজেরই উপর। সে জানে চুল মানেই চন্দন-মাটির স্যাম্পু-উড়নী চুলের উড়ুউড়ু ব্যবহার তো নয়। মোষেনির চুল লেজঝাড়ুনি চাবুক, বিধবার দাগা! ঝোপের দিকে এগিয়ে চলল মোষেনি!

বাপ তার জন্য হাটে বর খুঁজছে। বিধবার জন্য মরদ খুঁজছে। এক জোলা খবর দেবে বলেছে। মা বলেছে নখ-পালিশ আনতে। শিবানী হাতে মেহদি পরে ছিল মুসলমানদের মতো (এখানকার হিন্দুরা মেহদি পরে না)। তুলসী হিন্দুর। মেহদি মসলমানদের। মা বলেছে, ভগবান হিন্দু-মোছলমানের জন্য আলাদা আলাদা গাছ তৈরি করেছেন। সে-কথা ভুললে জাত যাবে। ভগবান যেখানে আলাদা গাছ বানায়, সেখানে তোমার উচিত না সব গাছের কাছে যাওয়া। গাছ চিনে চিনে যেও। সাবধানে যেও। পুরুষ হল গাছ, মেয়ে হল লতা। যাকে তাকে জড়িয়ে ফেল না মা! বিধবা তুমি, উতলা হলে চলবে!

এই জঙ্গলে বিধবার মতন কোনো ভীরু দামাল লতাও নিশ্চয়ই আছে। আর গাছ? ভাবতে পারে না শিবানী।

তুফানি মোষ ডাকছে। মোষেনির পেটের আকাশে বিজলি চমকাচ্ছে! পা বেয়ে আসছে। গা শির শির করছে।

মোষেনি আর গাছে গা ঘষড়ে চাম-নুন তুলে দেয় শিবানীর। তারপর ঝোপের দিকে দৌড়ায়। কী সাংঘাতিক! বৈঁচির ঝোপ! শিবানীর আঁচল কামড়ে ধরে। চরম তৎপরতায় শিবানী কাপড় দুহাতে চেপে ধরতে না ধরতে কাপড় ফরফর করে ছিঁড়ে যায়। ভয়ে দুহাতে খানিক ছিঁড়ে বৈঁচি-ঝোপেকে দিয়ে দেয় শিবানী। নে, আমার ইজ্জৎ খা গাছ। খা তুফানি হাওয়া।

হাওয়াও খাচ্ছে বিধবার গা, ঝোপেও খাচ্ছে। আর মানুষ? মানুষও-

নাকি এক ধরনের গাছ। হবেও-বা। কেননা মাটি হচ্ছে এক ধরনের চন্দন সাবান। শিবানী ভাবতে পারে না। কেঁদে ওঠে।

শিবানীর কান্না দেখে শিশুর মতন হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে তুফানি। হাওয়ার দাপানিতে ঝোপ এখন হুলুস্থুল। আবার বৈঁচি কাঁটা শিবানীকে আঁকড়ে ধরে, শাড়ি আর দেহ বিক্ষিপ্ত হয়। মনে পড়ে বাপ হেটুরে হন্যে। বর খুঁজছে। মুখে না বললেও হিন্দু-পুরুষ অন্যের এঁটো বিধবাকে পাক-স্পর্শে প্রবেশাধিকার দিতে কোথায় যেন বাধক মানে, বর-পণ হলই-বা পাঁড়ি মোষ। দুধেল জন্তু।

চারপাশ মুসলমান ঘেরা গ্রাম-ব্যবস্থা। মাঝে সাত ঘর মাহেশ্ব। তিনঘর গোয়ালা ঘোষ। দু'ঘর কুমোর। চারঘর ধীবর। একঘর নাপিত। চারদিক বেষ্টিত এই যে ব্যবস্থা, মুসলমানরা রোখা, দলভারি, আবার সরল সোজাও বটে, সেই কথাই তো গাওনা করে মা! মাথায় আমলা দিলে বকে। ওসব গরিব মুসলমানের সিঙ্গারি। মেহদিপাতা নাকি আরবের মরুভূমির আদি জাতক। মা কি সব জানে! কোথায় কে জন্মায়! মা জানে না বৈঁচি গাছ লতা, না গাছ! কোথায় জন্মেছে! মা সব বানিয়ে বানিয়ে বলে।

সমস্ত গা ছড় নামাচ্ছে রক্তের ধারায় ঈষৎ। যন্ত্রণার চোটে আর ভয়ে শিবানী জোরে চিৎকার করে। বুকের কাপড় বৈঁচিকে ছিঁড়ে দিয়ে সে চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। বাঁচোয়া যে সে বৈঁচির ঝোপের মধ্যে পড়ে নি। তাবৎ গা বৈঁচির নখে ক্ষতবিক্ষত। বুক আল্‌গা। সেদিকে চোখ পড়ে তুফানির। হাত দিয়ে চোখ ঢাকে সে। কান্নায় যন্ত্রণায় দুহাতে বুক ঢাকে শিবানী। তারপর মোষ ফেলে বাড়ির দিকে পালাতে শুরু করে। মা কিছুতেই মাথায় আনতে পারে না কীভাবে তার মেয়ে বলাৎকার হয়ে গেল। তুফানি ভয়ে লজ্জায় মাথার উড়ানিতে চোখ বেঁধে সেই ঝোপের আড়াল ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে।

রাত হয়েছে। পাতলা কাঁথায় গা ঢেকে শুয়েছে শিবানী। দাওয়ায় লোকজন গিজগিজ করছে। লোকে জানে কোথায় কী হয়। মেয়েটা যে ধর্ষণ হয়ে গেল সে-কথা মা মুখে না বললেও সবই অ-গোপন আছে। মেয়েকে রক্তাক্ত করে দিয়েছে পশুটা। এখন কথা হচ্ছে, সেটা হিন্দু না মুসলমান। সেটা হরবোলা না মানুষ! হরবোলা তুফানিকে তো বাবা মানুষ মনে করে না। নইলে, শিবানী বলে দিত কে তার সর্বনাশ করেছে! আর বলত—হরবোলার সাথে আমার বিয়ে দাও বাবা। ও আছমাকে তালাক করেছে আমারই জন্যে। আর দ্যাখো, তুমিই কতদিন মাহেশ্ব বর খুঁজে হয়রান হয়ে বলেছ, মুসলমান পেলেও বিয়ে দেবে। গরুচরানি বিধবার জন্য শুধু বিরক্ত হলেই কি জাত বাঁচে বাবা। মা ভয়ে সিঁটোয়, লোকে শোনে না তাই, নইলে মুসলমান বিয়ে যে দেবে সে শুধু জাতের অভিমান বাপ গো! মা'কে ভাঙ্গি নি, মাঠে আমার কী

হয়েছে। তুফানি যে কত ভিতু তা কে জানত! ভেঁপু বাজাতে বাজাতে কী জোরে পালিয়ে গেল!...বেঁচির জাত নাছোড়, ধর্ম তার কাঁটায় মা গো! আমার পরাণ ছিঁড়েছে। ভাবতে ভাবতে দুচোখে জল গড়ায় শিবানীর। মায়ের হৃদয় ছ্যাঁতায়, ভিজে ওঠে। বল্ মা, নাম বল্, কে তোর বস্ত্র-হরণ করেছে, কোন চাঁড়ালের পো বলে দে!

মা শুধায়—তোকে কি কুল-ঝোপে চিৎ করে শুইয়েছিল লোকটা? দাঁতে আর নখে কামড়েছে, গায়ে খড়ি তুলেছে! বল্ শিবানী বল্!

মাঠ থেকে ছুটতে ছুটতে কাদার কুমে ছিটকে পড়েছিল শিবানী। কাদার দাগে রক্তে আঁচড়ে ছিন্ন ভিন্ন নারী। মা মেয়ের গা-খানাও ভালো করে চেয়ে দেখল না, গাছ-কাঁটা না নখের আঁচড়। সে-তার মেয়ে, শিবানী, কোন গাছের জ্বালা খেয়েছে। বাইরে মুসলমানরা কেবল মুখে ফুটে শুনতে চায় কে সেই লোক? মাথায় ঘোল ঢেলে, কেউ বলছে, মাহেশ্ব রাজি থাকলে শাদি পড়িয়ে দেবে। সবই হচ্ছে জনরব। অথবা মনে হচ্ছে ঐ ধারা। অবশ্য পুলিশ ডাকার ভয় দেখালে মুসলমানেরা বৈঠক ছেড়ে উঠে চলে যাবে। শুধু ঘোল ঢেলেই খালাস। একটা মচ্ছব মতন ভাবনার ঘোলানি। চিন্তার চাপে মানুষের সাতসতের গাওনা হয় মনে। তার কিছু সত্যও হয় ঘটনে অঘটনে।

বাপ চুপচাপ নিথর হয়ে বসে আছে। যেন লোকগুঞ্জনের ভেতরেও শুনশান মানুষ। কোনো কথা তার কানে যাচ্ছে না। থানায় বললে মেজবাবু নির্মল রাজবংশী তুফানিকে এমন ধোলাই দেবে যে আরো একবার ছোকরার হাজামত হয়ে যাবে, ভারি কমিউনাল লোক দারোগা। সবই হতে পারে। আবার কিছুই না-ও হতে পারে। মানুষ কিছুতেই মাথায় আনতে পারছে না গাছের কাঁটা মানুষের নখের মতন।

মায়ের চোখের দিকে এবার সন্দেহ ভরে তাকাল শিবানী। মনে হচ্ছে মা সবই বুঝেছে, চোখের তারায় কোনো গোপন চাতুরি আছে, কোনো কুহক! নিজের সঙ্গে নিজেরই এক মস্ত ধন্দ আছে কিছু। তুফানি তো এই বাড়িরই কিষেণ ছিল, মাসিক দরমাহায় (বেতন) খাটত, লাঙ্গল চষত। তখনই তলে তলে ভাব হল তাদের। এমন ঘটনা গাঁ-মুল্লুকে আখছার চাপা থাকে সমাজশাসানির ভয়ে। মাহেশ্ব ঘোষ আর মুসলমানে মহরমের লাঠি অব্দি খেলে, মাহেশ্বদের আলদা জুলুশ চলে গোরাবাজারে, লোকে আজকাল নিন্দে করে বলে, মুসলমান রোখার সেটা নাকি পাল্টা মিছিল। ভালো জিনিশও আজকাল মন্দ হয়। সে কথাও শুনেছে শিবানী। এসব সত্ত্বেও সরকার সরকারে জাতপাত পৃথক রয়েছে ধর্মের গুণে। আলাদা না থাকলে ধর্ম থাকে না। যে-কথা মা বলে দিবানিশি। এত সত্ত্বেও ন'মাস কাজ করেছে তুফানি সরকার, স্বামী অপঘাতে মরে যাওয়ার পর মন-চেতন ভালোবাসা ঐ সরকারেরই সঙ্গে, তা-ও কতখানি

মন-চেতন কে জানে, সেটাই তো অর্থে মনের তুইথুলি মুইথুলি পাখির তক্ক-করা।

মনে হচ্ছে মা সবই বুঝেছে মাঠে কী হয়েছিল। তাই-বা বুঝবে কেন! একদিন কেবল শিবানী মাকে বলেছে, মাঠে একলা যৌবন আগলুহারা মা, হিন্দু মেয়েতে মুসলমানের ভাব নানাখানা। ভয় করে। বেধবা রাখালে বলে গরু-চরানি মোষ-চরানি বাগালি করছি, মাসে মাসে শতেক টাকা বাঁচছে গেরস্তির, সেইখানে মন বসিয়ে দিব্যি আছ তোমরা, আমার যৌবনকে সবাই নোংরা করে খুঁটছে হামেশা প্রতিবাসী, সেই ভাষণ তো শুনতে হয় না। এতবড় ধাড়িঙ্গে মেয়ে মোষ চড়ে, সেই দামালি কেওটের ( কৈবর্ত ) ঘরেই শোভা পায়, মন করে মোষে চড়ে দৌলতডিহি চলে যায়, লোকে বলবে হিন্দুর মেয়ে কিষেণের সঙ্গে ভেগেছে, সেই ঠাট্টায় বাপ গলায় দড়ি দেবে! হুঁ!

বিড়বিড় করে শিবানী। বাপ-মা সব কথা শুনতে পায় না। কিন্তু বাপও সব বোঝে, রাতে শুয়ে মেয়ের সমস্যায় বাপ বিছানায় ছিলুবিলায়, মা চুঁইয়ে কাঁদে।

এখনও বিড়বিড় করছে শিবানী। মা চেষ্টা করছে মেয়ের কথা শুনতে। অন্য মেয়েরাও চাইছে মেয়ে বলুক মেয়ে বলুক সেই একটা লম্পটের নাম। সখীরা চাইছে শিবানী যেন কথা না বলে। তারা জানে বাইরের মজলিশে বোকা হরবোলা এসেছে, গলায় মাঝে মাঝে কালপেঁচা ডাকছে। সেই ডাক শুনতে পাচ্ছে শিবানী, তার গায়ে কাঁটার দংশনে জ্বর আসছে। কী হবে তা তো কেউ জানে না। হিতেবিপরীত হবে কিনা কে বলবে! কিন্তু হরবোলা এল কেন হেথায়? জ্যাঠা এসে বলে গেল—সুন্নিরা সব তৈরি হয়ে এসছে মেজবউ। মসজিদে মৌলবী বসে আছে। আমরা পাঁচভাই তেললাঠিতে তেল মাখিয়েছি কি সাধে? আজ হাঙ্গামা হবে। মাথা ফাটবে। মেয়ের দোষ, না ছেলের দোষ, সেই বিচার করবে ওরা? মেয়েকে নাকি আমরা দীঘড়ী দিয়ে মাঠে ছেড়েছি, এমন অপবাদ শুনতে হল শিবানী।…কথা মা থেকে ছা-এর দিকে ঘোরে।

ঘরের সবাই হিন্দু বটে। সকলকে মা একে একে বাইরে তাড়িয়ে দিলে। একজনই কেবল গেল না। তার গা থেকে, মাথার চুল থেকে আমলার গন্ধ ভেসে আসছে। সেই গন্ধ নাকে লাগছে শিবানীর। আছমা শিবানীর পায়ের কাছে বসে আছে। সব বুঝতে পেরেও শিবানী চোখ খুলছে না।

জ্যাঠা চলে যাবার পর বাপ এল। শিবানীর কানের কাছে মুখ গুঁজে বলল, মোসলমানেরা কী করবে বুঝতে পারছি না মা। আমার ভাইয়েরা লেঠেলি করতে চাইছে। লেঠেলি করলেই বিপদ। থানা পুলিশ হবে, তোর বদনাম রটে যাবে। তখন তোর বিয়েই দিতে পারব না। কেউ আমার মানা শুনছে

না মা। তুই মুখ বন্ধ করে রাখ। ছেলের নাম বলিস না। নাম বললে বেচারির হাত-পা গুঁড়িয়ে দেবে মোসলমানরা। ভয়ানক শাস্তি দেবে মা!

বাপ চলে যেতেই মা শিবানীর কানে কানে, চাপা সুরে বলল—চেপে থাক শিবানী। মা আছমা, তুমি ঐ কাল-পেঁচাটাকে চলে যেতে বল মা।…

শিবানী বুঝতে পারছিল সব মানুষই বুঝছে মাঠে কী সাংঘাতি হাওয়া উঠেছিল। হাওয়া মানে তুফানি। কী অবাক। মুসলমানরা হরবোলাকে কঠিন শাস্তি দিয়ে দেখাতে চাইছে তারা কত ভালো মানুষ। কিন্তু হরবোলা সেই শাস্তি পাওয়ার জন্য মজলিসের চারধার ঘেরা অন্ধকারে ঘুরছে কেন পেঁচা ডেকে?

আছমা বলল -নাম বুলো না ভাই। পাপের কথা রাষ্ট্র করতে নাই। গলা তুলে সে বলল সে-কথা। তারপর কানের কাছে মুখ নামাল আছমা। হরবুলা পেঠিয়েছে তুমার কাছে। আমি বেধবা দালাল। স্বামী থাকতে নাই। এখন তো সেডা পর - পুরুষ। তবো সেই পুরুষের কথা ঠেলতে পারিনি বুবু। হরবুলার নাম ঘুষণা করো বহিন। তেনাকে একটা দাগ দেও। কানে কানে বুলছি দিদি, নাম হাঁকো, পেঁচাড়া কেন্দে মরছে।

শিবানী গায়ের কাঁথা সরিয়ে উঠে বসল। শুধাল—নাম বললে তোমার কী? তুমি কেন এসেছ?

—মুনের টানে দিদি! তুমাকে তুষ্ট করলে ও যেতি খুশি হয় সেই কারণে বুবুজান!

—তোমাকে কি হরবোলা নেবে ফের?

—যেতি দয়া হয়।

—কিন্তু এখন শাস্তি চাইছ কেন? ও তো কোনো পাপ করেনি।

—সেডাই তো মহব্বৎ দিদি সোনা! দাগ আর দাগা।

—কিন্তু অপমান?

—সেডাই ইজ্জৎ বহিন।

চমকে উঠল ষোড়শী। রাতারাতি গল্পের মেয়েটি ভালোবাসার জ্ঞানে সত্যিকার দিদি হয়ে গেল। মৌলবী সাহেব বজ্রগলায় শুধালেন—কে সেই কুফরি কাম করে? নাম বলো মা!

আমলা মাথা করুণ বিধবার দিকে চাইলে শিবানী। আছমা তার দিকে চোখ সরু করে চেয়ে আছে। মৌলবী সাহেবের কণ্ঠস্বর বলে দিচ্ছে, তিনি হরবোলাকে শাস্তি দেবার জন্যই এসেছেন, বিয়ে-শাদি মিথ্যে কথা। দেশ শাসনই তাঁর কর্তব্য। বাপরা যে তর্জন করছে, সব মুখ্য। মুসলমানে তো ছার। কেওটকে বামুন অব্দি ডরায়, সব নকশা। কিন্তু মানুষের মনের বর্ণ

কী বিচিত্র! স্বাদ কী অদ্ভুত! সবার দিকে চোখ তুলে দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় নরম করে শিবানী। পেঁচাটা চুপ করে আছে।

হঠাৎ পুলিশের জিপের পিঁ। তাবত মজলিশ সঙ্গে সঙ্গে নড়ে চড়ে পালাতে শুরু করে। দু'চার জন লোক আর মৌলবী সাহেব তখন ঠায় দাঁড়িয়ে। দারোগা জিপ থেকে নেমে শিবানীর সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রশ্ন করে, মাঠে কে তোমাকে এ্যাটাক করে ?

শিবানী বুঝতে পারছিল ঝোপে ঝাড়ে সব লোকজন লুকিয়ে তার ঘোষণা শুনতে চাইছে। পেঁচাও চুপ।

শিবানী স্পষ্ট গলায় উচ্চারণ করল—মোষ। কালো ভয়ানক একটা মোষ দারোগাবাবু। ওটা বেচে বাপ আমাকে বর কিনে দেবে! কেউ না। কিছু না। সব মিথ্যা! সব ভুল! খালি দাগ আর দাগা।

বলতে বলতে ডুকরে উঠল শিবানী। মাটি-মাখা স্যাম্পুচুলগুলি মৃদু হাওয়ায় কাঁপছে। তার ছেঁড়া শাড়ি তখনও উড়ছে বৈঁচির কাঁটার ডালে, হাওয়া উঠছে এবার।

— —

# অন্য নকশি

রুহুল ফকির পরম বিস্ময়ে মাথার আকাশে চেয়ে রইল কোন এক আশ্বিন মাসে। গতকাল আশ্বিনে-আঁধি শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে, আকাশ থেকে এখনও একখানা চটা-মেঘ সরে যায়নি। থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিথর। ওপারে কুষ্টিয়ার মেলায় এপারের কীর্তনাঙ্গের দানাদার বাউল-গান শোনাতে গিয়েছিল সে। ওপারের গানে কীর্তনীয়ার চমক নেই, আছে ফকিরি সারল্যে সহজ গীতিময়তা। সেই মেলার সম্মিলনে এইসব কথা উঠেছিল। আরো অনেক কথাই উঠেছে, আসন-সংক্রান্ত সমালোচনা হয়েছে। আসনে-ফকির কী প্রকার গোঁড়া, মতিচ্ছন্ন শিষ্যশাবকদের প্রতি কী চাতুরী করে, সব কথাই হয়েছে প্রচুর! যেখানে আসন সেখানেই দুর্নীতি।

রুহুলের মন ভাল নেই। এখন তার আঁধি-নিষিক্ত হাওয়ায় কাঁড়িয়ে শীত ধরেছে। চরে হাওয়ার প্রহার খুব মারাত্মক। চেয়ে দেখল, মেঘের পেটে বাজ আর আগুন এখনও নিহিত, ক্রোধ যায়নি সবখানি। চমকাচ্ছে মৃদু মৃদু। চটা মেঘ উদাসীন। কিন্তু মনে তার আশ্চর্য গুমোর। ঢালবে মনে হচ্ছে।

রুহুল দাঁড়িয়েছে ভি-পয়েণ্টের উপর। ঠিক তখনই এক মৌলবী সাহেব সাইকেল নিয়ে পূব-মুখো দাঁড়িয়ে। ওপারে এক চাকা, এপারে আর এক চাকা। এক রীমে ভারতবর্ষের কাদা, অন্য চাকায় বাংলাদেশী কাদার ন্যাড় জড়িয়ে গেছে। মনে মনে রুহুল ইংরাজদের শাসনপদ্ধতির অপূর্ব মহিমার তারিফ করে। তারপর মৌলবী মিজানজীর কালো কার্ল-মার্ক্স-মার্কা ঝাঁকড়া খাটো সুন্নতের দিকে তাকায়। মাথায় জড়ানো কালো পশমী মাফলার, গায়ে হলুদ রঙা খদ্দরের মোটা চাদর। কিছুটা কিম্ভুত দেখায়। পা খালি, হাঁটুর

উপর এক পায়ের লুঙ্গি উঠে গিয়েছে। কাদায় খালি পা ম্যাড়ম্যাড় করছে। সকাল থেকে বিকাল অব্দি রোদে চরের এঁটেল কাদা পুরোপুরি শুকায়নি। মেঘের গলায় অকস্মাৎ ফাটা শব্দ হয়। জমিনের মাঝামাঝি ওরা দাঁড়িয়ে পড়েছে। মিজানজীর জমি এটা। জমির মাঝ বরাবর সীমান্তরেখা টেনে রাখা হয়েছে। অবশ্য তা চোখে দেখা যায় না। শুধু দু'একটি বিক্ষিপ্ত ছিটনো পিলার চোখে পড়ে। এটা একটা ভি। ইংরাজীর V। ভি-য়ের এলাকা। সীমান্ত-রেখা সরল নয়। বক্র। এঁকে বেঁকে উঠে নেমে যায়। ফলে ইংরাজী V-আকৃতি গড়ে ওঠে। এই V-এর দুই বাহু, আর বাহুমূল আছে। বাহুমূলে দাঁড়ালে, এক চাকা বাংলাদেশ, অপর চাকা ভারতবর্ষ।

মৌলবী স্থির। মেঘের দিকে চাইলেন। বললেন—আছ ছালামো আলা সানিত্তা আবাল হুদা।

কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল রুহুল। এ-কেমন সহবৎ দেখাচ্ছেন খোদার বান্দা। ছালাম দিচ্ছেন বুঝি? কিন্তু রকম যে অন্যধারা মনে হয়। কথার কী মানে খোদা মালুম! কিন্তু আলাপ মন্দ নয়। বেশ বেশ। রুহুল বলে—ছালাম মৌলবী সাহেব।

—জী। আছ ছালামো আলা মানিত্তা আবাল হুদা।

মৌলবী ফের গলায় সুর তোলেন। শুধিয়ে ওঠেন—গান গাইতে যাওয়া হয়েছিল বেশরা ফকিরের?

রুহুল নির্লিপ্ত উত্তর করে—আজ্ঞে! হয়েছিল। কিন্তু আপনার আরবী-খানার অর্থ তো বোঝা যায় না মিজানজী।

মৌলবী বলেন—কিছু নয় ফকির সাহেব। ছালামই দিলাম আপনাকে।

রুহুল কিঞ্চিৎ আহত গলায় বলে—এমন তো কখনও শুনিনি।

মৌলবী জবাব করেন—তা শুনবেন কেন? এ-ছালাম তো সচরাচর দেওয়া হয় না। সকলে জানেও না। বিধর্মীদের জন্য এটা স্পেশাল। এটাই বৈধ। 'আছ ছালামো আলাইকুক' দিতে নেই। ওটা মুসলমানদের নিজস্ব রীতি, নিজেদের মধ্যে। আপনাকে ওইটেই দিলাম।

যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে খানিকটা এসেছে, পুরোপুরি ইসলাম গ্রহণ ক'রে মুসলমান হয়নি বা হতে পারেনি, তার জন্য এই নমস্কার।

রুহুল বলে—বেশ করলেন। আমরা তো মুসলমান নই, এই ফকিররা। কিন্তু কোরান-হাদিসের মধ্যে এত বড় অপমানের ব্যবস্থা আছে, আমার জানা ছিল না। যাই হোক। ছালাম দিলেন, আপনার হাঁটুর উপরে কাপড়। সেটা কি ঠিক হ'ল

মৌলবী বললেন—গু-মুত খাওয়া ফকিরের বেলা এইটেই জায়েজ মনে করি। তা এখন যাবেন কোন্ পানে? হারুডাঙ্গা তনুর ঘর? বিটির আমার কত

প্রকৃতি। সেই প্রকৃতির কত ফের-ফাঁপর। সাত-ভাতারীর ষোলকলা, কিন্তু 'আছে-কি-নেই-ভাতারীর' চৌষট্টি। যান চলে যান। আসমানের মেঘখানার মতোই বিটি আমার হামলায়। এক আইলে ঢালে, অন্য আইল শুখা। খটখট করে। দ্যাখেন ক্যানে, কেমন ফুরফুরিয়ে নীলা করছে।

রুহুল চেয়ে দেখে, সত্যিই বড় অদ্ভুত দৃশ্য। বৃষ্টি হচ্ছে। পশ্চিম আকাশে সূর্য সুবর্ণ! পুব-আইল ভিজিয়ে দিচ্ছে মেঘ। পশ্চিম ভাগ শুকনো। বাংলাদেশ ভিজে যায়। একই মেঘ ভারতবর্ষে বৃষ্টিচ্ছায়া গুটিয়ে রেখে ঝরে যাচ্ছে ওপারে। নিয়মউল্টোও হয়। দেখতে দেখতে রুহুল ফকির প্রকৃতির রকমারিতে দিশে হারিয়ে ফেলে। মৌলবীর ক্ষেতের একভাগ সিক্ত, অন্য ভাগ শুকনো বিস্ময়ে নিশ্চুপ। মৌলবীর গলা থেকে তপ্ত সীসে ফকিরকে মর্মে বিদ্ধ করে। ফকির হাঁটতে শুরু করে হারুডাঙ্গার বস্তীর দিকে। মনে মনে বলে—কোরান-হাদিস, তোমার নিজস্ব সম্প্রদায়ের সম্পত্তি। সেখান থেকে তোমরা আমাদের উচ্ছেদ করতে চাও। তোমরা বল, বিসমিল্লা, আমরা বলি, বীজ মে আল্লা, মানুষ বীজরূপী। এই বিশ্ব বীর্যময়। সে মর্ম তুমি কখনও বুঝবে না শরার মৌলবী। চিরকাল আমাদের গু-মুত খেতেই দেখলে। রূপ-রস-বীজ-মাটির করণ বিষম করণ, কী করে বোঝাই তোমাকে? চলি, তোমাকেও সালমা দিই, আছ ছালামো আলা মানিত্তা আবাল হুদা। তুমিও আমার কাছে বিধর্মী বই নও। তবে তোমার জন্য একখানা গান শুনিয়ে যাই, ওপার থেকে এনেছি। রুহুল দোতারায় সুর টানে ঃ

আহা রে খোদার বান্দা
কার প্রেমে আছো বাঁধা?
একদিন তোর হবে আঁধার
ভাবে বোঝা যায়।
টাকা পয়সা জমিদারি
পাইয়া সুন্দর নারী
করিতেছ বাহাদুরী
এই দুনিয়ায়।

মৌলবী মিজানআলি পায়ের তলার জমিনে নিচু হয়ে ভুরভুরে মাটি তুলে চটকাচ্ছেন। ফকিরের জবাবী গানে অপমানের পাল্টা ধাক্কা এসে ওঁর মুখকে আরো কালো করে তোলে। ফকিরদের এই হচ্ছে স্টাইল। সুরে জবাব, সুরে বিদ্রূপ, সুরে ফরিয়াদ ও বিদ্রোহ। ভাবখানা যেন কেমন ধারা। তোমার আত্মার কালো দাগ তাদের নজর এড়ায় না। তনুর জীবন নিয়ে এত অপশ্রাদ্ধ কেন, রুহুল ফকির কী জানে না? সব জানে। আর এই যে বেহক ক্রোধী,

মৌলবী, তার নকশা ফকিররা কম চেনে না। রুহুল তরুণ ও বি, কম, পাশ ফকির। চক্ষুষ্মান দিনদারীতে। গাইছে—

আছে দুই কাঁধে দুই ফেরেস্তা
আইন মতন করেন ব্যবস্থা
কালি-কলম কাগজের বস্তা
সঙ্গে রাখো নাই।
উল্লাসে করিলি প্রেম
ভুলে গেলি খোদার নাম
না করিলি নিজ কাম
কী হবে উপায় ?

গাইতে গাইতে ফকির হারুডাঙ্গার চরবস্তীর দিকে এগিয়ে যায়। সন্ধ্যা নামে। চরের আকাশে নির্মেঘ সন্ধ্যা তারকা টলটল করে।

চর-সীমান্তের জীবন খুবই অসম্ভব অদ্ভুত, বিশেষ এই চর-সীমান্ত-গ্রাম হারুডাঙ্গার বসতি ঘিরে জীবনের রূপ আরো উত্তেজক একটু। অস্থির চঞ্চলতায় পীড়িত সেই অস্তিত্ব। এবার সেইকথা।

তনু নকসি কাঁথাখানা সময়ের সঙ্গে পাল্লা ধরে বুনছে। ফকির পৌঁছনর আগেই কাঁথার শেষ ফোঁড় দেবে স্থির করেছে। ফকির তো এক রাতের বেশি হারুডাঙ্গায় বাস করবে না। তার নানা কারণ। লোকে ফকিরদের সয় না। রুহুল ফকির বেহক শরা'মৌলবীদের চক্ষুশূল। নানা রকম গান বেঁধে শুধু যে সুন্নীদের তাতিয়ে রাখে, তাই নয়। সুন্নীদের বিচারে, ফকিরের নজর খারাপ। সেইখানেই মস্ত বিবাদ আছে। তনু সেই বিবাদের আড়ালে জীবনের অন্য মহিমা দেখেছে। অস্থির জীবন খানিকটা দড় ডাঙ্গাল জমি প্রত্যাশা করে। শেখপাড়ায়, বুধিডাঙ্গায়, কাহারপাড়ায় কিংবা হারুডাঙ্গার চরে সেই ডাঙ্গাল সত্যিকার দড় জমিন কোথায় ? তনু কুপির শিখা হাতের আড়াল করে ঘনিয়ে ওঠা সন্ধ্যার দিগন্ত বিস্তৃত ধু ধু চরের পুবপারে চোখ মেলে খানিক স্থির হয়ে দাঁড়ায়। শিরশিরানো হাওয়া দিচ্ছে চরে। এই শীতে ফকির কেমন আছে কে জানে ! আজ তার ফিরে আসার কথা।

দূরে একবার সন্ধ্যার মুখে দোতারা বেজে উঠে থেমে গেছে। সেটা বিভ্রম। মনেই বেজেছে দোতারা। এই হয়, এই দেহই দোতারার মতন বাজে। লাউধাধা এই তনুর দোতারা প্রকৃতির রূপে অপরূপ। রমণী রূপের কূপ। বলতেন নীলরতন গোঁসাই। যেমন কিনা লাউয়ের নিতম্ব মধ্যে সুর থাকে, এহ বড় নৈরাকারের মাঝ থেকে সেই সুর উঠে আসে। কিন্তু এই দেহ কি কম কথা ? নৈরাকারের মধ্যেই নিরাকারের বাস। তাই বা কেন ? নিরাকারের ধন্দ কিছু নয়। ধন্দ এই দেহের। দেহ ছাড়া রূপও নেই, সুরও নেই। সেই তৃষ্ণাই

বাউলের তৃষ্ণা। বাউল মানে পাগল। সেই পাগল কখন আসে, তনুর আজ সেই প্রতীক্ষা। নকসির শেষ ফোঁড় হয়ে গেল। ফকিরের সুরেলা দোতারা দুয়ারে এসে থামল। আজ চরের অন্ধকার বড় নিবিড়। তনুর ভয় করছিল। শেখপাড়া, কাহারপাড়ার সুন্নীরা চায় না, হারুডাঙ্গার চরে রুহুল ফকির আশ্রয় নেয়। পনর দিন আগে দহ-র ডিঙ্গিতে করে বাউল যখন দহের ওপার যাচ্ছে, মাঝি কাদের মিঞা তনুকে চোখের ইশারায় অশুভ ইংগিতে বুঝিয়েছিল, সময় খারাপ।

তনু জানে, সময় কীভাবে খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কেন ঐ তারা চোখে অশুভ ঘোর ফুটে ওঠে মাঝির। তথাপি তনুর মুক্তি ঐ পুব পারে উষার কুসুমে ঝলমল করে সেইদিন। কেন করে, সে-কথা কেউ জানে না। কারণ সেটা তনুর কল্পনা।

আজ বিকালে মিজান মৌলবী তনুকে শাসিয়ে গিয়েছে। জমি দেখতে এসেছিল সাইকেল হাঁকিয়ে। শাসিয়ে রেখে ভিস্তের দিকে দাবড়ে গেল বাইক। কথা কী? না তানজিনা ওরফে তনু খাতুন হাজমত সেখের বউ। দ্বিতীয় পক্ষ। শেখপাড়ার সব গেরস্ত, ব্যবসায়ী, টাঙ্গাঅলা সবাই জানে সে-কথা, ভুলে যেও না। মুসলমানের বউ হয়ে রাধিকেগিরি করে না। ফকিরের সাথে মুসলমানের জল-চল থাকলেও, তারা আমাদের কউমের গোষ্টি বা সম্প্রদায় কেউ না। সেই পার্থক্য ঘুচিয়ে দিও না বিটি। তুমি ওয়াক্তী নামাজ ছেড়ে দিয়েছ, দেখতে পাই। এক ওয়াক্ত নামাজ কাজা হলে আশি হুগবা দোজখ মনে রেখো। এক হুগবায় আশি বছর। আশি হুগবায় কত? আশি গুনিতক আশি—কত সন হয়?

শুনতে শুনতে মুখ বেঁকে গিয়েছিল। ঈষৎ হাসিতে ফুটে উঠেছিল অবাধ্যতার রেখায়ন। এই ধরনের চাপ কতদিন ধরে চলছে। স্বামী হাজমত সেখ এ-পারেরই লোক। তার প্রথম পক্ষ মৃত। কিছুদিন আগে বিষ খেয়ে মরেছে, স্বামীর বেবগুগা আহ্লাদ সইতে পারেনি। কারণ হাজমত তৃতীয় পক্ষের ব্যবস্থা করছে ওপারে রটনা হয়েছিল। প্রথম পক্ষের মৃত্যুর পরপরই ওপারে লেহেজানকে নিকে করল হাজমত। চর এলাকায় এসব কোন ব্যাপারই নয়, ডালভাত। দু নম্বরী ব্যবসায় দু'পারে দুটি বউ রাখা স্বাভাবিক সিদ্ধ কর্ম। চালাক লোকেরা তাই করে। জগৎ তাতে বিস্মিত হয় না। প্রথম বউটির মাথায় পোকা হয়েছিল। তনু জানে, দু নম্বরী মাল চালানী ব্যবসা চরের আসল জীবিকা। ভিস্তের ওপাশে এপাশে ঘর আছে একই লোকের। ওপারে চার-চালাও যার, এ-পারের দালানও তারই। দালান আর কী, কাঁচা বাড়ির কোঠাপাড়া ঘর হলেই তাকে দালান বলতে হবে। ওপারে হাজমতের সেই দালানে লেহেজান শুয়ে থাকে। তনুও ওপারেরই মেয়ে। মাল বইবার

সুবিধার জন্য এপারে এনে কাহারপাড়ায় হাজমত দালান তুলেছিল। তারপর ওপারে লেহেজানকে ফুসলাতে লাগল। যার বউ থাকে না, তার রাখনী থাকে। রাতের অন্ধকারে এই রাখনী বা বউরা কেউ কেউ অনেকেরই বস্তাভর্তি জামা-কাপড়ের মালপত্তর কাঁধে করে পার করে দেওয়ার বেলা সাহায্য করে। তাছাড়া দুপারে দু'খানা বউ থাকলে আর সেকথা বি. এস. এফদের কানে তুলে রাখলে সুবিধা। কোথা যাওছে হাজমত? ওপারে বউ আছে, বালবাচ্চা আছে, তাই যাচ্ছি। কোথা যাও তনু-বিবি? ওপারে স্বামীর কাছে শুতে যাচ্ছি, স্বামী কয়দিন আমার সতীন ছেড়ে আসেনি।

মনে পড়ে একথা শুনে রুহুল ফকিরের চক্ষু স্থির হয়ে গিয়েছিল। কে এক নচ্ছার ছোকরা ফকিরের সামনে মস্করা করে সাঁজাল পোয়াতে পোয়াতে বেফাঁস করে বলেছিল গত সনে। কী বলেছিল? মনে পড়লে আজও তনুর মুখমণ্ডল শরমে রাঙিয়ে ওঠে তৎক্ষণাৎ। আসলে হাজমত আর এপার মুখো হত না সেই সময়। ছোকরা বলেছিল—ওপারে তনুর সোয়ামীর আর এক পক্ষের গেরস্থি, জানলেন ফকির, এপারে একলা ভো ভো করে। জিন্দেগির টানটানি কী জিনিস তনুকে না দেখলে মালুম হয় না। রাতে শুতে যায় মেয়ে, বোঝেন রহস্য!

তারপর ছোকরা খিকখিক করে হেসে উঠে বলেছিল—দিনের বেলা এপারে দাসীগিরি, রাতে মাল বহে গিয়ে বা আনতে গিয়ে সোয়ামীর পাশে শুয়ে আসা, হেঃ হেঃ! জিন্দেগির বাহার দেখেন কী! ভি-য়ের দুখানা হাতে মরণ নিবাস করে। মিলিটারি গুলি ছুঁড়লেই সাধের বুকখানা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে চলে যাবে। মুণ্ড রইবে ইণ্ডেয়, ধড় থাকবে বাংলায়,কচুপাতার পানি ছলকে গেলেই, ব্যস! এই ভোজবাজির চরায় আপনি কেন এলেন জী! তনু হল গে চর চরানী মেয়ে, আপনার গান শুনলেই চোখ বুঁজে কাঁদে।

কথা কয়টি বলেছিল সোভান, ছয় মাস আগে সেই তাজা ছেলেটা মিলি-টারির গুলিতে নিকেষ হয়ে গিয়েছে। কারণ প্রতি বছরই দু-একটি লাশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী ভি-পয়েণ্ট লুণ্ঠিত করে ফেলে রাখে, ওটা ওদের কড়া পাহারার দর্শনীয় নমুনা। কিন্তু তা-বলে চরের বাসিন্দারা থেমে থাকে না। এপারে ওপারে এ-বেলা ওবেলার পথ, সীমান্ত রেখায় জীবন আটকায় না, তার মান্যতাও কিছু নেই এদের কাছে। ভি-পয়েণ্টের বাহুমূলে পথ সংক্ষিপ্ত, পাহারাও কড়াকড়ি, ফের সেখানে চোখে ধুলো বা পকেটে গোঁজা মেবে পথ খালাস রাখতে হয়। দুই বাহুর গায়ে বি. এস. এফ. পাহারা মোতায়েন। বিশদ গাওনা আরো আছে, তবে ছোটকাথায় বাহুজুড়ে মৃত্যু ঘুরে বেড়ায়, চরে বেড়ায় ছায়ায় মতন। এরা জানে না, কোন পারে জীবনটাকে খুঁটায় বাঁধা যায়। এপারে ওপারে শাদি হচ্ছে, যাত্রা আলকাপ বাউলগান শুনতে যাচ্ছে, আসছে। ওপারের একটা বাচ্চা ছেলে এপারে শেখপাড়ায় এসে হাটবাজার করে

সন্ধ্যার মুখে ফিরে গেল, সবই চলেছে। কিন্তু মৃত্যুও জীবনের মতোই চঞ্চল। পারাপার মানে না। কিন্তু তনুর জীবনে একখণ্ড ডাঙ্গাল দড় জমি বড় দরকার ছিল, খুব নিজস্ব সেই আবাদপাতি জমি জিরাতের দেশ। জলা নয়, বানভাসি নয়। পদ্মার উথালি পাথালি চরের আতংক নয়। ফকিরের চঞ্চল আত্মার মতন স্থির। আর যেন কী?

তনু মনে করতে পারল না, ফকির তাকে কত কথা শুনিয়াছে, হৃদপিণ্ডের উপর কেমন করে নূরের বাতি জ্বলছে। সেই রোশনীর বিশদ খবর তাকে শোনাতে চেয়েছে ফকির। সেই ফকির আজ ফিরে এল। একপক্ষ কাল পর অমাবস্যার নিবিড় অন্ধকারে। তনুর হাতে কুপির শিখা কেঁপে কেঁপে ওঠে।

স্বাধীনতার সময় বাংলা যখন দু'ভাগ করে গেল ইংরাজ, তখনকার জমানার একটা মজাদার কলের গান চালু হয়েছিল। দহ-র ডিঙ্গি বাইতে বাইতে কাদের মিঞা এখনও সেই গান গাইতে থাকে। ভুলে গিয়েছে অনেকখানি। ভুলে যাওয়া পয়ারের নিজের মতন করে সুর আর ছন্দ গুঁজে ভাষা তৈরি করেছে। সেই গানের মধ্যে জীবনের যে অস্থিরতা দুলে উঠেছিল তা আজও দোলায়মান:

ওরে বাবারে বাবারে বাবা!

আচমকা গেয়ে ওঠে ধমকানীর ত্রাসে কাদের মিঞা, যেন বাজ পড়ে গেল।

এবার স্বাধীনতা পেলি বাবা
স্বাধীনতার গুঁতোয় গরিবের প্রাণ যায়
এখন বল কোথা যাবা
কোথায় বল হাওয়া খাবা
হিন্দুস্থানে না পাকিস্থানে বাবা
বাসা এখন বাঁধিবা?

তনুর এই গানখানা শুনলে হাসি পায়, শুনতে শুনতে গা দুলে ওঠে আঁচলের ফুঁপি মুখে গুঁজে ভাবতে হয় চরাচরানী মেয়ের চরান্ধকার জীবনের থৈ কোথাও নেই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্যুতয় জড়িত চোরা মাল বইবার প্রতি রাতের রহস্য তাকে হাজমতের যৌন-দাসী করেছে।

এরা সব চোর ছ্যাঁচোড়, দাগী আর খুনী। এ-পারে খুন করে ও-পারে পালিয়ে গিয়ে কিছুকাল বসবাস করে। দেশের রাজা বদল হলে, এখানকার জোতদার মহাজন নেতার, দু নম্বরী কারবারের নাফাদার মোড়লের মোড়লীর ছত্রছায়ায় রাজনৈতিক গ্যারাণ্টি পেলে ফিরে আসে। খুন করে মোড়লের মহাজনের ইশারায়। এখানে নানা রকম গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আছে। ফরাসী আর হানাফীদের বিবাদ আছে। মসজিদে শুক্রবার জুম্মাদিন এক আজান না দুই আজান, মাথার টুপি গোল না চৌকো, মুর্দা কবরে কাৎ না চিৎ হয়ে শোবে

তা নিয়ে বিসম্বাদ অন্তহীন। এই সব বিবাদ থেকেও কখনও বা ঘর পোড়ে, কারো মাথায় ঘোল ঢালা হয় বা মুণ্ডুপাতও হতে পারে। তাছাড়া রাজনৈতিক গুপ্তিনার এখানকার একটা উৎসব। দু নম্বরী টাকার জুয়া খেলা চলে, সেখানেও মারপিট। অন্যের বউয়ের কাছে রাত্রে চলে যায় কালো লোভী ছায়া হঠাৎ মাঝরাতে চোর পড়ার ভয়ার্ত নারীকণ্ঠের চিৎকার, আসলে চোর নয়, লোভী একটা আদিম নগ্নছায়া, ধরা পড়ে গিয়েছে। ফলে এক চোট মার হয়ে গেল। তনু এই জীবন কখনও চায়নি। পেটের দায়ে জীবনটা তার কেমন হয়ে গিয়েছে। ফাটা সেই রেকর্ডখানা ঘষটে ঘষটে বেজেই চলেছে :

হিন্দুস্থানে না পাকিস্থানে
কাহারপাড়া নাকি হারুডাঙ্গায়
নাকি ওপারের লেহেজানের দালানে
জীবনটা স্থির হয় ?

তনুর দীর্ঘশ্বাস পড়ে কুপির শিখার উপর। তখনই চোখ পড়ে উঠোনে বাউলের ছায়া।

বাউল বলে—তনু, আমি এলাম।

তনু বলে—সে সুর আগেই শুনেছি ফকির ছাহেব! দাওয়ায় বসেন! চালজল সেবা করেন। আপনার সাথে ঢের কথা আছে। মানুষের সেবাধর্ম এখনও বুঝি না, আপনাদের মানুষ-পুজোর পেন্নাম করার রীত আমায় শিখিয়ে দেবেন এইবেলা ?

রুহুল বলল—সে হবেক্ষণ। আস্তে আস্তে শেখো। চালজলের নিয়মটা কি তোমার খারাপ লাগে ? তোমায় যাবার দিন ব'লে গিয়েছিলাম, আমার জন্য চালজল রেখো, পেট হচ্ছে চামড়ার মোশক। যত বাড়াবে তত বাড়বে, কমালে কমে, মনে আছে তোমার ?

—তা আর নেই! আপনার সব কথা আমি মুখস্ত করব। ব'লেই নিঃশব্দে মিঠে করে হেসে নেয় তানজিয়া। বাঁ হাতে কুপি ধ'রে ডান হাতে গুটানো ছোট মাদুরখানা দাওয়ায় মেলে দিয়ে বলে- একটু বাদে চা দেব। পরে সাঁজাল ক'রে দেব, চরের ঠাণ্ডা আপনার সইবে না।

কাঁধের কাপড়ের ব্যাগ ঘাড় থেকে নামায় রুহুল, মাদুরে বসে, খুঁটিতে দোতারা হেলান দিয়ে রাখে। তনু খুব দ্রুত রুহুলের পায়ের কছে টিনের বদনায় জল রেখে শুধায়—ঢেলে দিব ?

রুহুল বলে—তুমি মুসলমানের বউ। পায়ে জল ঢেলে চুলের গোছায় মুছিয়ে দেবে যে বেচারিকে, সে তো তোমার পর হ'য়ে গিয়েছে, তোমার স্বামীধন ? আমি তো ফকির। আমি চাই সত্যিকারের একটা স্বাধীন মেয়ে

আমার পায়ে জল ঢেলে সুখি হোক। তিন নোকতা কথা, তার একটা তানা ছিঁড়ে গিয়েছে। বাকি দু' নোকতা নিজেই তুমি ছেঁড়ো।

হাজমত ফরাজী। তিনমাসে তিন তালাক দেবে তনুকে। ফরাজীদের হাদিস হানাফীদের মতো হাল্কা নয়। একমুখে তিন মিনিটেই ত তালাক হয় না। তিন চাঁদ লাগে। অবিশ্যি এইসব কারণেই হয়ত ফরাজীদের মধ্যে তালাকের চল কম। কিন্তু অনুশাসনে ফরাজীরা হানাফীদের চেয়ে বেশি দড়! হজমত তনুকে এক তালাক শুনিয়েছে, বউকে বশে আনবার জন্যে। তনু প্রথম থেকেই বাগে আসে না এমন নয়। আসলে এই ফকির আসার পর থেকেই কেমন একটা রোখ এসেছে মেয়েটার মধ্যে। কী সেটা, হাজমত বুঝতে পারে না। ওর চোখ সাদা। ওর যেন মনে হয় লেহেজানকে নিকে করার পর তনুকে সে খানিকটা কাঙাল ক'রে দিয়েছিল। চর পেরিয়ে শুতে যাওয়া, তারপর কত রাতে স্বামীর দেহ নাগালে পেত না তনু, লেহেজান দখলে রেখে দিত। সেইটে হিংসে বটে, অপমানও বটে। তারপরই তো রোখটা এল। কথাটা কারো কাছে ভাঙা যায় না। মিজান মৌলবীকেও বলা যায় না।

হাজমত বলেছে—পুরো তালাক তো দিব না, মৌলবী ছায়েব। খানিক ডর ধরিয়ে সিধে করব। আজকাল আমাদেরও ডরপুক হয়, পাছে না মর্দানী করে। মোকদ্দমা ঠুকে খোরপোশ চায়। চোখমুখ-অলা তেজি মেয়েছেলে, পেটে বিদ্যেও আছে দু' ফোটা। তিরাইলে হাইস্কুলে পড়ত দু'কেলাস, খুব গরিব বুলে সতীন-ঘরে এস্যাছে। উর ভিতরির ছটফটানি যে কী সোয়াদে তৈয়ারি হ'ল, শালা ফকিরই জানে।

আজ রুহুল ফকির তনুকে বলল,—সত্যিকার একটা স্বাধীন মেয়ে আমায় পায়ে জল ঢেলে সুখি হোক। তিন নোকতা কথা, তার একটা তানা ছিঁড়ে গিয়েছে। ফকিরের উচ্চারণ চিন্তার গভীর স্পর্শ থেকে আসে। অস্পষ্ট অনুভব করে তনু। স্বামীধন পর হ'য়ে গিয়েছে, খুব সত্য কথা। কাহার-পাড়ার দালান ছেড়ে তনু হারুডাঙ্গায় একলা আছে বছর ভর। স্বামীর ঘরে নেই। মাস তিন থেকে হাজমতও না-ছোড় হ'য়ে এপারে মিজান মৌলবীর লেজে খেলছে। কাহারপাড়ায় রেখে মাল বওয়াবে, অবুঝ মেয়ে রাতে কুকুরের মতন স্বামীর আলিঙ্গনে ধরা দিতে যাবে, সেটা রদ হ'লে পুরুষ তো ক্ষেপেই ওঠে। কামড়াবে, কিন্তু পথ পাচ্ছে না। নাগাল দিচ্ছে না তনু। তার মনের মধ্যে খুব পুরনো গোষ্ঠীযুগের মেয়ে, মাতৃতন্ত্রের সাহসিনী নারী, স্বতন্ত্র দাপুটে নারীবোধ ছটফট করে ওঠে ফকিরের কথায়। তনু জানে না, সে নিজেই বা কে? কিন্তু বুঝতে পারে, ফকির তাকে খুব সাহস দিয়েছে।

গত বছর একবার ফকির এই পথে ওপারে গিয়েছিল। সেইবার ঈষৎ হলুদ জামা, সাদা ধুতি আর ঘাড়ের দু' পাশে বুকের মাঝভাগ অব্দি ঝোলানো

ফোতা কাচতে দিয়ে তনুকে বলেছিল—ধুয়ে দাও। এই নাও সোডা। ভাটার ক্ষার। দোকানে কিনিনি। ইট-ভাটার মধ্যে এই ক্ষার পাওয়া যায়, বিনে পয়সায় সাবানের কাজ হয়। তনু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। তার বিস্ময়-মুগ্ধ চোখে চেয়ে বলেছিল রুহুল—

—গরিবের ধর্ম এই ফকিরের ধর্ম। আয়োজন বেশি লাগে না। অল্পে বাঁচা যায়, খুব কমে সন্তুষ্ট আর পূর্ণ হওয়া যায়। কথাটা ফাঁকা কথা নয় তনু বিবি। গরিবরা, মার খাওয়া, একেবারে মাটির তলার, জীবনের চাপে পড়া অকুলীন বিবর্ণ আমরা, খুব নিজের মতন করে এই বাঁচার ধর্ম গড়েছি। ভোগ করব জীবনকে, দু'মুঠি খাব, দশ মুঠি ছিটিয়ে ফেলব, তারপর হায় হায় করব, তেমন তো নয়। খোদা বলেছে, ইন্নাতায়না কাল কাওছার। আমি তোমাকে কাওছার দান করেছি। কোরানের কথা, সেটা কী?

তনু সাথে সাথে বলেছিল—আমার মা রাজশাহী জোয়ারীর মেয়ে, ফকির-সঙ্গ করত। তা নিয়ে বাপের সাথে বনল না, বাপ গো-মাংস খেয়ে মুসলমান হ'ল। তারপরই মা কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। তেমন মানুষ না পেলে, শরার ফাঁস গলায় পড়ে ফকির সাহেব, সেই থেকে আমিও পতিত হয়েছি। শুধু টলটলে বেড়াচ্ছি। পেটের খিদে আর দেহের আশকে জীবনটা দেখুন কেমন জব্দ হয়ে গিয়েছে। দু'মুঠো ভাতের জন্যে চোর হয়ে আছি।

রুহুল বলেছিল—কিন্তু খোদার বয়ান, 'আমি তোমাকে কাওছার দান করেছি।' এমন বেহেশ্‌তী পানীয়, যা খেলে খিদে তেষ্টা কমে যায়। খিদেকে জব্দ করার স্ফূর্তি হ'ল কাওছার। সেই আনন্দের পানীর এই দেহেই আছে। ফকিররা সেই খোঁজ জানে তনুবিবি। সেই ফকিরের টানেই মা তোমার হারিয়ে গিয়েছে। মৌলবীরা পাঁচবেলা নানাজে দাঁড়িয়ে ইন্নাতারনা করছে। কিন্তু কাওছার কোথায় জানে না। তোমার মাকে আমি খুঁজে দেখব।

আজ রুহুল ঝোলা থেকে কতকগুলো ফটো বার করল। বলল, দেখোতো ইনি তোমার মা কিনা! তোমার মাকে খুঁজে পেয়েছি মনে হচ্ছে।

হাতে একতারা। গান গাইছে। এক প্রৌঢ়া বাউলের পোষাকে সুসজ্জিতা। তনু ঝুঁকে পড়ে ফটোর মা'কে চিনতে পারে। মেলার মঞ্চে মা গান গাইছে। পাশে গান গাওয়া রুহুলের যুগলবন্দী বেশ।

প্রথম আলাপের দিন, যখন এই চরে ওপার যাওয়ার পয়লা খেপ দিচ্ছে ফকির, সেইদিনই তনু মায়ের কথা তুলেছিল কথার পৃষ্ঠে। মায়ের নাম বলেছিল সে। বলেছিল—তাহলে মায়ের একটু খোঁজ সত্যিই করবেন ফকির ছায়েব?

সেই মা। তনু পরম আগ্রহে ফটোখানা হাতে তুলে নিয়ে দু-চোখ ভরে দেখতে দেখতে বলে—মায়ের উপর কত অত্যাচার হয়েছিল। আমাদের

এক-ঘরে করেছিল দেশের লোক। জল বন্ধ করে বাপকে কউ তালাক দেবার জন্যে চাপ দিয়ে একেবারে নাজেহাল করেছে। মা তবু মাথা নোয়ায়নি। ফকির-সঙ্গ ত্যাগ করেনি। বাপকেই ছেড়ে গিয়েছিল। বাপ-মায়ের ছাড়াছাড়ি তো চোখের জলেই হয়েছে সেদিন। কাঁদতে কাঁদতে চোখের জলেই দু'টি জীবন আলাদা হ'য়ে গিয়েছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তনু। ফকিরকে ফটোখানা ফেরত দিয়ে বলে—বাপ পরে শরিয়তীদের ঘরে নিকে ক'রে মুসলমান হ'ল। সংমা পরেজগার মেয়ে। পাঁচবেলা বেঁধে নামাজ করে। তারপরই আমার বিয়ে হ'ল, একেবারে পাথারে পড়লাম। মায়ের জন্যে কষ্ট হয়। মা একবার বাপকে দেখতে এসেছিল, দেশের লোক দূর দূর ক'রে খেদিয়ে দিয়েছে। মা বলেছিল, আমি থাকতে আসিনি। চলে যাচ্ছি। আমার ওপর জুলুম করবেন না। আমার ধর্ম আমার, তোমার ধর্ম তোমার। ধর্মে জুলুম নেই। কোবানে সেকথা আছে।

রুহুল বলল—হ্যাঁ, সুরা কাফেরুনে সে কথা আছে ধর্মে জবরদাস্তি কোরো না।

তনু শুধাল—তবু এরা অত্যাচার করে কেন, ফকিরদের হাত পা অব্দি কেটে দেয়? আপনি এসেছেন, আমার খুব ভয় করছে।' অবিশ্যি খেতে না পেলে এ-সমাজ দেখে না, ধর্মের বেলা খুব হম্বিতম্বি।

ফকির গত বছরই বলেছিল—তোতাপাখির ধর্ম তনু। কোরান মুখে পড়ার জন্যে, মান্যতার জন্য নয়।

তনু শিউরে উঠেছিল—কী কথা বলছেন ফকির ছায়েব! লোকে শুনলে খুন করবে।

রুহুল বলেছিল—ফকির নিধন তো ইতিহাসে নতুম নয়। আমাদের খুন করেছে। মেরেছে। আমরা কখনও হাত তুলিনি। হাতে দোতারা কি একতারা—এই তো সম্বল। ছোরা ধরতে ফকির পারে না। গান গাইলে মনটা যে নরম হ'য়ে থাকে তনু, আর কাওছারের স্বাদ পেলে খুনের ইচ্ছে বক্তে আসে না।

আজ বলল রুহুল—হম্বিতম্বি কেন করবে না, ওরা যে দলে ভারি। আমরা সংখ্যালঘু। ওরাই বলে মুসলমানের ৭২ দল। বাহাত্তর ফেরকা। তা একটা গানে আছে, শোন বলি। সবখানি ভাল মনে নেই।

দম ধরে ফকির মনে করে কিছুক্ষণ। তারপর বলে ঃ

> ৭২ ফেরকা ১ দল হ'ল নাজিয়া।
> সেই দলে নাই অধিক লোক
> দেখো মনে ভাবিয়া।

নেক লোকের ছোট জামাত ;
রসিদ কয় মনসুরকে আয়াত।
পড়ো আলহামদোল্লিল্লাহে—
আল্লা বহুল রহুল সুরে।…

কোরানে নহুল সুরা আছে তনু। আমরা সেই নাজিয়ার দল। আমাদের তো মারবেই। আমি এসেছি, আমি আসব। তোমার মা কে দেখতে ইচ্ছে করে না? সে-কথা বলতে এলে কি পাপ হয়?

তো ফকির আজ বলেছে, একটি স্বাধীন মেয়ে তার পায়ে পুজার জল ঢেলে সুখি হবে, শিবলিঙ্গে দুধ ঢেলে কোন কামনা নয়, মানুষের পায়ে মানুষের তর্পণ। এই ফকির এ বছর ওপারে যাবার বেলা গাইতে গাইতে গিয়েছিল ঃ
দেখবি যদি সোনার মানুষ
দেখে যারে মন-পাগলা। ( গানের উচ্চারণ পাগোলা )

সেই সোনার মানুষ কি আজ চোখের সামনে বসে একটি স্বাধীন মেয়ের স্বপ্ন দেখছে? তনু বদনা ফেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। বাইরে কার যেন গলা শোনা যায়—খালাগো? বাড়ি আছো! গেরস্ত এই তরকারি-টুকুন তুমাকে পেঠিয়েছে, সরপোয ঢেকে লিয়ে আনছি। লাও যতন ক'রে তুলে রাকো, রেতে ভাত মেখে খেও।

বলতে বলতে বছর চৌদ্দর একটি ছেলে গায়ে পাতলা চাদর জড়িয়ে হাতে একখানা সাজানো থালা নিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়ায়। তনু ঘর থেকে বাইরে এসে ছেলেটির মুখের কাছে কুপির আলো তুলে ধরে। হাত থেকে ঢাকা দেওয়া থালা নিয়ে ঘরে ঢুকে ঢাকনা তুলে দেখে কেমন চমকে ওঠে। দ্রুত ঢাকনা ফেলে ঢেকে দেয়। তারপর মুখে আঁচল তুলে চেপে ধরে নিজের মুখ, যেন সাংঘাতিক কিছু সে গোপন করতে চায়। ফের দ্রুতপায়ে বাইরে এসে ডাকে—শুনে যা রছুল!

রছুল বাইরে চলে এসেছিল তনুর ডাকে উঠোনে ফেরে। তনু শুধায়—গেরস্ত কী করছে?

রছুল উত্তর দেয়—মজলিস! তুমাকে লিয়ে কতা হচ্ছে! মিজান মৌলবী শুদ্দো। খানিক বাদে আসবে। আজ তুমার বিচির ( বিচার ) হবে। তুমাকে মাল আনতে দলের সাথে লিষেদ করেচে গেরস্ত। আরো একখান তালাক হবে খালা গো!

কথা শেষ করে ছেলেটি আর দাঁড়ায় না। তনু অস্ফুট ব'লে ওঠে—রছুল দেখে গেল ফকির এসেছে। ওদিকে মজলিস করছে ওরা। নসীবের ফেরে রছুল ওদের চর। চোখ দুটো ডাকরার মতন ভয়ে পাকানো। ছিঃ! এই 'ছিঃ!' শব্দটুকু রহুলের কানে ছিটকে আসে। রহুল হাত-পা ধুয়ে

ফেলেছে। চালজল সেবা করতে গিয়ে মুখে চাট্টি ফেলে কপালে গেলাস 'আলেক' বলে ( মুসলমানরা যেমন বিসমিল্লা বলে খেতে শুরু করে সেই রকম ) ঠেকিয়ে নিয়ে জলে চুমুক দিতে গিয়ে থেমে গেল। রছুলের কথা শুনতে শুনতে সে হাত-পা স্খালন করেছে। তারপর দাওয়ায় উঠে গামছায় হাত-পা মুছে মুখে চাল ফেলেছে। তারপর ছিঃ শুনে চমকে মুখ তুলল। জলের গেলাসে চোখ ফিরিয়ে জল দেখল। চুমুক দিল। কোন কথা বলল না। রছুল চর। তনু মনে করে হাজমতের। হাজমত মনে করে তনুর। মাঝখানে টানাভরনার মাকু এই ছেলেটা। গলার স্বরে বড় মায়া। তনু প্রথমে ইতস্তত করেছিল, তরকারি নেবে কিনা। নিতে গ্লানি হয় যখনই এইধারা ভেট আসে, সেই রাতে হাজমত তনুর কুটীরে রাতবাস করে। তরকারি হতে পারে, একটা ক্রিম কি পাউডার কিম্বা সাড়ি হতে পারে, নিদেন কিছু রেশমি চুড়িই বা। সবই গ্লানিময়। তথাপি এই জোরাজুরির নোংরা জীবন ছাড়ান পেল না। তা পেতে গেলেও কেন যেন বুক কাঁপে। 'আরো একখান ত তালাক হবে খালা গো' কথাটার মধ্যে কেমন বিষাদ জড়িয়ে গিয়েছে। এখানেও জীবনটা কুপির শিখার মতন কেঁপে কেঁপে মাটির দেওয়ালে কালি লেপন করে হিজিবিজি কী সব লিখে চলে যেন। তনু সেইদিকে চেয়ে ছিল। ওপার থেকে হারুডাঙ্গায় বস্তা চালানের তদারকি তনুর। বাকি পথ রছুল বহে নিয়ে পৌঁছে দেয় গেরস্তকে। ঘর ছেড়ে যাবার সময় রছুলকে ঘরে পাহারায় রেখে যায় তনু। স্বামীর সাথে রছুলের মাধ্যমে টাকাকড়ির হিসেব চলে। বস্তাপ্রতি চালানের একটা মজুরি তার পাওনা। সম্পর্ক মজুর মালিকের। কেবল শরীরের বেলা স্বামী-স্ত্রী। মনেই হয় না দেহ কথা বলতে পারে। লাউয়ের তনুতে সুর থাকে। মেয়ের দেহ একখানা একতারার মতন। সেইটে ঐ ফকিরের পাগলামী। সুন্নীর চোখে এই দেহ উলঙ্গ ফল, যাতে মালদহ-র ফজলীর মতন নীল মাছি বসে। ভাবতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তনু। সেই শব্দ শুনতে পায় রুহুল। আবার চোখ তোলে। বাকি জলটুকু গলায় নিংড়ে নেয়। বলে—আমি কখনও একেবারে চোখের উপর বউ তালাক দেখিনি। আজ দেখতে পাব। সেই সময় তোমার মুখটা কেমন হবে, তাই ভাবছি। এমন আসর করে বউ তালাক এই দেশেই সম্ভব। ওরা কখন আসবে? তনু গম্ভীর গলায় জবাব দিল—জানি না।

এবং ঘর ছেড়ে নিচে নেমে সাঁজাল তৈরির কাঠখড়ি জোগাড় করতে ব্যস্ত হয়ে গেল। সাঁজাল জেবলে দিয়ে মাটি উনুনে অল্প দুখানা রুটি সেঁকে নেবে আর খানিকটা ভাজা তরকারি করবে এবং ভাবছিল গেরস্তর প্রেরিত তরকারি অন্ধকারে কোথাও ফেলে দিয়ে আসবে কিনা। তনু ফকিরকে ডাক দেয়—সাঁজালে এসে বসবেন?

রুহুল শুধাল— তুমি তখন ছিঃ করলে কেন? রছুল যা বলে গেল, তাতে তোমার মন খারাপ করছে নাকি? এক তানা ছিঁড়েছে, ভয় পাও?

তনু বলল— পাই বৈ কি! আজ যদি আপনার চোখের সামনে ওরা খারাপ কিছু করে? আপনার অসম্মান আমার সইবে না।

রুহুল তনুর কথায় ম্লান হেসে বলল—ফকিরের সম্মান কবে ওরা করেছে! আমরা সম্মান চাইনি। ওদের হাত থেকে বরাবর আমরা নিস্তার চেয়েছি। দুনিয়ায় যত ধর্ম আছে, সবই হল কল্পনা। সব অন্ধ আবেগের ধোঁয়ায় তৈরি। যুক্তির ধর্ম একটাই। এক ফকিরের ধর্ম ছাড়া সব ধর্মই যুক্তিকে ভয় পায়। লালন বলেছিলেন:

> সুন্নত রাখলে হয় মুসলমান
> নারী লোকের কী হয় বিধান
> পৈতে দেখে বামুন চিনি
> বামনী চিনি কেমনে?

তখন তো সহ্য হয়নি সেই যুক্তির কথা। ওরা ভেবে দেখেনি, যেমন আরো কথা—'নাই আল্লা লাইলাহাতে, আছে আল্লা ইল্লিল্লাহতে।' ভেবেছে, আমরা ওদের ঠাট্টা করছি। একটু থেমে ফকির বলল—

—ফলে হয়েছে কি, নারীর ধর্ম কিছু নয়, ধর্ম পুরুষের। তাই নারীকে ওরা এত খাটো করে দেখেছে। আর আমরা সেই নারীকেই করেছি ভজনার উপায়। প্রকৃতির সঙ্গ ছাড়া আমার ধর্ম বৃথা। প্রকৃতি-প্রাপ্তিই ধর্ম। ওদের মোসলেম কি দাউদ হাদিসে আছে—পুরুষের বাঁ পাঁজরের বাঁকা হাড়ে রমনী তৈরি। তাকে সোজা কয়তে চাওয়া নিষ্ফল। বাঁকা হাড় সোজা হয় না। বরং তাকে সোজা করতে না চেয়ে তালাক দেওয়া বুদ্ধির কাজ। হাদিসে নির্দেশ আছে, তা মানুষ কী করবে! তাবৎ হাদিস পুরুষের পক্ষে লেখা। কোথাও দু' এক ফোঁটা করুণার সন্ধান পাবে ঠিকই কিন্তু নারীর সত্য মর্যাদা কোথাও নেই। আমরা এই অপমান সইতে পারিনি বলেই লালন তার গানে শুধিয়ে ছিলেন, নারীর বিধান তাহলে কী হবে? বুঝলে তনু, যুক্তির জোরেই মুক্তির আলো জ্বলে। সেই আলো মানুষকেই জ্বালতে হয়। চোরা জীবন ছেড়ে দাও তুমি, আগেই বলছি।

অনেকক্ষণ কথা বলে রুহুল ফকির ঝোলা থেকে একখানা খাতা বার করে কলম ধরে কী-সব কথা লিখতে লাগল কুপির আলোয়। ফটোগুলো ঝোলায় ঢুকিয়ে ফেলল। পাটকাটি দিয়ে কুপি থেকে আগুন ধরিয়ে নিয়ে তনু সাঁজাল জেলে দিল। উনানে মাটির খোলা চড়িয়ে ছেনে রাখা আটা নিয়ে বসবার আগে উপুড় হয়ে ব্যস্ত ফকিরের গায়ে নকসি কাঁথাখানা চাপিয়ে দিল। বলল— সাঁজাল জেলেছি। খেলা রেখে আগুনে এসে বসুন। দেখুন কাঁথাখানা

কেমন হয়েছে। আমার বাচ্চাকে এই চরের ঠাণ্ডা মেরে ফেলেছে ফকির ছায়েব। ঠাণ্ডাকে আমার ভারি ভয়।

তনুর কথায় রুহুলের কলম সহসা চমকে উঠে স্তব্ধ হয়ে যায়। রুহুল তনুর মুখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। এই দৃশ্যের মাঝে চরের চোরা মাল বওয়া দলটা এসে উঠোনে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে। হৈচৈ করে সাঁজালের চারপাশে গোল হয়ে বসে যায়। বেশির ভাগ ছেলে-ছোকরা। সাথে আরো দুটি মেয়ে। তারা কম বয়েসী কিশোরী। সব ওরা মাঝরাতে ভি পার হবে, সঙ্গে বস্তার বাণ্ডিল। সেই বাণ্ডিল পাছার তলায় ঠেস নিয়ে পিঁড়ি চেপে বসে গিয়েছে। ফকির কলমের খাপ বন্ধ করে উঠোনে নেমে আসে।

কাহারপাড়া থেকে হারুডাঙ্গার দূরত্ব এক মাইল। দূরে স্বামী মজলিস করছে। মিজান মৌলবী যুক্তিদাতা, হাসিদ কুরানের ঠিকেদার। দু নম্বরী মালের ব্যবসা করেন না বটে, কিন্তু দাদনের ব্যবসা করেন। ঘোড়াগাড়ি দু'খানা রোজে খাটান সহীস দিয়ে। মসজিদে ইমামতি করেন। এখন গ্রামসভার মেম্বার। ওরা এলে পর কী ঘটনা হতে পারে? মাল আনতে যেতে নিষেধ পাঠিয়েছে। তরকারি পাঠিয়েছে। কিসের যেন খারাপ গন্ধ পাচ্ছে তনু।

তনু এই জীবনখানার ছবি কাঁথায় এঁকেছে। কাহারপাড়ার জীবনে চারপাশে জঙ্গল। ইঁটভাটা। লতানে সবজীর মাচা। সব এঁকেছে তনু। কেন স্পষ্ট জানে না। আসলে আঁকা তো নয়। বুনে তোলা। একটি গাছের ছবি বুনেছে। একটি গো-সাপ। যাকে সোনাগোরী সাপ বলে। দেখলে গা শিরশির করে। ইঁটভাটার ধুনের বেজি-ও আছে। আছে কালো প্যাঁচা একটা। গাছের নাম কালনাগিনী। সেই কাঁথা গায়ে দিয়ে বসে আছে ফকির। কালনাগিনী গাছ আর সাপের ফণা একই দেখতে। ভয়ংকর। আরো ভয়ংকর এইজন্যে যে, ওটা সাপ নয়। গাছ। দু নম্বরী দলের সবাই ফকিরকে দেখছে। কাঁথা দেখছে। কেউ কেউ বেশ ভয় পায়। ফকির কিছুই বুঝতে পারে না।

তনু রুটি বেলে যাচ্ছে। চোখ তুলে তুলে সবার দিকে চায়। ওরা ফকিরকে ওই কাঁথায় জড়িয়ে ফেলে দেখছে এখন। কাঁথা যেন ফকিরের গায়ের চামড়া হয়ে গিয়েছে। ওদের চোখে বিদ্বেষ আর ঘৃণা অথচ ওরা জানে না, ওটা কাঁথা। চামড়া নয়। ফকির শত্রু নয়। অরণ্যের প্রাণী নয়, প্যাঁচা নয়, দিনের মানুষ। দিন আর দ্বীন একই কথা। আমরা ফকিরের গায়ে যে কাঁথা দিলাম তার কী অর্থ হয়? তনু ভাবছিল। আমার চারপাশের যে জীবন জড়িয়ে আছে, ফকির জানে না। আমি ফকিরের গায়ে কী জিনিস চাপিয়ে দিলাম ফকির জানতেও পারেনি। তনু ভাবছিল আর তার বুকের ভিতরটা কুলকুল করে কাঁদছিল। ফাঁকা হয়ে যাচ্ছিল। রাত্রি বেড়ে যাচ্ছে

দণ্ডে দণ্ডে। এক সময় দুজন কড়কড়ে জোয়ান ছেলেকে সঙ্গে করে মিজান মৌলবী আর হাজমত প্রবেশ করে। ফকির এই জোয়ান দুটিকে কখনও দেখেনি। কিন্তু দেখেই মনে হল এরা মানুষ খুন করে। ফকির বুঝতে পারল একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে! বুঝতে পারল তনুও। বাড়িতে ঢুকেই হুকুম করে হাজমত সাঁজালে অংশীদার হয়। হুকুম করল দু নম্বরীদের—

—তোরা চলে যা, আগুন পুইয়ে রাত সাফা করলে মাল আনবি কখন? তনু আজ যাবে না।

দলের একজন সাথে সাথে ছড়া কাটল ঃ

বুক গরম পিঠ কালহা
আগুন পোয়ায় কোন্ শালা।
এ-ভুঁইয়ের বস্তা ও-ভুঁইয়ে ফেলা।
এ-ভুঁই ইণ্ডে, ও-ভুঁই বাংলা।

অতএব আলস্য নাস্তি। চলো হে ওঠা যাক। না। যাবার কথা কেউ বলছে না। একজন কেবল ছড়া কেটেছে। গায়ে তেজ ধরাচ্ছে ঐ ছড়ার মর্ম। উত্তেজনার পয়ার। গা গরমের পুথি-বাক্। তনু শেষ রুটি মাটির খোলায় ফুলিয়ে নিতে নিতে বলে—তোরা কেউ যাস নে রে! ফকিরকে খাইয়ে আমি পা চালাব।

তনু ছেলেদের কাছে আবেদন করে ওঠে। ফকির একা। ফকিরের যে বারুদ আছে, তা দিয়ে পশুবধ করা যায় না। নাকি যায়? যদি সেই পশুতে দু ফোঁটা মানুষ থাকে। সাঁজালের চারপাশে অন্ধকারের চর বিস্তৃত পর্দা। সাঁজালের আলো উসকে উঠলে সেই অন্ধকার নড়ে স'রে দু'হাত তফাতে যাচ্ছে। আলো নিবু নিবু হলে সেই আঁধার ফের চেপে আসছে। অন্ধকার আলোর ছুঁই ছুঁই কোমর জড়িয়ে নড়াচড়ার সাঁওতালী নাচ, তনু দেখলো কী অদ্ভুত! একটু দূরে তনুর উনান নিভে গেল।

ফকিরের মুখের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে মিজান মৌলবী বলে ওঠেন—যাবার আগে ছেলেরা একটু গান শুনে যাক, মনটা খানিক খোলতাই হবে। কী বলেন ফকির? একখানা গাইবেন না আপনি? গান হারাম জিনিস, কিন্তু দেহতত্ত্বের গানে আমি বেশ স্বাদ পাই। সেই গানখানা আপনার জানা আছে? ছেলেরা বুঝতে পারছে না, আপনি এখানে কেন আসেন? ওরা আমায় শুধোচ্ছিল দুদিন আগে। ওদের বলেছি গানেই সে-কথা আছে। সেইটে আপনি শুনিয়ে দ্যান বাবাজী।

রুহুল কী করবে বুঝে পায় না। বলে, বলুন কোন সেই গান? কার গান? লালনের? মিজান বলেন—না হে বাবাজী! ওরে, কেরামত দাওয়া থেকে দু'তারাখানা এনে দে ফকিরকে। উনি গাইবেন বলছেন—না হে

বাবাজী! লালনের নবী গান নয়। ফটিক গোঁসাইয়ের নারী-ভজনার গান। রাজশাহীতে যখন ছিলাম, মেহেরপুরের এক ফকিরকে গাইতে শুনেছি। কী যেন সেই কথা! ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। 'সাধু হতে লয় কতজন প্রকৃতির আশ্রয়।'

ভারি সুন্দর কথা। চমৎকার কথা। একেবারে গূঢ় কথা। গান দেখি, ছেলেরা শুনুক! রুহুল মিজানের আব্দারে রীতিমত গম্ভীর হয়ে গেল। বুঝতে পারছিল, মোড়লীর কী অসাধারণ ক্ষমতা এই লোকের। কতদূর ভেবে এসেছে। কেরামত দোতারা এনে ফকিরের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ রুহুলের বুকের ভেতর কে যেন ভালবাসার আর্তনাদ করে ওঠে। নিজেকে সে মনে মনে বলে—

—কেন এলে এখানে? তুমিও কি আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছ ফকির? প্রকৃতিকে পেতে গিয়ে কি মূল্য দেবে আজ? সবই কি তোমার ভেসে যাবে? তোমার ধর্ম কি এতই কাঙাল?

দোতারা হাতে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ফকির। সারা শরীর উত্তেজনায় থরথর করে কেঁপে উঠল। দোতারা সহসা যেন কেমন আর্তনাদ করে কেঁদে উঠল আঙুলের ধাক্কায়। সবাই উৎসুক। তনু অন্ধকারে চোখ জেবলে বসে আছে। দুটি চোখ জবলছে। ফকির গেয়ে ওঠে আত্মধিক্কারে ঃ

'সাধু হতে লয় কতজন প্রকৃতির আশ্রয়।
সাধুর কাম-সাগরে বান ডাকিয়ে
প্রেমের পসার ভেসে যায়।'

ফকিরের গায়ে কালনাগিনী কিলবিল করে ওঠে। পেঁচা চোখ বুঁজে গদগদ। সোনাগোরী বিষন্ন। গায়ের দোলায় নড়ছে চড়ছে। ফকির গাইছে ঃ

'প্রেমের ওঝা না সাজিয়ে
কেন তোর সাপ ধরা মতি হল?
মস্তকে দংশিলে ফণী
তাগা বাঁধবি কোন জায়গায়?
সাধু হতে লয় কতজন প্রকৃতির আশ্রয়।'

রুহুলের দোতারা আর্তনাদে ফেটে পড়ছে। বিনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে যাচ্ছে। ফকিরের এই দুঃসহ ব্যাকুলতায় তনুর চোখে জল ভরে আসে। ফকির যে পাগল হয়ে গেছে। সাধু থামতেই মৌলবীর কড়া গলার প্রশ্ন— আপনার এই মতি হল কেন ফকির ছায়েব? কেন এলেন এখানে? যাও ছেলেরা, তোমরা উত্তর পেয়েছ, এখন আমাদের কাজ করতে দাও। বলুন ফকির, কার কাছে এলেন আপনি? এ যে মুসলমানের ঘরের বউ? কৈ হে কিস্মত্- এবার

ওনাকে তাগা দিয়ে বাঁধতে হয় যে! ভেড়ার পশম আর ফকিরের গোঁফদাড়ি খুব মূল্যবান বস্তু। আগে ওনাকে গোস্ত-রুটি খাওয়াও; মুসলমানের প্রিয় খাদ্য। সেইটে খেয়ে আপনার হাজমত হবে, কামান হবে। তনু বিটি, তরকারি এনে দাও মা। বাঁজী গাইয়ের গোস্ত। গেরস্ত আগেই পাঠিয়েছে। কৈ কোথায় রেখেছ?

রুহুল বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দেয়—

—আপনি দেহতত্ত্ব শুনেছেন মৌলবী সাহেব। জানেন, আমরা গো-মাংসই শুধু নয়, মাছ ডিম কোন আমিষই খাই না।

মৌলবীর প্রশ্ন—কেন খান না?

রুহুল উত্তর করে—শাস্ত্রে লিখেছে খেতে নেই, তাই খাই না এমন নয়। খাই না, শরীরের পক্ষে ওগুলোর দরকার নেই। রক্ত গরম রাখে। মন স্থির হতে দেয় না। তাছাড়া, এই গরু নিয়ে হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ করে বলেও খেতে ঘেন্না হয়। গরুর মাংস জোর করে খাইয়ে কারুকে মুসলমান করা যায় মনে করেন আপনারা, এইজন্যই আরো খাই না। মুচিরা এত গরু খেয়ে বেড়াচ্ছে ভাগাড়ে ভাগাড়ে, তবু ওরা মুসলমান হতে পারল না। মুসলমানের সতর পেল না। দেখেছি আমার গাঁ স্বরূপপুরে কোরবানীর সময় ওরা মুসলমানের দুয়ারে মাংস ভিক্ষেও করে বেড়ায় কেউ কেউ। তবু আপনারা দয়া করলেন না। হিন্দুরাও তাড়িয়ে দিল। এই জন্য খেতে গেলেই মন খারাপ করে। তাই খাই না। সুরা বাকারায় আছে···

মৌলবীর তপ্ত প্রশ্ন—কোথায় আছে?

উত্তর—কোরানে আছে। সুরা বাকারায় আছে। বাকারা মানে গাভী। কিন্তু আমরা বলি অন্য কথা। হিন্দু-মুসলমান বাকারা নিয়ে দ্বন্দ্ব করে। আমরা বলি, গাভীর বর্ণ নানান কিন্তু বিচিত্রবর্ণ গাভী দুইলে দুধের বর্ণ এক।

মৌলবী বলেন—হ্যাঁ গাভী। কী আছে বাকারায়? নানাবর্ণ গাভী? হাজমত এবার গর্জন করে ওঠে—রাখো তুমার বাকারা। যে মেয়ে গরু খায়, তার কাছে এলে গরু খেতে হবে এই আমার হাদিস, আমাদের হাদিস, মিজানজীর বাকারা। শালা সাধু কোন ডহরে এস্যাছে, তলব জানে না। কেরামত ক্ষুরে শান দে বেটা; সাধুর সব পশম ঝুড়ে দে বাপ।

মিজানজী স্থির মানুষ, ওদের খানিক নিরস্ত করে বলেন—গোলমাল করো না। সব হচ্ছে। আগে শুনি বাকারায় কী বলছে। বলুন বাবাজী। আগুন উস্‌কে দে ছেলেরা।

দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। তার আগেই অন্ধকারে চুপিচুপি তনু ঘরের দরজায় শেকল তুলে তালা এঁটে কোমরের ডোরে চাবি ঝুলিয়ে নেয়।

ফকির বলে—বাকরায় হজরত মুশাকে খোদা নির্দেশ দিয়ে বলছেন, গাভী বধ করো, কেমন গাভী জবাই দেবে তারও বর্ণনা আছে। মুশা সেই নির্দেশ দিচেছন উম্মতকে গাভী বধ করতে হবে, খুব কড়া হুকুম। বোঝা যাচেছ, আগে গরু হত্যা হত না। একটা ইতিহাস আছে মিজানজী।

মৌলবী বললেন—ঠিকই বলেছেন, কড়া হুকুম। তাই গরু খেয়ে মুসলমান হলে খোদা খুশি হয়। আর মুচিরা তো মরা গরু খায় সাধুবাবা, সেইটে হালাল নয়। স্বাস্থ্যসম্মত নয়। না হলে বাকারায় বধ করার নির্দেশ হত না। সেটা কুরবানী।

ফকির বলব না ভেবেও বলে—কিন্তু আপনারা কি জবাই করার পর তাজা গরু খান? হ'লই বা কুরবানী। জীবন্মৃত গরুর মাংস মুচিরাও খায় না। ভাগাড়ের সব গরুই টানাটানি করে না। ওরাও দেখেশুনেই খায়। তা তাজা গরু খেলেই কি একটা মানুষ…

—এহু শালা!

দুই জোয়ানের একজন কেরামত। গর্জন করে ক্ষুর নিয়ে তেড়ে এসে সাঁজালে বসে থাকা ফকিরকে অকস্মাৎ পেছনে টেনে চিৎ করে বুকে চেপে বসে। জোয়ানের দ্বিতীয়জন কিসমত দড়ি দিয়ে ফকিরের দুই পা বেঁধে ফেলে। কেরামত গলায় ক্ষুর তাক করে থাকে। পেছনে দু হাত বাঁধা হয় তারপর। বুকে ওদের ফকিরের কথা ধ্বক করে বিঁধেছে। কারণ মুচিরা তো চটে বসে পূজা মণ্ডপের মাটিতে হরসন ঢোল কাঁসি বাজায়। মৌলবী বলেন—বেশ তাগা বাঁধা হল। প্রকৃতি খায়, মরাই হোক আর তাজাই হোক, পুরুষও খাবে এবার। মা তনু বিবি নিয়ে এসো মা। নিজে হাতে মুখে তুলে একটু খাইয়ে যাও। আমরা ভিনজাতির মেয়ে শাদী করে ধর্ম শেখাই। আর এ-শালা ফকির ওর ধর্মে সেই মেয়েকে টেনে নিয়ে যাবে? নিয়ে এসো মা।

তনু জবাব দেয়—ঐ মাংস আমি ফেলে দিয়েছি।

হাজমতের মাথায় খুন চাপে। বলে—ফকির এস্যাছে শুনেই গরু জবাই হল তনু। তুই সেই গোস ফেলে দিলি?

তনুর দিকে এগিয়ে যায় হাজমত। হাতে গরুর গাড়ির 'সিমলে'। (জোঁয়ালের ফুটোর মোটা পকানো লাঠি, খাটো মতো)।

বসে থাকা তনুর পা দুখানার একটি খপ্ করে চেপে ধরে আচমকা প্রহার করে তীব্র। তনু চিৎকার করে ওঠে। হাজমত বলে—চাবি ফেলে দে, ঘরে গোস আছে। দে হারামজাদী, আজ দুই তালাকের রাত। চাই কি, বাধা দিলে, এই রাতেই তিন তালাক হয়ে যাবে।

ফকিরের গোঁফদাঁড়ি দেখতে দেখতে কাটা হয়। মাথার চুল কেটে দেয়। তনু মার খেতে খেতে অজ্ঞান হয়ে যায়। ফকিরকে তাবত দল হৈ চৈ করে

কোথায় তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে, জ্ঞান হারাতে হারাতে তনু দেখতে পায়। তারপর সম্পূর্ণ চৈতন্য হারিয়ে ফেলে। অচৈতন্য দেহকে আঁধার দাওয়ায় তুলে সবাই চলে গেলে হাজমত ধর্ষণ করে। তারপর কানের কাছে মুখ রেখে বলে—তালাক!

জ্ঞান ফিরে পেতে পেতে সময় বহে গিয়েছে। মধ্য রাত্রি এসেছে উঠোনের আকাশে। কানের কাছে গুনগুনিয়ে বেজে চলেছে ঃ 'সাধু হতে লয় কতজন প্রকৃতির আশ্রয়।' সহসা অন্ধকারে তনুর মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। অজস্র নক্ষত্রখচিত আকাশ। অন্ধকার। বুঝতে পারে, সর্বাঙ্গ অবশ। পা তুলতে পারে না। ফকিরের দাড়ি গোঁফ কামানো করুণ মুখ চোখে ভাসে। ফকির আশ্রয় চেয়েছিল। ফকির কি বেঁচে আছে? ফকির অত দৃঢ় হয়েও ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিল। দুটি চোখ ছলছল করে উঠেছিল। সামান্য বাধা দিয়েছিল বলে এলোপাথাড়ি ঘুসি চালিয়ে যাচ্ছিল ওরা। কিসমত মাথার চুলকে খামচে ধরে ক্ষুর চালানোর সুবিধা করে নিতে টেনে সিধে করছিল বারবার। ফকির ডুকরে উঠেছিল। ফকিরকে ওরা নেড়া করে দিয়েছে, তখনও ওর চোখের জল সাঁজালের আলোয় চিকচিক করছে। দাড়ি গোঁফ সাফ হয়ে গেলে ফকির ঘাড় নিচু করে রইল। লজ্জায় বেদনায় চোখ তুলতে পারছে না। চোখ দিয়ে নিঃশব্দে টপটপ করে জল পড়ল চার ফোঁটা। কিসমত ফের চুল আঁকড়ে খামচালো। অস্ফুট ডুকরালো ফকির। চোখ ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। সেই চোখে চোখ পড়ল তনুর। হাজমত তনুর পায়ের গাঁটে সিমলের আঘাত করল আবার। ঠোঁট ঠোঁটে চেপে তনু যন্ত্রণা দমন করে। জানে এরা কোন কথা শুনবে না। সাধ মিটিয়ে মারবে, অপমান করবে। হাজমত চাবি চাইছে। তনু বলল—চাবিখানা অন্ধকারে কোথায় পড়ে গিয়েছে। হাজমত বিশ্বাস করল না। গাঁটে তীব্র যন্ত্রণা দিতে লাগল। ফকিরের ঝাপসা দুই চোখ ক্রমশ দৃষ্টি ক্ষমতার বাইরে হারিয়ে যেতে লাগল। চেতনালুপ্ত হয়ে গেল। সবাই ফকিরকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে বাইরে চলে গেল। দুটি অপমানিত অশ্রু আচ্ছন্ন চোখ আশ্রয় চেয়ে অন্ধকারে চলে গেছে। মনে মনে বলল তনু—কখনও এভাবে এসো না ফকির। কখনও এভাবে মুচি মেথর করে কথা বলো না। সোনার মানুষ তুমি কোথায় পাবে, মানব জমিন সব যে এই আঁধারে উরানবিরান হয়ে গিয়েছে, সাধু গো!

তনু উঠোনে বহুকষ্টে লেংচে নেমে আসে। উঠোন পেরিয়ে। সহসা 'খালা গো' শুনে ভয়ে চমকে ওঠে। রছুল বাড়িতে ঢোকার মুখে বেড়া ধরে দাঁড়িয়ে আছে। রছুল বলে—চরের উদিকে সাদু পড়ে আছে খালা! বাঁদন খুলা যায় নি। একখান অসতর লিয়ে যাও। আমি পালাই। রছুল অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। তনু লেংচে লেংচে চরের অন্ধকারে নেমে পড়ে।

ফকিরকে চরের অন্ধকারে খুঁজে পায় অনেক দূর এসে। ভি-পয়েন্টের উপর। ধড় এপারে মুন্ডু ওপারে। ফকিরের কাছে এসে তনু হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। কতক্ষণ কথা বলতে পারে না। ফকির বলে—বাঁধন খোলো তনু। আমাকে মুক্ত করো। ওরা চিরকাল এম্নি করে মেরেছে আমাদের। ফেলে দিয়েছে। আমরা এইরকম আঁধারে লুকিয়ে ফিরেছি তনু। চলো যাওয়া যাক।

—কোথায় যাব ফকির? তনু কাতর প্রশ্ন করে! বলে—আমি যে চলতে পারি না।

ফকির তনুকে ঘাড়ে তুলে নেয়। বলে—দোতারা এনেছ?

—হ্যাঁ।

—কাঁথা?

—ওটা বোধহয় হাজমত গায়ে দিয়ে গেছে। পশু পাখির নকসি।

ফকির পূব দিগন্তে সূর্যোদয়ের পথে হাঁটছে। তনুর রক্তমাখা পায়ে তার জামা ধুতি ঘষা লেগে ভিজে যাচ্ছে। বাঁ বুকের কাছে যেখানে কালবুল মোমিনো আরশুইল্লাহে তালা, খোদার সিংহাসন, সেখানে নূরের বাতি উদ্ভাসিত। টলতে টলতে ফকির এগিয়ে চলেছে। কাঁধে তার দোতারা ধরে আছে তারই প্রকৃতি। পূব-দিগন্তে ঊষার কুসুমে ভোর হয়ে আসছে।

# বড় জোর দুই মাইল

খুনের ইতিকথা বড়ই জটিল আর বিচিত্র। প্রথমে শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করা হয়, তারপর সেই মুণ্ডু কোথাও বহে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেওয়া হয়, কোথায় তা লুক্কাইত থাকে, সেই চিহ্ন পাওয়া যায় না।

অত বড় পরিণত মাথাটা ঘাতকরা সরিয়ে ফেলল কেন? কী কাজে লাগবে মৃত মানষের মুণ্ডু? অবশ্য এই ধরনের মার-মৃত্যু-ষড়যন্ত্র যখন হয় মুণ্ডু একদিকে ধড় অন্যদিকে পড়ে থাকবে, সেকথা বারবার না বললে বৃত্তান্ত পুরো হয় না। সামান্য কোন ডাকাতির ঘটনা যে নয় বলাই তা বাহুল্য। প্রচণ্ড বিদ্বেষবশত এরকম হয়েছে। কাথাউড়ির মাহেশ্বরা, নতুবা ঘোষেরা গোপনে লোক 'ফিট' করিয়েই কি ইমরানকে সাবড়ালো? এটা তবে গুমখুনের ঘটনা নিশ্চয়ই। গৌরাঙ্গ ওরফে গোরা দারোগা ( চার আনির দারোগা )-র হতবুদ্ধি হওয়ার মতন অবস্থা।

ধরা যাক, কাঁচ-পোতা দেওয়াল টপকে ওরা উঠোনে নেমেছে। তারপর দরজার বাইরের কড়া ধরে নেড়ে ইমরানকে ডেকেছে। চাপা গলায়—ইমরানভাই! দুয়ার খুলো হাজীর পো!... খুব মৃদুমৃদু কড়া নাড়ার শব্দ।

গোরা দারোগা রাত্রির সেই কড়া নাড়ার শব্দই যেন শুনতে পাচ্ছেন। ইমরান দরজা সামান্য ফাঁক করতেই ঘাতকরা ঝাঁপিয়ে পড়ল, বুকের ভিতর অস্ত্র চালিয়ে দিল। গুপ্তি বা হেঁসো। কিন্তু বুকের ভিতর কখন গুপ্তি, আর হেঁসোই বা চলল কখন ঘাড়ের উপর! ডেডবডি দেখে বোঝা যায় বুকে সামান্য ক্ষতচিহ্ন, রক্তপাত নেই বললেই চলে। সমস্ত শরীরটা তাজা হয়ে আছে। কোপ পড়েছে ঘাড়ের জোড়ে। অদ্ভুত! অদ্ভুত ঘটনা। ঘাড়েই কেন কোপ

পড়ল, দেহের অন্যত্র আর কোথাও আঘাত নেই কেন? তারপরই মুণ্ডু নিপাত্তা!

তাহলে তদন্ত কীভাবে সম্ভব! জোড়া বেঞ্চের উপর শোয়ানো মুণ্ডুহারা লাশ। সাদা চাদরে ঢাকা। সেখান থেকে সরে চলে আসেন দারোগা। নিজেকে তাঁর কেমন বিহ্বল লাগে। অথচ প্রাথমিক তদন্তটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চোরা চোখে এমন অনেক কিছুই তদন্ত করতে হবে। খুব সাবধানে আর সতর্কতায় প্রতিটি পদক্ষেপ গুনে গুনে ফেলতে হবে। বিহ্বলতা নয়, তীব্র সতর্ক দৃষ্টি আর মাপা বুদ্ধির জেরা। তার আগে খুনের ব্যাক-গ্রাউণ্ড দরকার। সেটি কতদূরে রয়েছে কে জানে। হয়ত হাতের কাছেই রয়েছে। অথবা রয়েছে অনেক অতীতে। আবার এমন হতে পারে, সাময়িক একটা উত্তেজনার শিকার হয়েছে ইমরান। কোন তুচ্ছ ঘটনা এর জন্য দায়ী! কী সেই ঘটনা?

ভাবতে ভাবতে গোরা দারোগার বড় বড় চোখদুটি সরু হয়ে এল। চোখদুটি বড়ই সুন্দর। স্বচ্ছ জলের মতন টলটলে। রক্ত-রাঙাশ চোখ নয়। মদ কুটিল, বদরাগী, ঘোলা দৃষ্টি ভাসিত চোরা চোখ নয়। ছবি আঁকার মতন চোখ। দুধখোকা টাইপের নিষ্পাপ চোখে খুনের তদন্ত হয়? দারোগার চোখ কে বলবে!

দৃঢ় স্বাস্থ্য, লম্বা চওড়া ভব্য চেহারা, পোক্ত কব্জি। পোশাকেও ফিটফাট। বেল্টে ঝুলন্ত রিভলবার। হাতে কালো পাকানো রুল। চোখে চশমা। চশমার ভেতরে উদাসীন নরম দুটি ঈষৎ বিষণ্ণ চোখের দিকে চেয়ে রোমাণ্টিক মেয়েরা যৌবনের সূচনায় প্রেমে পড়ে। পাগলের মত ভালবাসে। চৈতালীও তাই করেছিলেন। তখন গোরা মুকুন্দে সাহারানপুরের হাইস্কুলের ফিলজফির টিচার। সেই খেয়ালি শিক্ষকতা আর বিষণ্ণ মধুর চোখ মিলে এক অগাধ বিশ্বস্ততা দিয়েছিল চৈতালীর মনে। চৈতালী পাগল হয়েছিলেন।

টুলের উপর বসে পড়েছিলেন গোরাবাবু। মাথার ক্যাপটা মাথা থেকে নামিয়ে হাঁটুটায় যেন পরালেন। এই এক বদ অভ্যাস। নিজেরই হাঁটুতে মাথার টুপি রাখা, ফের পরিয়ে দেওয়া, মাথা নয়, এটা যেন হাঁটুরই বস্তু। বাচ্চা ছেলেরা দেখে হাসে। দারোগার খেয়ালিপনা, পাগলামির আরো অনেক নিদর্শন আছে। নিজেকে তিনি নিজেই অনেক সময় দারোগা ভাবতে পারেন না। শিক্ষক থেকে দারোগা, এটি যেন এক পরিহাস বা পাগলামিই।

চৈতালি বলেন—এই চাকরি তুমি ছেড়ে দাও মাস্টারমশাই। ফিরে চলো। স্কুল এখনও তোমাকে চায়। সেক্রেটারি এখনও তোমার কথা বলেন। কোন মানুষই তোমায় সাধারণ অবস্থায় দেখে পুলিশের লোক ভাবতেই পারে না।

—তা কী করে ভাববে! পোশাক পরলে তবে তো পুলিশ! হাসতে হাসতে জবাব করেন গোরা মুখার্জি।

বউ বলেন—তাই বা কে বলেছে! এই পোশাকে তোমাকে মানায় না। ফিরে চলো। এ চাকরিতে তুমি কখনও উন্নতি করতে পারবে না। দারোগার বুদ্ধি আলাদা।

গৌরাঙ্গ বলেন—চাকরির উন্নতিই কি বড় কথা। আমি আসলে মানুষের অপরাধ জগৎটাকে প্রত্যক্ষ করতে চাই।

চৈতালী মন্তব্য করেন—অনেক দেখেছ। এবার ফিরে চলো। মানুষ বড় পাপী গো। আমি সইতে পারি না।

দারোগা হেসে ফেলে বলেন—মানুষের শেষ কথাটা এখনও আমার জানা হয়নি। মানুষ যে অপরাধ অন্যায় করছে, সবখানি তার নিজের করা নয়। ভগবান বা শয়তান করাচ্ছে, তাও বলব না। মানুষ খুব বিকল আর অসহায় হয়ে, দিশেহারা হয়ে এই সব করছে। নিজেকে আটকে রাখার ক্ষমতা মানুষের শেষ হয়ে যাচ্ছে।

একটু থেমে দারোগা আরো হেসে ফেলেন—ফিলজফির মাস্টার আমি। দারোগা হয়েও মাস্টারির ভাষা মুখ থেকে নড়েনি, একটা কথা আজকাল হামেশাই মনে হয়। মানুষ একলা কখনও আপনাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। মানুষের চাই সংঘশক্তি। খারাপ থেকে মন্দ থেকে নিজেকে বিরত রাখার ক্ষমতা একলার হয় না। একলা যিনি পারেন, তিনি সুপারম্যান? অথচ মানুষ আজ নিতান্ত-একা। গোটা সমাজ তার বিরুদ্ধে চলে গিয়েছে। এই একাকিত্ব ভয়ংকর। মানুষ যে খুন করে, একা হলেই খুন করে। একা হয়ে গিয়ে মানুষ খুন করে ফেলে। খুনের মুহূর্তটির কথা ভাবো। যে মানুষটা খুন হয়ে গেল, খুন হওয়ার সময় তার নিজের বলতে কেউ ছিল না। সেই একাকিত্ব কী সাংঘাতিক! আবার যে খুন করল, সেও কিন্তু ঠিক ততটাই একা। তারও কেউ নেই। কেউ রয়েছে, ভাবলে মানুষ খুন করতে পারে না। কখনই পারে না।

এই সব গূঢ় কথা শুনতে শুনতে মন খারাপ করেন চৈতালী। চৈতালী বলে ওঠেন—আর কিছুদিন এ লাইনে থাকলে তুমি পাগল হয়ে যাবে। আমি চাই না, আমার স্বামী পাগল হোক। তোমাকে এই চাকরি ছাড়তেই হবে। নইলে, যেদিকে দুচোখ চায় পালাব।

এত করে চাপ দিয়েও মুখুজ্জের চাকরি ছেড়ে ফিরে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। মনটা তাঁরও খুব পালাই পালাই করে। কিন্তু একটার পর একটা ঘটনা তাঁকে আটকে বেঁধে ফেলে। তিনি ভাবেন, চলতি এই 'কেস'টার মোকাবিলা করেই ইস্তফা দেবেন। কিন্তু একটি ঘটনার কিনারা হতে না হতে অন্য একটি

ঘটনা এসে জড়ো হয় টেবিলে। চৈতালীর খুব ভয়। কখন হয়ত মুখুজ্জে প্রাণেই মারা পড়েন। বিপদ, প্রাণ হারানোর আশংকা পায়ে পায়ে। গ্রামের মানুষগুলোও বোমা বাঁধতে শিখে গেছে। বিড়ি বাঁধা কারিগরের বাড়িতেও আজকাল শস্তা সন্তোষ রেডিও আর বাংলাদেশী সীমান্ত ডিঙিয়ে আসা কম পয়সায় দুনম্বরী বন্দুক পাওয়া যায়। মানুষের প্রাণ এখন কর্পূরের কৌটোয় কর্পূরের গন্ধবড়ির মতন শুয়ে থাকে। তা সে দারোগাই হোক কিংবা ভিখিরিই হোক। সেই ভয়ে চৈতালী মাঝেমিশেলে পুলিশী বুলেট বাইকের 'ব্যাকে' বসে স্বামীর সঙ্গে গাঁয়ে চলে আসেন। স্বামী আপত্তি করলে কান্নাকাটি করেন, চোখ রাঙান, অভিমান করে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে থাকেন। অগত্যা কোন কোন ঘটনায় বউকে সঙ্গে নিতেই হয়। মুখুজ্জে অসহায়। মেয়েদের চোখের জলকে ভয় পান না এমন পুরুষ পুলিশলাইনেও বিরল।

আজ ভোরেও চৈতালী স্বামীর সঙ্গে এসেছেন। থানা এখান থেকে চার মাইল পথ। পাকা সড়ক নয়, কাঁচা পথ। সূর্য ফোটার সেই কুসুমভোরে এই দুর্ঘটনার খবর পৌঁছে যায় থানায়। খবর নিয়ে যায় এ বাড়ির কিষেণ। নাম আকছার। আঁকা ফকির। কিন্তু ওকে সবাই ডাকাত বলে ডাকে। চেরাগ ডাকাতের ছেলে বলে ওর নামের এই হেনস্থা। ডাকাত কথাটা পদবীর মতন হয়েছে। আসলে বেচারি ঘর খাটা কিষেণ। আচম্বিত দুর্ঘটনা, এত বড় খুন—উত্তেজনায় ওর গলা কাঁপছিল।

ইমরান খুন হওয়ার ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার ব্যাকগ্রাউণ্ড আছে। সেটি অবশ্যই গণিতব্য। খুচরো দাঙ্গা এই দেশে আকছার বেঁধে গিয়ে মিটে যায়, ফের বাঁধে। এটা রোগের উপসর্গের মতন, যেমন জ্বর, সর্দি কাশি বা বেদম মাথাধরা। একটি ঘুসঘুসে তরল জ্বরে বাংলার মাটি পুড়ছে ইদানীং। খচড়ানো স্বভাবের সেই জ্বরটা ছেড়ে যায়, আবার ধরে। জ্বরটা ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ বুঝতে পারে, আবার ধরবে।

ইমরান বন্দুক উঁচিয়ে কাঁথাউড়ির মাহেশ্বদের তেড়ে গিয়েছিল। সেই গোঁয়াতুমির কথা বাতাসের গা থেকে বৃষ্টির ফোঁটার মত ঝরে পড়ার আগেই এই খুন। জলে ভেজা মুরাগ যেমন করে পালক ঝাপটায় গেরস্তর গায়ের পাশে দাঁড়িয়ে আর গা ফোলায়, থানার গা এখন তেমনই করছে—অন্তত গোরাবাবুর তো করছেই।

দারোগা শুধালেন—তোমার মত এত প্রকাণ্ড একজন ডাকাত থাকতে মনিব বাড়িতে সাংঘাতিক এই খুন হয় কী করে আকছার আলি? চেরাগ আলির পো। আঁকা কাঁপতে কাঁপতে বলল—আমি ছিনু না হুজুর! আমি গোলাবাড়িতে রাত কাটাই।

—গোলাবাড়ি কত দূর?

—পাঁচ রসি পথ হুজুর! বিহানে গরুকে জাবনা দিতে গেরস্তর আঙনের যাই হুজুর। খুন হয়েছে রেতে। খপর পেনু সেই বিহানে, ফজর বেলা। ছুটে এনু আপনার কাছে। আমি ভালমন্দ জানি নে দারোগাবাবু। বাপ ছিল ডাকাত লোকের কথা হুজুর, বেশ ছিল। তাই নামমন্দা মুনিষ্যি আমি। পাঁচ ঘা মারার থাকলে মারবেন, চরিত্তির দোষ দিবেন না। মিছা জুবানে মুখে কুষ্ঠি হয় জানবেন।

দারোগাবাবু হেসে ফেলে বললেন—বেশ বেশ! তোমার দোষ আমি দিচ্ছি না। আমি শুধু জানতে চাই, খুন করল কে? কারা করল? কেন করল? এই ঘটনা আদতে ঘটল কেন?

আঁকা বলল—সে বড় বিপাক দারোগাবাবু!

বলেই খানিকক্ষণ দম নেয় আঁকা ফকির। তারপর এক আশ্চর্য দর্শনের কথা বলতে থাকে। মাটির তলায় সেই দর্শনের গুপ্তঘর আছে। সে চেয়ে-ছিল মাটির দিকে, যেন সে মাটি থেকে কথা পাঠ করে শোনাচ্ছিল, যেন সে দর্শনের গুপ্তঘর থেকে কথাগুলি শুনতে পাচ্ছিল আর বলে যাচ্ছিল।

বলল—মানুষের মনের আঁঠায় কাঁঠায় (আনাচে কানাচে) বড় গোলযোগ চলছে। বুকে যার কষ্টের বেগ লাগে, সেই তো খুন করে। না কি বুলেন? মনের চেহারা তো ধরা যায় নে হুজুর। কষ্টের সেই বেগ কেমুন ধারা, আপনিও চিনবেন নে, আমিও চিনব নে, যে কতল করবে, সেও চিনবে নে। চিনতে পারলে তো খুন হয় নে, হুজুর। খুন করার সময় মুনিষ্যির মনের কুনো চিহ্ন থাকে নে। বাপজী আমারে বুলে যেয়েচেন। খুন একটা করে ফেলতে পারলে, ওইডে হল গে বিসমিল্লা জানবেন, তারপর তো ডাকাতির হাতেখড়ি হুজুর। আমি আপনার গে পারিনি।

গোরাবাবু ফের উচ্চহাস্য করে বলেন—তুই যে দেখছি গোরা দারোগার চেয়েও মস্ত ফিলজফার রে আঁকা!

—হ্যাঁ হুজুর!

—তুই ফিলজফার! পরম কৌতুকবোধ করেন দারোগা।

—জী হুজুর!

ইংরিজি শব্দটার অর্থ না বুঝেই আঁকা কথার তোড়ে বলে যায় 'জী হুজুর।' কথা বলাটা যে ওর নেশা, দারোগা বুঝতে পারেন। আঁকা কিন্তু বলেই যায়—জী হুজুর! খুন আমরা সবাই করি। মনে মনে—যখন সেইডে বাস্তবিক ঘটে গেল, তখন সেই মনডাই অচেনা নিউদ্দেশ (নিরুদ্দেশ) হল হুজুর! সেইডেই সমিস্যা জানবেন। খুনীকে ধরবেন, কিন্তুক তার মুখডাকে ধরতে পারবেন নে। ঘাড়ের ফেরেস্তাও সেই মুন চিনবে নে বাবু। আপনি আমি তো ছার! আমি এক্কে আকছার!

দারোগা অবাক। অবাকই নয়, কেমন হতভম্ব হয়ে পড়েন শুনতে শুনতে। বললেন—সে কি রে!

—হ্যাঁ হুজুর। বাপজী সেকথা বলে যেয়েছেন। তেবে, ইমরানভাইকে যে খুন করে গেল, কাঁথাউঁড়ির মাহেশ্বরা ওই খুন করিয়েছে জানবেন। হিন্দু মোচলমানের বিপাকে জানডা চলে গেল। হাজী সাব সন্দ করে, আমিও করি।

খুবই আশ্চর্য হয়ে নিষ্পলক আঁকার দিকে চেয়ে থাকলেন দারোগা! তারপর মৃদু স্বরে বললেন—বাপের উপর তোর খুব ভক্তি, তাই না! ঠিক আছে। তুই যা। আমি যাচ্ছি। দশ মিনিটের মধ্যে আমি পোঁছব। তার আগে বিশ মিনিট তৈরি হতে সময় নেব। মুখটা পর্যন্ত ধুইনি।

গত রাতে অফিসেই রাত কেটেছে তাঁর। চেয়ারে বসে টেবিলে মাথা ঠেকিয়ে ঘুমিয়েছেন। এই ভোরে কোয়ার্টারের দিকে পা বাড়ালেন। চিন্তায় তাঁকে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত দেখাচ্ছিল।

তদন্ত কীভাবে হবে? বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের নখের উপর নেলপালিশের রক্তাক্ত তেজি গন্ধ এখনও স্পষ্ট। সেদিকে কেউ চেয়েও দেখছে না। টুলের উপর বসে থাকতে থাকতে সেই আঙুলটার উপর দারোগার চোখ বারবার আটকে পড়ছিল। এই নেলপালিশ কদিনের পুরনো? কবেকার? কারো চোখ সুন্দর সেই দীঘল আঙুলের দিকে পোঁছয় না। পুরুষের নখে কেন অমন সুদৃশ্য রঙ লেগে আছে, এ বিষয়ে কারো কোন কথা নেই।

কথা থাকার কথাও নয়। একজন মানুষ খুন হওয়ার পর, প্রাণহীন দেহে ওই রঙের উজ্জলতায় যে মর্মঘাতী বেদনা লুকিয়ে আছে, তা যেমন সাধারণ মানুষ খেয়াল করে না, একজন দারোগারও কি করা উচিত? তবে করা উচিত একটি কারণে, আর তা হল, যদি এই রঙ অন্য কেউ লাগিয়ে থাকে, কোন স্ত্রীলোক যদি লাগিয়ে থাকে, যেমন ইমরানের স্ত্রীই যদি লাগায়, তাহলে কখন সে লাগিয়েছে, সকালে, না রাতে, সেটি দেখতে হবে। রঙ লাগালে বুঝতে হবে স্ত্রীর সঙ্গে ইমরানের সম্বন্ধ ছিল খুব সুন্দর। আর ইমরান যদি নিজে লাগিয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে লোকটি ছিল ভয়ানক শৌখিন। আহা! এ যদি স্ত্রী লাগায়, তাহলে সেই মেয়েটির কষ্টের কি কোন অন্ত আছে!

একজন দারোগা আদৌ এভাবে ভাবেন কি না সন্দেহ আছে। একজন কবি হয়ত এভাবে ভাবতে পারেন, দারোগা কারো কষ্টের অনুসন্ধান করেন না। গৌরাঙ্গ নিজেকেই বললেন—তুমি তো দারোগা নও হে! তুমি তো মাষ্টার মশাই। বারোআনাই তুমি মাষ্টার। চার আনা দারোগা। চার আনির গোরা দারোগা। দারোগা না হতে পারা দারোগা গোরাবাবু। থানার মেজবাবু হয়ে রইলেন তিনি, ও সি হতে পারলেন না।

দারোগা দেখছিলেন নেলপালিশের রঙ। নানা কথা ভাবতে ভাবতে তিনি টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সহসাই মনে হল, রঙ লাগিয়েছে যে মেয়েটি তাকে একবার দেখা দরকার। চৈতালী কোথায় গেলেন? এই তদন্তে বিনি বেতনের তিনি এক সহযোগী, বলা যায় সহযোগিনী। আসলে স্বামীর পাছে কোন বিপদ হয়, সেই ভয়ে এত ভোরে স্বামীকে তিনি অনুসরণ করেছেন। লোকে অবশ্য একথা জানে দারোগার চেয়ে দারোগার বউ বেশি চালাক। সানাইয়ের চেয়ে পোঁ চিকন আর চড়া।

গোরাবাবুকে উঠে দাঁড়াতে দেখে চারপাশের লোকজন ভেবে পেল না, এবার তিনি ঠিক কোন্ দিকে যাবেন, কী করবেন? তিনি ভাবছেনই বা কী? চারপাশে লোকের ভিড়ে থই থই করছে। জোড়া বেঞ্চে শোয়ানো লাশের মুন্ডু নেই, তাই চাদরে ঢেকে রাখা হয়েছে। কিন্তু একখানা হাত নেলপালিশ সুদ্ধ বাইরে ঝুলছে। আবার চোখ পড়ল তাঁর। তিনি বাড়ির বারান্দায় ওঠার জন্য সিঁড়িতে পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ থেমে পড়েন। বারান্দায় বসে থাকা, মোড়ার উপর ঝিমুচ্ছেন এক বিষণ্ণ শোকাহত বৃদ্ধ। ইনিই হাজী সাহেব। শরিয়ত। দারোগার মায়াময় চোখ দুটি দণ্ডভর শরিয়তকে দেখে নেয়। চোখ দুটি বারান্দার ভিড়ের উপর ছুঁয়ে ঘুরে আসে উঠোনের জটলার ভিতর। তারপর নেলপালিশ মাখা নখের উপর। বারান্দার উত্তর প্রান্তে ঘরের চৌকাঠ জুড়ে ঘরের ভিতর অবধি মেয়েদের জটলা। তাঁকে যেতে হত ওইখানে। আশা করা যায়, ইমরানের বউ ওখানেই আছে!

চোখ ঘুরে এসে নেলপালিশের উপর থামল। তিনি এবার এগিয়ে আসেন লাশের কাছে। তাঁকে প্রচুর মানুষ লক্ষ্য করছে বরাবর। এখান থেকে জাফরি-কাটা বারান্দার ঘেরা দেয়ালের ফাঁক দিয়ে শরিয়তকে দেখা যাচ্ছে। দারোগা লাশের উপর ঝুঁকলেন। ঘাড় অনেকখানি নিচু করলেন। নিচু হয়ে তিনি শরিয়তের দিকে ঘাড় কাত করে চাইলেন।

শরিয়তের কপালের নিচের অংশ, চোখের কাঁচাপাকা ভুরু, ভিতরে সেঁধিয়ে পড়া গহ্বরের মত চোখ, যেন তাপে শোকে বিষণ্ণতায় মাত্রাধিক উজ্জ্বল একটু ঠিকরে পড়া—চোখে পড়ল দারোগার। দারোগা একবার চোখের দিকে চাইলেন, একবার নেলপালিশের দিকে। তারপর খপ করে চাদর ছাড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়া স্ত্রীর আদরলাঞ্ছিত রঙিন নখওলা হাতখানি গোরাবাবু চাদরের ভিতর দ্রুত ঢুকিয়ে গুঁজে দেন। মানুষ যেমন চুরি করে অপরাধীর মত কোন কাজ করে ঠিক তেমনি করে যেন তিনি করলেন। সবার চোখের সামনে হাতখানি তিনি জোড়া বেঞ্চের উপর চাদরের আড়ালে গুঁজে দিলেন। যতদূর সম্ভব এরপর দারোগা বিভিন্ন মানুষের চোখের ভাষা পড়বার চেষ্টা করেন, এই

ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানা, নিশ্চয়ই কোন দারোগার তদন্তের সূত্র ধরার কোন আভাসই আভাসিত করে না—এইটা নেহাতই পাগলামী।

গোরাবাবুর সহসা মনে পড়ল, মাত্র তিন মাস আগে জিন্নাতন বানুর সঙ্গে ইমরানের বিয়ে হয়েছিল। নিলামপুরের দৌলত কাজীর মেয়ে জিনু। এই বিয়েতে দারোগাবাবুর নিমন্ত্রণ ছিল। তিনি আসতে পারেননি। মনে হচ্ছে এই বাড়িতেই জিনুর বিয়ে হয়েছে। অত্যন্ত ক্ষীণভাবে তাঁর ঘটনাটা মনে পড়ে। আবার হতে পারে, তিনি ভুল করছেন। জিনুর বিয়ে হয়ত অন্য কোথাও হয়েছে। সবই তাঁকে জানতে হবে। কিন্তু এতসব পুঞ্জিভূত লোকজন চারিধারে, তারা কেউই তো জিন্নাতনের আঁকা রঙিন নখের দিকে চেয়েও দেখছে না। স্বামীর হাতখানি কত আদরে হাতের মুঠোর মধ্যে তুলে নিয়েছিল জিন্নাতন। কত নিপুণ ভালবাসায় সে রঙ পরিয়েছিল স্বামীর নখে, পুরুষটি তখন জীবিত ছিল। কোলের উপর স্বামীর হাতখানা সমাদরে পড়ে রয়েছে, ঘাড় গুঁজে পালিশ মাখাচ্ছে এক সদ্যাবিবাহিতা। তার পায়ে আলতা, কপালে প্রকাণ্ড রাঙা-ভাঙা টিপ, নাকে ছলকানো নাকছাবি, স্বর্ণাভ চুড়ি, গায়ে সুরভিত যৌবন। কী যত্নে নরম আহ্লাদে মেয়েটি রঙ এঁকেছিল। বোকা মেয়ে জানে না, ওই রঙ অমন টাটকা হয়ে স্বামীর হাতে লেগে থাকবে, পালিশের রঙ উঠে চটে মুছে যাওয়ার আগেই সব শেষ হয়ে যাবে। জানতে ইচ্ছে করছে, সত্যিই তবে কখন কবে কেমন করে জিনু ওই রঙ লাগিয়েছিল। নির্বোধ অনুভূতিহীন এতগুলো গ্রাম্য মানুষও কি রঙ দেখে ছোট এক ফোঁটা নিঃশ্বাস ফেলে বলতে পারে না, দেখুন! আপনারা দেখুন! দেখুন মেজবাবু! তাজা, একদম টাটকা, কেমন টলটল করছে। মানুষের জীবন কেমন শস্তা হয়ে গিয়েছে।

কেউ বলল না। চার আনির দারোগার মনটা বড়ই ভার হয়ে উঠেছিল। মাথায় তিনি ক্যাপটা উঠিয়ে পরেছিলেন, সেটি ফের মাথা থেকে নামিয়ে নিলেন। যতদূর সম্ভব অগুনতি এই অন্ধ গ্রামবাসীর নিস্তরঙ্গ চোখমুখে চেয়ে চেয়ে দেখতে দেখতে মনে হল, প্রত্যেকের মুখ নিস্তরঙ্গ পাথরের মত ভাষাহীন।

কিন্তু ওই সব মুখে জমাটি আতংকের একটা বিহ্বল ছাপ থাকার কথা। হিন্দু মুসলমানের বিপাকে পড়ে বলি হয়েছে ইমরান। পনরদিন আগে দাঙ্গা হয়ে গিয়েছে। ইমরান বন্দুক উঁচিয়ে কাঁথাউড়ির মাহেশ্বদের তাড়া করেছিলেন, সব ওরা চাষীবাসী লোক। চারদিন হাজতে আটক ছিল ইমরান। ফলে গোপনে নিজেরই শোবার ঘরে নিচের তলায় গুম হয়েছে রাত্রিবেলা। কাছে বউ নিশ্চয়ই ছিল না। তাহলে সাক্ষ্য পাওয়া যেত। খুন যখন হয়, একা ছিল ইমরান। খুনের সময় মানুষ একা হয়। সবই ঠিক। যদি ঘটনা তাই হয় তাহলে এতগুলো মানুষের চোখের পাতায় কোন ভয়, কোন লুকানো ছায়া থাকা উচিত। গোরাবাবু সেই ছায়া দেখতে পাচ্ছেন না। চেয়ে দেখতে

দেখতে দারোগার চোখ আবার বারান্দার থামের কাছে মোড়ায় বসে থাকা বিধ্বস্ত দিশেহারা বৃদ্ধ হাজীর মুখের উপর গিয়ে থামল। উনি ঈষৎ নড়ে উঠলেন। তিনি চেয়ে দেখছিলেন দারোগাকে। উদাসীন এই দারোগার উপর নিশ্চয়ই তাঁর ভরসা নেই। নরম করে নিজের বুকের উপর আপন চোখদুটি নামিয়ে নিলেন শরিয়ত। স্পষ্ট নয়, তবে মনে হল এত শোকের চাপের ভিতরও দারোগার কাণ্ড দেখে হাজী সাহেব অদ্ভুত করে নিঃশব্দে হেসে ফেলেছেন।

মনে হওয়া নয়, স্পষ্টই হাসতে দেখলেন বৃদ্ধকে। বারান্দায় উঠে এসে সামনে দাঁড়াতেই শরিয়ত গোরাবাবুকে দেখে নিঃশব্দে হাসলেন বইকি! দারোগা মনে মনে তৈরি হয়েছিলেন। ওইভাবে নেলপালিশের হাত চাদরের আড়ালে ঢোকানো দেখে, বুদ্ধিমান মানুষ দারোগার ব্যাপার-স্যাপার দেখে হেসে ফেলে নিশ্চরই ভাববে, এ এক অপদার্থ দারোগা। ঠিক সেই ভঙ্গীতেই হাসলেন শরিয়ত। তবে দারোগা কথা শুরু করলেন বোকা শিক্ষকেরই মত, বললেন—আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন? হাজী সাহেব, বলুন! বিশ্বাস করেন? আমি বামুনের ছেলে? দারোগা। হাইস্কুলের মাস্টার ছিলাম। দশ বছর ছেলেমেয়ে পড়িয়েছি। যদি নিতান্তই ভুল না হয়, তাহলে বলব, ইমরানের স্ত্রী, আপনাম বউমা জিনু আমার ছাত্রী ছিল। আমার কাছে 'লজিক' পড়ত। আমি কি আপনার বিশ্বাসযোগ্য লোক? বলুন?

হাজী সাহেব গোরাবাবুব কথায় মৃদু নাড়া খেলেন নিজেরই মধ্যে। বাইরে সেই স্পর্শ দেখা যায় না তেমন। হাজী সাহেব ধীরে ধীরে আবার চোখ তুলে দারোগাকে দেখলেন। কথা বললেন না অনেকক্ষণ। ফের চোখ নামিয়ে নিলেন। কেন যেন অস্ফুট নিজেকেই শুনিয়ে বিড়বিড় করলেন—আপনার লজিকে আমার কী হবে?

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল সংক্ষেপে। তারপর গলা সামান্য তুলে বলে উঠলেন—পাগল!

সে-কথা কেউ শুনতে পেল না। ভাগ্যিস কেউ শুনতে পেল না। নইলে লজ্জায় পড়তে হয়। ভাবলেন দারোগা। তারপর সলজ্জভাবে শুধালেন—কিছু বলুন?

হাজী সাহেব স্বল্প মাথা নেড়ে কিছুই যে বলবেন না বোঝালেন। তার যেন কিছুই বলার নেই। কাকে কী বলবেন!

গোরাবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হাতের তালুতে দুই-তিনবার রুলের আঘাত করলেন। তারপর কোনদিকে ছুটে যাবেন ভেবে পেলেন না। বোকারই মত দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। চারপাশে উৎকট গুঞ্জন থামছে না। সহসা তিনি উত্তরের ঘরে দ্রুত ছুটে এসে ঢুকে পড়লেন।

এখানেই জিন্নাতনের কাছে বসেছিলেন চৈতালী। স্বামীকে দেখে চৈতালী খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। জিন্নাতন কোনমতে চোখ তুলে গোরাবাবুকে দেখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। জিন্নাতন বোধহয় তার লজিক পড়ানো মাষ্টার-মশাইকে সহসা চিনতে পারছিল না।

গোরাবাবু ঘাড় ঝুঁকিয়ে জিন্নাতনের কানের কাছে মুখ রেখে নরম করে শুধালেন—আমায় তুই চিনতে পারিস নে মা ?

এতই সহানুভূতিভরা সেই উচ্চারণ যে, মেয়েটি তার মাষ্টারমশাইয়ের মুখের দিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকতে থাকতে ভীষণ উচ্চকিত গলায়, 'মাষ্টারমশাই' বলে আর্তনাদ করে উঠল। তারপর, 'আমার কী হয়েছে দেখুন' বলেই হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল। জিন্নাতন এতক্ষণ এক ফোঁটা কাঁদতে পারেনি। প্রায় বোবা হয়ে গিয়েছিল। এখন ওর কান্নার আর কোন অবধি রইল না।

গোরাবাবু তখন জিন্নাতনের হাত ধরে টেনে নিয়ে বাইরে চলে এলেন। শুধালেন—কেমন করে এই খুন হয়েছে জিনু ? কখন ? কত রাতে ? কে বা কারা এসেছিল ?

পাশের বাড়ির মানুষগুলি কি শুনতে পায়নি ? দোতলায় জিনু কি ঘুমিয়ে ছিল ? হাজীসাহেব কোথায় ছিলেন ? মানুষকে কেটে ফেলার সময় নিশ্চয় আর্তনাদ করবে মানুষ ? কেউ জানল না ?

চৈতালী মুখ খুললেন। বললেন—আমি বেশ সাবধানে মোটামুটি খবর সংগ্রহ করেছি মেজবাবু। বলেই কিঞ্চিৎ থামলেন চৈতালি। তারপর তাঁর ধারণার কথা, সংগৃহীত তথ্যের পাঠ যে রকম হতে পারে তিনি তা বিবৃত করলেন—রাত্রে পাশের বাড়িতে একটি খাসি জবাই হয়। কুরবানীর জন্য পোষা খাসি, পোকায় ছুঁয়ে ছিল মস্ত খাসি। পোকায় ছুঁয়ে গেলে, বাঁচে না। ভীষণ গলা ফাটিয়ে চীৎকার করতে করতে খাসি মরে যায়। বাধ্য হয়ে বাড়ির লোক ওই খাসি মরবার আগেই জবাই (হত্যা বা বলি) করে দিয়েছিল। আশেপাশের বাড়িগুলো থেকে খাসির আর্তনাদ, লোকজনের গোলমাল শুনে অনেকেই ছুটে আসে। জিনুও দোতলা থেকে গোলমাল-চিৎকার শুনে ছুটে আসে। হাজীসাহেব মসজিদে মাঝরাতে নামাজ পড়ছিলেন। জিনুর শাশুড়ি নেই। মারা গেছেন। চাকর-বাকর যারা ছিল সবাই ছুটে গেছে পাশের বাড়ির উঠোনে। খাসির গলায় তখন ছোরা বাগিয়ে ধরা। অদ্ভুত একটা মুহূর্ত।

বলতে বলতে থেমে গেলেন চৈতালী। গলার স্বর ভারী হয়ে উঠল। বললেন, খাসি এবং মানুষ একই সঙ্গে জবাই হয়ে গেল। মানুষ আর পশুর চিৎকার মানুষ আলাদা করতে পারল না। জিনু বুঝতেও পারল না মাঝ রাত্তিরে তার স্বামী নিচের ঘরে খুন হচ্ছে। কারণ, ইমরান গতদিন দুপুরে

ওর এক ডাক্তার-বন্ধুর কাছে বেড়াতে গিয়েছিল। বাড়ি না-ফেরার কথা ছিল। কিন্তু বেচারি আসলে মরবে বলে কখন এসে বাড়িতে ঢুকেছে। ঢুকে দোতলায় না গিয়ে নিচের তলায় মোম জ্বালিয়ে কী সব লেখালেখি করছিল। পাশের বাড়ির চিৎকার শুনে দরজার দিকে এগিয়ে এসে হয়ত বাড়ির চাকর-বাকরদের নাম ধরে ডাকাডাকি করে। পাশের বাড়িতে কী ঘটছে জানতে চায়। কারো কোন সাড়া পায় না। দরজার কাছে আসামাত্র অন্ধকার থেকে এটা গুপ্তি আচমকা ওর বুকে গিয়ে ঢোকে। তখন বেচারি ঘরের মধ্যে পালিয়ে আসে। বুকে বেঁধানো গুপ্তি। ঠিক তার কিছুক্ষণ বাদে পিছন থেকে হেঁসোর কোপ গিয়ে কাঁধের জোড়ের উপর সজোরে কেটে বসে যায়। পাশের বাড়িতে তখন খাসির চিৎকার।...

চৈতালী বললেন—আমার ধারণা, দল বেঁধে এই খুন হয়নি। খুন করেছে একজন। একটি মানুষ মাথা ছিঁড়ে নামিয়ে দেবার পর, সেই মাথা কেন যে লুকিয়ে ফেলা হল, সেইটে কিছুতে বোঝা যাচেছ না!

—যাবে!

খুব সাহসভরে এতক্ষণ পর দারোগা বলে ওঠেন আশ্বস্ত ভঙ্গিমায়—নিশ্চয় যাবে। কেন যাবে না!

পঞ্চায়েত-প্রধান ভিড় ঠেলে চৈতালী আর গোরা মুখুজ্জের সামনে এগিয়ে এলেন। শুধালেন, এই খুন একজন ব্যক্তি করেছে? গুপ্তি আর হেঁসো একই লোক ব্যবহার করেছে পর পর? এটা অসম্ভব। দল বেঁধেই ওরা এসেছিল। ইমরান হিন্দুর হাতে খুন হয়েছে। একজনে এ-কাজ করতে পারে না।

এই বাড়ি রাজনীতির প্রধান আশ্রয়। পঞ্চায়েত-প্রধান এই বাড়িকে মান্য করে। শরিয়ত হাজী বামপন্থী মুসলমান। প্রধান সহসা কেমন যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে বললেন—আপনি কাঁথাউড়িকে প্রোটেকশন দিচেছন গোরাবাবু! আপনি কমিউন্যাল লোক। একজন খুন করেছে বলে একজনেরই ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে মাহেশ্বদের খালাস করতে চাইছেন। আপানার বিরুদ্ধে জনমত নির্বিশেষে নয়ানজুলির লোকেরা অভিযোগ করবে। এটা একটা পলিটিক্যাল মার্ডার। কেন আপনি বুঝছেন না ব্যাপারটা। আপনি চাকরি ছেড়ে দিন। নিরপেক্ষ হতে পারেন না, আপনি কেমন দারোগা? চুপ করে আছেন কেন? উত্তর দিন। আপনি মাহেশ্বদের কাছে ঘুষ খেয়েছেন। খাননি?

গোরা মুখার্জি প্রধানের কথা শুনতে শুনতে যথেষ্ট বিস্মিত হচ্ছিলেন। লোকটা সমস্ত কিছু গুলিয়ে দিতে চাইছে। মাথায় ইলেকশন ছাড়া এসব লোকের কিছুই থাকে না। ধর্ম আর সাম্প্রদায়িকতা এদের এখন আশ্রয়স্থল। উটপাখি যেমন বালিতে মুখ গোঁজে, হাতে লালঝাণ্ডা নিয়ে এরাও এখন ধর্মে মুখ গুঁজে সাম্প্রদায়িকতার বালিঝড় ওড়াচ্ছে। এই লোকটা ঘুঘু। ক্রমশ

মনে হচ্ছে, আততায়ী একজন। এটা 'দাঙ্গার ফলশ্রুতি না-ও হতে পারে। কিন্তু যদি দাঙ্গাই এই খুনের কারণ হয়, তাহলে দারোগার কী করা উচিত ?

প্রধান ঝেঁঝে উঠলেন—চুপ করে আছেন কেন, ঘুষ খাননি !

—না, একদম না। উনি কখনও ঘুষ দু'চোখে দেখেননি, বাজে কথা বলবেন না। উনি স্কুলের মাষ্টারমশাই ছিলেন।

চৈতালী তীব্র প্রতিবাদ করে উঠলেন ।

—তাহলে মাষ্টারি ছেড়ে এই লাইনে এলেন কেন দিদি ? রাজনীতির প্যাঁচ-পয়জার না জেনে গাঁ-মুল্লুকে কেন এলেন ! শুধোচ্ছি, স্বামীর হয়ে খুব তো ওকালতি করছেন, জানেন, একটা মানুষ কেন খুন হয় ?

প্রধানের হয়ে ভিড়ের মধ্যে একজন গজগজ করে উঠল। চৈতালী মোলায়েম করে সেই গজগজে ছেলেটির দিকে লক্ষ্য করে বললেন—আমরা ভাই কিছুই জানি না। এই এলাকায় আমরা নতুন মানুষ। আপনারাই বলুন, একজন মানুষ কেন খুন হয় ?

ছোকরা প্রধান হেঁকে উঠলেন—তবে কী ব্যক্তি-আক্রোশে এই ঘটনা ঘটেছে বলছেন ?

—না। তা-ও বলছি না। কেমন খুন সেটাও আমাদের কথা নয়। কে বা কারা খুন করল, আমরা কেবল সেটাই দেখব। খুনের রকমপ্রকৃতি ব্যাখ্যা করার জন্য আপনারাই তো রয়েছেন। দেশ চালাচ্ছেন আপনারা ! শুধু বলুন, খুন কেন হয় ? কথাই যখন উঠল।

বেশ খানিক গম্ভীর হয়ে চৈতালী দম নিয়ে বললেন—চিরাগ আলি ফকির এই গাঁয়ে খুন হয়ে মরেছে। সে-কথা আপনাদের মনে আছে ? নেই। ভুলে গেছেন আপনারা।

চিরাগ আলির কথা উঠতেই ভিড়ের গুঞ্জন কেমন স্তিমিত হতে হতে প্রায় নিঃশব্দ হয়ে ওঠে। চৈতালী বলেন—কিন্তু হাজী সাহেবের ছোট বোন, ওই পিসিমা দেখুন ! উনি কিন্তু এইরকম মুণ্ডু হারানো খুনের কথা মনে রেখেছেন। উনিই বললেন, খুনের পর বেসরা ওই ফকিরের মাথা পাওয়া যায়নি। আঁকা ফকিরের বাবা কেন খুন হয়েছিল, তার ধড় ছিল, মুণ্ডু কেন বেপাত্তা হয়েছিল, তার জবাব আপনারা দিন, আমি খুনিকে বার করে দিচ্ছি। আর বলুন, ফকিরের ছেলে ফকির, তাকে আপনারা ডাকাত বলে ডাকেন কেন ?

গোরাবাবু একেবারে চমকে উঠলেন। সবাই কিছুক্ষণ কোন কথাই বলতে পারল না। পিসিমা উঠে এলেন। হাজীসাহেব সোজা মোড়া ছেড়ে উঠে এসেছেন। বারান্দায় এখন মানুষের চাপ বাড়ছে। পিসিমা এই গাঁয়েরই মেয়ে, গাঁয়েরই বউ। ও-পাড়ায় থাকেন। ছেলেপুলের পরিণত মা।

বললেন—কিসে আর কিসে, তামা আর শিশে। ওই খুনের সাথে এই খুনকে মেলাও কেন জননী ? সেডা একটা খুন বটে। মুন্ডু ছেলো নে, সে-ও ঠিক। কিন্তু তার বেত্তান্ত আলাদা। আমার ইমরানের মাথা নাই, কুন ঠাঁইয়ে লুকিয়ে রাখা হল, সেই কথা মনে করে ওই বেত্তান্ত তোমাকে বলেছি মা। কথায় কথা উঠে আসে। তার বেশি কিছু না। চেরাগ ফকির তো রোকন মানেনি।

রোকন কথাটা দারোগা বুঝতে পারছেন না দেখে পিসি বললেন—নামাজ রোজা হজ্জ জাকাত কালমা এই পাঁচ রোকন। খুঁটি। তার ওপরে ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে।

হিন্দুজনকে আপন ধর্মের কথা শোনাতে পেরে তলে তলে আহ্লাদবোধ করছেন পিসি, সর্বোপরি পুলিশের লোক কি না! পিসি বললেন—সেই রোকন সে মান্য করেনি। ছাস্তর ( শাস্ত্র ) মানত না। বেসরা বাউল। তার কথা ধরো কেনে। মুখে দাড়ি গোঁফ রেখে গান গাইত। সেডা এক ভেন্ন কিসিমের খুন মা। আঁকার মা ছেল বোষ্টুমি। কথায় কথা উঠে আসে। তার বেশি কিছু না।

আমার ইমরানের মাথা, অমুন চোখ নাক সুরত কুতায় ফেলে দিলে কাফেররা, ঢুঁড়ে দে মা। আমি দেখব জননী।

পিসিমা গলায় ডুকরে কাঁদবার চেষ্টা করলেন। কান্নার ভেতরে কেমন এক কষ্টের আঁশ লেগে রইল।

সহসা ভিড়ের বাধা ঠেলে হাজী শরিয়ত তাঁর বোনের কাছে এগিয়ে এলেন। কড়া গলায় ধমক দিলেন—তোকে এইসব কাসুন্দি কে গাইতে বললে আছমা ? কথা কইতে জানিস নে, থানার দারোগার সঙ্গে কুটুম্বিতে করবার কী দরকার ছিল ? নেমে যা। ছেলের জন্যে খুব কষ্ট হয়, বাড়ি গিয়ে কাঁদগে। এত ইনুনিবিনুনি কিসের! যা চলে যা। ছেলে খুন হয়েছে, সেকথা থাকল চুলোয়, এখন উনারা কেচ্ছা ফেঁদে বসলেন। ডাকাত না ফকির তাই নিয়ে চলল বাহাস। হিন্দু না মুসলমান, সেটা কোন ধর্তব্যই নয়। তাজ্জব!

ভাইয়ের কথায় আছমাপিসি কান্না থামিয়ে হতভম্বের মতন বাইরে বেরিয়ে চলে গেলেন। হাজীসাহেব মেজবাবুকে বললেন—আপনি বড় অযোগ্য লোক মেজবাবু! মানুষের দুঃখ কষ্ট কিছু না, তার কেচ্ছা শুনেই আপনার আনন্দ। মাষ্টার ছিলেন তো!

হাজীসাহেবের কথায় সমস্ত ভিড় থকথক করে হেসে উঠল। ছোকরা প্রধান কেরামত, ধুতির আঁচল হাওয়ায় ঝেড়ে পকেটে ঢুকিয়ে বাংলা সিনেমার পুরনো বিকাশ রায়ের মতন অন্যদিকে হনহনিয়ে চলে গিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। মুখে শুধু একবার তাচ্ছিল্যের 'হুঁ!' করে।

গোরা মুখুজ্জে চৈতালীসহ বাইরের বৈঠকখানায় আসেন। হাজীসাহেব

কী মনে করে ঘরের ভিতর দিয়ে বৈঠকখানায় এসে চেয়ারে বসেছেন। সামনের চেয়ারে বসে পড়েন মেজবাবু। বলেন—কেচ্ছাটা একটু খোলসা করবেন হাজী সাহেব? রঙের খানিকটা উঁকি দিচ্ছে, বুঝলেন! সবটুকু চেনা যাচ্ছে না। ওই কেচ্ছা শুনেই এইবেলা আমার 'ডিউটি' শেষ করব। মাষ্টার ছিলাম তো!

দারোগার এ ছিল পাল্টা জবাব। হাজী সাহেব ফ্যাকাসে করে হাসলেন। বললেন—রাগ করবেন না মেজবাবু। মেয়েমানুষের বুদ্ধি, কোথায় কী বলতে হয় জানে না। চেরাগ ডাকাতের কথা কী শুনবেন? বড় পুরনো কথা। দেশের মানুষ সবাই জানে।

বলে হাজী সাহেব দাড়িতে উপর থেকে নিচের দিকে হাত ফেরালেন। বললেন—বুকের মধ্যে কষ্ট হচ্ছে মেজবাবু! এখন ওইসব কথা বলা যায়? এই অবস্থায় আপনি গল্প শুনতে চাইছেন?

গোরাবাবু বললেন—হ্যাঁ। গল্পই শুনব। আপনাকে বলতেই হবে। যদি না বলতে চান···

--না না। বলতে চাইব না কেন। তবে সে ভারি কেচ্ছার কথা। এই সময় কি সেই কথা মুখে আনা যায়! আপনি তদন্ত করতে এসেছেন, তদন্ত করুন।

চৈতালী বললেন, তার আগে, কেচ্ছাটাই আমাদের শোনা দরকার! চেরাগ খুব ভাল গান করতে পারত! পারত না?

শরিয়ত বললেন—হ্যাঁ, পারত বইকি! আপনারা এত করে বলছেন, তখন ওর গানের একটা নমুনা শোনাই। ছেলের লাশ পড়ে আছে উঠোনে, আর এভাবে আপনারা জেরা করছেন। পাপ তো কম করিনি।

—চেরাগ কী পাপ করেছিল যে খুন হল? দারোগার প্রশ্ন।

হাজী বললেন--এভাবে ধমকালে হবে না মেজবাবু। আগে চেরাগের পরিচয় শুনুন।

একটু থেমে শরিয়ত বললেন—দম পাচ্ছি না। তবু আপনি জেদ করছেন। বলছেন বটে ফকির, কিন্তু ওর সব সাকরেদ ছিল চোর আর ডাকাত।

সেইজন্যেই এত কৌতূহল। আপনি দয়া করে বলুন! ঈষৎ নরম করেন গলা, দারোগা বুঝতে পারেন, হাজীকে ধমকালে কাজ হবে না। অত্যন্ত শোকতাপের মুহূর্তে মানুষ ভুলবশত সত্য বলে ফেলে।

শাহু ডাকাত নাম শুনেছেন? ওর ওই তোমোহনীর ভিটেয় আড্ডা বসত। শাহুকে ওখানে সিদ্ধি টানতে দেখেছি। ফকিরের আখড়ায় ডাকাত দেখে দেশের লোকের তরাস লাগে কি না বলুন? চেরাগ নাকি ডাকাত বশের বিদ্যে জানত। কে কার বশ হয়েছিল বলতে পারব না। হিন্দু মুসলমান সব একপাতে খেত

ভিটেয়—সব ভিক্ষের ভোগ। বলত কি না এ হল মাধুকরীর ভোগ। এটা দেশের পাঁচজনের পক্ষে বড্ড যাতনার কথা। হয় কি না বলুন!

দারোগা বুঝতে পারলেন না, একজন বাউল তো মাধুকরীই করবে, শাহু ডাকাত যদি তার আখড়ায় কখনও এসেই থাকে, সেই ঘটনায় চেরাগ কেন ডাকাত হয়, কিছুই অতএব বোধগম্য নয়। মাধুকরী করায় একটা নিরীহ অস্তিত্ব সমাজ-পণ্ডকের যাতনার কারণ হয় কী করে? তথাপি দারোগা বললেন—ঠিকই তো!

শরিয়ত উৎসাহিত হয়ে বললেন—বউ ছিল এক বোষ্টুমি। গলা ছিল ভয়ানক সুরেলা। ওর গলাতেই আমরা শুনেছি ঃ

> হজ্ব করিলে যদি যেত গুনা
> মক্কায় জন্মিয়া কেউ পাপী হত না।

—এই সেই চেরাগ আলির গান? শুধালেন গোরাবাবু।

হাজী সাহেব বললেন—সহ্য হয় বলুন? দেশের লোক ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। নামাজ রোজার বিরুদ্ধে মস্ত মস্ত গান বেঁধেছিল। হিন্দুকে হিন্দু থাকতে দেয়নি। মুসলমানকে মুসলমান। চেরাগের গুষ্টি ছিল নারী-ভজার দল। সম্প্রদায়ের নাম শুনে পিত্তি জ্বালা করে। কুবির গোঁসাইয়ের গান ছিল ওর মুখশুদ্ধির মৌরি। নমুনা শোনেন—

> একের সৃষ্টি সব নারি পাকড়াতে
> আল্লা আলজিহ্বায় থাকেন
> আপন সুখে
> কৃষ্ণ থাকেন টাকরাতে।।

হাজীসাহেব আফসোসের সুরে বললেন—যার ধম্মে আল্লা আর কৃষ্ণের সহবত সমান। কোথায় কেষ্ট আর কোথায় খুদা! এই করে মিলমিশ করতে চাইলে সমাজ রছুল কিতাব কুরান কোথায় ভেসে যায় বলুন! ওকে মরতে তো হবেই।

গোরা মুখার্জি এই বাংলার মাটির উপরিভাগ ছাড়িয়ে এক গভীর তলদেশে নামতে লাগলেন। এ এক গুহ্যগোপন নিদানের দেশ ভঙ্গবঙ্গের পৃথিবী। দারোগার দিকে স্পষ্ট করে চোখ তুললেন হাজীসাহেব। বললেন—তারপর বোষ্টুমির গায়ে ছিল আতস। রূপের বাহারি ঝলক দেখে ছেলে-ছোকরার দল ওর থানে গিয়ে জমা হয়েছিল। নারী ভজনা করত। বাধ্য হয়ে দেশের লোক ওকে খুন করে।

বাউল ধর্মে নারী হল মূল আকর্ষণ। কেন্দ্রমূল। রূপের আগুনে ফকিরের ধর্ম আলো পায়। সে এক গভীর তত্ত্বীজের গোপন কারণ। কী

করে ওরা ? নারীকে খায়। নারী ওদের খায়। এই বিপাক আর বিদ্রোহ সমাজকে ধাঁধায় ফেলেছে। সহ্য তো হয় না, হবে না।

ভাবলেন দারোগাবাবু। তাঁর চোখের সামনে উম্মোচিত হতে থাকল এক অন্য জীবনের পট। মানুষ খুন হওয়ার এক ভিন্ন ইতিবৃত্ত।

—অবশ্য সেটা পরের কথা। বললেন শরিয়ত।

—কোন্ কথা ?

—খুন হওয়ার কথা। লোকটা এসেছিল কুষ্ঠিয়া মেহেরপুর থেকে। দলছুট ফকির !

—তার আগের কী ঘটনা ? খুন হওয়ার আগের ঘটনা বলুন !

—তার আগে দেশের লোক ওর ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। ভয়ে চেরাগ তার বোষ্টুমিকে রেখে পালিয়ে যায়। সেই বোষ্টুমিকে আমি আশ্রয় দিই।

কথিত এ নাটক যত সহজে বলা হয়, দারোগার মনে হল, রূপবতী নারী তত সহজে নিরাশ্রয় হয়নি। আশ্রয় দিই বলার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, নারী তার কেন্দ্রমূল থেকে উৎপাটিত হল।

—তারপর ? কৌতুহলিত প্রশ্ন। তারপর বলুন ?

হাজীসাহেব বললেন—মৃত্যু অবধি ওই মেয়ে আমার বাড়িতেই ঝি-গিরি করেছে। অবশ্যি রাতবিরেতে লুকিয়ে এসে চেরাগ ওকে দেখা দিয়ে যেত। সেটা জানাজানি হয়ে গেলে আমার ওপর ভয়ানক চাপ পড়েছিল। মজলিসে একসময় আমার মুখ ছিল না। আমায় একবার দেশের লোক বোষ্টুমিকে রাখার জন্য একঘরে করার চেষ্টা করেছিল। লজ্জা করব না, আপনার সামনে।

বলেই লজ্জা পান শরিয়ত। মানুষের রূপবিহার কী বিষম, যৌনতা আর ধর্মের কী তীব্র দাহ ! বোষ্টুমির জন্য শরিয়ত তৈরি করেছিলেন এক চোরা পিছল পথ। গোরাবাবুর বারংবার মনে হতে লাগল।

হাজী বললেন—সত্য কথা, ওই হাল দেখে আমি বোষ্টুমিকে শাদী করতেও চেয়েছিলাম।

—শাদী হয়েছিল ?

—না। কী করে হবে দারোগাবাবু ! বোষ্টুমি রাজি হল না। বলল, ফকিরের ধর্ম নষ্ট করে গেরস্তি করার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া ভাল। ফলে, ওই ঝি-গিরি করেই বিন্দি চলে গেল। না। তা-ও না।

—তবে ? চেরাগ খুন হল কখন ? প্রশ্ন করলেন মুখুজ্জে।

—কিছু আগে আর পরে দু'জনই খুন হয়েছিল। বলতে বলতে থেমে গেলেন শরিয়ত হাজীসাহেব। সহসা ওঁর মধ্যে কেমন এক বিহ্বলতার উদয় হল। কী দৃশ্য তাঁর চোখে ভাসছে কে জানে।

—না। বিন্দি খুন হয়নি। ওর ওপর আমারই চাকর-বাকর বলাৎকার করে মেরে ফেলে। লজ্জার কথা মেজবাবু। মাঠের মধ্যে পড়েছিল মেয়েটা। কখন রাতে ছেলে-ছোকরার দল ওকে তুলে নিয়ে যায়, টেরও পাইনি। আমি ওর মৃত্যুতে খুব কেঁদেছিলাম মেজবাবু। আজও কাঁদি। লোকে ভাবে, সেটা খুব কলঙ্কের কথা।

—কলঙ্ক !

—জী কলঙ্ক। তাই একথা আমি তুলতে চাইনি।

মেজবাবু বললেন—আপনি কিন্তু এখনও চেরাগ ফকিরের মৃত্যুর ঘটনা বললেন না।

গোরা মুখুজ্জে সহসা উঠে দাঁড়ালেন। চৈতালীকে উদ্দেশ্য করে বললেন—চলো। আমরা যাই। আমার তদন্ত শেষ হয়েছে।

চৈতালী বললেন—এখনও একটু বাকি আছে মাষ্টারমশাই। চেরাগ ফকিরের মৃতদেহ কোথায় পড়েছিল হাজীসাহেব ? আপনার মনে আছে ?

—মুণ্ডু ছড়ানো ধড়খানার কথা বলছেন ?

—হ্যাঁ সেটাই বা কোথায় ছিল ? চৈতালীর প্রশ্ন।

হাজীসাহেব ফের চুপ করে থেকে খুব নিচু গলায় বললেন—যেখানে ওর কবর আছে, ওখানে। ওখানেই ওর লাশ পাওয়া গিয়েছিল ! ওখানেই মাটি চাপিয়ে কবর দেওয়া হয়েছে।

—সেটা কোথায় ? চৈতালী জানতে চান।

—ফের বিন্দিকেও আমরা ওইখানেই কবর দিয়েছি। স্বামী, স্ত্রী, পুরুষ আর প্রকৃতি পাশাপাশি আছে। সেটা ওই কপির আবাদ হয় যে জমিনে, তারই এক পাশে আছে। ওটা তোমোহনীতে মেজবাবু। ঘটনা সব মনে নাই।

ওঁরা তোমোহনী এলেন। কপির আবাদ হয়েছে। শিশিরে টসটস করছে বাঁধাকপির মুণ্ডু। পশ্চিমকোণে দুটি পাশাপাশি কবর। সেখান থেকে এদিকে একটা উ'চু ভিটে চোখে পড়ে। আঁকার বাড়ি। ঘরে একটি মাত্র প্রাণী। পাটকাঠির বেড়া ঘেরা বাড়ি। খড়ে আর তালপাতায় ছাওরা চালা। আঁকার বোন বেরিয়ে এল। চৈতালী এগিয়ে গেলেন। থমকে দাঁড়ালেন চৈতালী। আঁকার বোন লজ্জা পেয়ে ঘরে ঢুকে যাচ্ছিল।

চৈতালী শুধালেন—কোথায় বিয়ে হয়েছে তোমার ?

মেয়েটি চুপ করে থেকে খুব ক্ষীণ গলায় বলল—শাদী হয়নি।

চৈতালী বললেন—তোমার পেটে যে বাচ্চা দেখছি ? কার বাচ্চা !

চৈতালীর চোখে সব ধরা পড়ে গিয়েছিল। বললেন—সত্য কথা বলবে। নইলে ভয়ানক বিপদ হবে। আঁকাকে রক্ষা করতে চাও তো মিছে বলো না।

মেয়েটির সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে গেল। ঠোঁট কাঁপতে লাগল। মুখ শুকিয়ে গেল। বেড়ার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে মেয়েটি বলল—সেকথা বলতে মানা দিদি! যার বাচ্চা সে তো আর নাই। উনি আমাকে বলতে মানা করে গেছে।

বলেই মেয়েটি খুঁটি ধরে ডুকরে উঠল অস্ফুট। মেজবাবু স্তম্ভিত দাঁড়িয়ে থাকার পর কপির ভুঁইয়ে নামলেন। সেখানেই ইমরানের মুণ্ডু বহে এনেছে। ধড় আর মুণ্ডু আলাদা করার পর ত্রস্ত বিহ্বল আততায়ী তাই করবে। পাগলের মত সে প্রথমে মুণ্ডু হাতে করে ছুটবে। তারপর মনে পড়বে, ধড়খানা যে ঘরের মধ্যে পড়ে রইল। তারপর আবার সে ছুটবে ধড় আনতে। এমন কি মুণ্ডু বহে আনার পর কবরের মাটি খুঁড়তে শুরু করবে। হঠাৎ মনে পড়বে, আহা! ধড়খানা যে আনা হয়নি। কবর খোঁড়া ফেলে রেখে সে আবার ছুটবে বাড়ির দিকে। এই করতে করতে রাত পুইয়ে আসতে থাকবে।

কবর কিঞ্চিৎ খোঁড়াও হয়েছিল অতএব।

কপি সাজানো হল ঢাকিতে, অর্থাৎ প্রকাণ্ড ডালায়। তার সঙ্গে ইমরানের কপি-সাইজ মাথা দেওয়া হল।

আকছার মেজবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে শুধাল—এই ঢাকি কুথায় যাবে মেজবাবু?

—থানায়।

—কে লিয়ে যাবে?

—তুই।

আঁকা চুপ করে রইল। হাসল একটু।

গোরা মুখুজ্জে বললেন—দ্যাখ আঁকা। কথা শোন। আমার তোর কথা না। সব ডাকাতেই বলে, মরার মাথা কোন ডাকাত, যত বড় ডাকাতই হোক, এক মাইলের বেশি বইতে পারে না।

—কেনে বাবু!

—পারে না। আবার কেন! পারে না। ভয় পায় নাকি ভারী লাগে কে জানে! যে বহে সেই জানে।

—কুথায় শুনলেন আপনি?

—ডাকাতদের মুখেই শুনেছি।

বলেই গৌরাঙ্গ দারোগা গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, যাই হোক। থানা হল চার মাইল। এই চার মাইল পথ তোকে এই মাথা পেঁছে দিতে হবে। যদি পারো তবেই বুঝব তুমি বাপের বেটা। ঢাকিতে দিলাম, সবাই ভাববে, কপি নিয়ে যাচ্ছ। তালে তালে হেঁটে চলে যাবে। ফাঁকা পথ। আমি চললাম।

বুলেট বাইক আঁকার চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। আকছার ফাঁকা মাথায় সবার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখতে দেখতে হাঁটা দিল সেই এক নিম শীতের দুপুরে।

বলল, দ্যাক্ মা! চেয়ে দ্যাখ! তোর জাতহারা সন্তান মা গো, ডাকাত হয়েছে! তুই এই ভু-ভাগে শুয়েছিলি মা! তোর মাথায় ছিল সিঁন্দুর আর নিহর (শিশির)। বড্ড সুন্দরী ছিলি মা তুই। শরিয়ত হাজী তোকে বারাণী (রক্ষিতা) করেছে মা। বাপজানকে ভোগা দিয়ে, ঘর পুড়িয়ে দ্যাশ ছাড়া করেছে মা গো! সাহস দে মা। ফকির তুমি দোয়া করো বাবা। আমাকে ডাকাত করে দাও। আমি কত একলা মা গো। সঙ্গী নাই, সাথী নাই আমার। এই পথে তুমি দেহতত্ত্ব গেয়েছ বাবা। আপন স্ত্রী তুমার পর হয়ে বন্দী ছিল শরিয়তের খাঁচায়। বাবা তুমি মুক্ত কর্রো এই পাপীকে। আমার গলায় গান দাও বাবা। আমি ফকির হই। বুনডারে কে দেখবে জননী? তাকেও লোকে বারাণী করতে চাইলে বাপজান!

বলতে বলতে দুঁমাইল পথ এল আঁকা ডাকাত। তারপর পাগল হয়ে গেল। বলল—ইমরান ভাই, তুমার হাতে আমি লিলপালিশের ছাপ দেখেছি। তাজা রঙ দিয়েছিল জিনু ভাবী! হায়! কী করব গো!

বলতে বলতে ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়ল আঁকা ডাকাত। ঝাপসা চোখে দেখতে পেল, পৃথিবী ভয়ানক অন্ধকার। সেই অন্ধকারে চেরাগ ফকির শরিয়তের বৈঠকে শুয়ে আছে। ধড় আছে কেবল। গোঁফ দাড়ির মারফতী মুণ্ডু নেই। একতারা আর ডুগি ভুতলে গড়াচ্ছে।

হাহা করে হেসে উঠল আঁকা। মাথার বোঝা বইতে পারল না। ফেলে দিল। এবং তার হাসির বেগ ক্রমশ বেড়েই চলল। আকছার তখন সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেল।

— — —

# নিশি-কাজল

আদালতে যে দু'জন লোক কোরাণ তুলে দেওয়ার জন্য মামলা ক'রেছিল, তার সাকিন-হদিশ কি কিছু পাওয়া গেল মহিম ? শুনলাম তদন্ত হবে ?

মহিম উত্তর করল খুব ছোট। জানি না।

শরিয়ত নিয়ে যারা লড়ছে, তারা কারা ? এই দেশেরই মুসলমান, নাকি অন্য কোথা থেকে এসেছে ?

মহিম বলল—জানি না। গম্ভীর জবাব।

রাস্তায় সকালবেলা তিনজন গেরুয়া-পরা নেড়া মোহান্ত ঘুরছিল দেখেছিস ? কোথাকার ওরা ?

—তাও জানি না।

—চকচকে ট্যাক্সি করে হ্যাণ্ডবিল আর বই ছড়াচ্ছিল, ট্যাক্সির ছাতে মাইকের ছোট চোঙে কী সব গজগজ করছিল, শুনেছিস ?

— না। বললাম তো! মহিম ঈষৎ বিরক্ত হয়।

— আমাদের দেওয়ালে সকাল বেলায় দুটো নতুন পোস্টার সাঁটা হয়েছে, তোরা লিখেছিস ?

—কৈ, না তো! আমরা কোনো পোস্টার হ্যাঁ, হতে পারে। কী লেখা ছিল ?

—মুখস্থ করিনি।

- তুমি কি আমাদের পোস্টার মুখস্থ কর নাকি পিসি ?

মহিম এতক্ষণে হেসে ফেললে। সারদা পিসি বললেন—তা করি কিছুটা। সাইনবোর্ডে আর পোস্টারে বানান ভুল খুব চোখে লাগে। তোরা 'সম্প্রীতি'

বানান লিখেছিস ঋ-কার দিয়ে 'সম্পৃতি', আমি অনেকক্ষণ ব্যাপারটা ধরতেই পারি না। প্রগতি লিখেছিস দীর্ঘ-ঈ-কার প্রগতী। কী সব লেখা, বাবা। পড়তে পড়তে মাথা ধরে যায়। হাতিয়ারও তাই, দীর্ঘ-ঈ-কার দিয়ে হাতিয়ারের কত ধার প্রকাশ করা হয়। তোরা উপরের নেতা, তোরা তো লিখবি না, সম্মান খোয়া যাবে, লিখবে নিচের সব মুখ্যুরা। অনেকে বোধহয় দেওয়াল লিখে বর্ণ-পরিচয় শেখে। তাই না?

শুনতে শুনতে মহিমের মুখ কালো হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ মহিম পোস্টার প্রসঙ্গ চাপা দেওয়ার জন্য বলল–তুমি তারকেশ্বর যাবে? শিবকালীতলায় একটা দোকানে বাহক কিনতে পাওয়া যাচ্ছে। বেশ প্লাসটিকের ফুল, স্টীলের ঘুঙুর দিয়ে সাজানো, এনে দোব? কপালে তিলক কেটে 'ভোলে বাবা পার করে গা' বলে দলের সাথে চলে যাও। রাধার ঘাট থেকে একদল যাচ্ছে, মুকুন্দ বলছিল। যাবে নাকি?

মহিম হাতের গ্রাস থামিয়ে চোখ তুলে সম্মুখে বসে থাকা পাখায় মাছি-তাড়ানো পিসির দিকে চাইল। মাথার উপর ফ্যান বন্ধ। মহিম দেখল, পিসির মুখ সহসা কেমন করুণভাবে শক্ত হয়ে যাচ্ছে, পিসি কথা বলছেন না। ঠোঁট দুটি কিসের চাপা আবেগে খুব মৃদু কাঁপছে। হাতের পাখা থেমে গিয়েছে। চোখের কোণা ধীরে ধীরে অশ্রুর মৃদুতায় চমকাচ্ছে স্বল্প স্বল্প।

পিসি গলার খাদে কথা বললেন—আমায় তুই ঠাট্টা করছিস মহিম? আমি কি বাহক কাঁধে তারকেশ্বর যেতে চেয়েছি কখনও? দোষ ধরলেই তোদের মাথা গরম হয়ে যায়।

মহিম হাতের গ্রাস থালায় নামিয়ে রেখে লজ্জিত হয়ে বলল—না না। তা নয় পিসি। আমি তোমায় ঠাট্টা করিনি। মিছে রাগ করছ। তুমি তো সত্যিই তারকেশ্বর যেতে চেয়েছিলে। চাও নি?

পিসি বললেন—হ্যাঁ চেয়েছিলাম। কিন্তু বাহক কাঁধে করে যাব, এ-কথা তোর মনে এল কেন? আমি কেন যেতে চেয়েছি, তুমি কমিউনিস্ট বলেই বুঝতে পারনি। এ-দেশের কমিউনিস্টরা এই দেশটাকেই কখনও বোঝেনি। আমায় তুই কী করে বুঝবি মহিম?

ঠক্ করে শব্দ করে পিসি হাত-পাখা মেঝেয় ফেলে উঠে পড়লেন। তারপর ধীরে ধীরে রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। মহিমের সহসা বুকের মধ্যে এক আশ্চর্য কষ্ট শুরু হল। পিসি বিধবা নয়। কিন্তু স্বামী-হারা। বিয়ের দু'বছর পর স্বামীকে হারিয়েছেন। স্বামী তাঁকে ছেড়ে হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেলেন, বহু তীর্থ, বহু মঠ খুঁজেও পাওয়া যায়নি। সন্ন্যাসী হয়েছেন বলে খবর আসত উড়ো উড়ো, কখনও কথিত ঠিকানায় পেঁছে ভদ্রলোককে পাওয়া যেত না। শোনা যেত, তিনি হেথায় ছিলেন বটে, কিন্তু দু'দিন আগে

কোথায় চলে গিয়েছেন। তারপর আবার খবর আসত। মহিমের বাবা সারদাকে সাথে নিয়ে নির্দিষ্ট ঠিকানায় যেতেন ফের। হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হো'ত। এইভাবে নিরবধি দীর্ঘকাল খুঁজে ফেরা হয়েছে, সঠিক সন্ধান মেলেনি। কোথাও তিনি আছেন, আবার কোথাও তিনি নেই। আশ্চর্য এক ধাঁধার মতো সেই অস্তিত্ব। পিসি তারকেশ্বর যেতে চেয়েছিলেন, নিভে আসা ক্ষীণ প্রত্যাশার কারণে, হয়ত সেখানেই আছেন সেই বিবাগী। কিন্তু পিসি নিজেই একদিন সিদ্ধান্ত করলেন, তারকেশ্বর যাবেন না। অতএব সত্যিই তো ভোলে বাবার স্লোগান-গুঞ্জন, ফুলেল বাহক আর ঘুঙুর নিক্কণ পিসির অনুসন্ধেয় অস্তিত্বের কেউ নয়। ছিঃ! অতএব ছিঃ! ভাবতে ভাবতে মহিমের মন ক্রমশঃ বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। মহিমের আর ভালো করে খাওয়া হলো না। মহিম পাত ছেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। মুখ হাত ধুয়ে নিজের ঘরে এসে তোয়ালেয় মুখ মুছে, মুখে চাট্টি মৌরি ফেলে সিগারেট ধরাল। জানালার কাছে সরে এসে পিসির তুলসীমঞ্চের দিকে চাইল। গাছটা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছে। কলেজে সে সাহিত্যের অনার্স নিয়ে পড়েছে। এখন তার চোখে তুলসী হয়ে উঠল অমোঘ এক প্রতীক, যা কখনও মনে এমন করে বাজেনি। আমায় তুই কী করে বুঝবি মহিম? কথাটা বুকের মধ্যে পাখির মতো ঝাপটাচ্ছে। ঘুঘুর মতো ঠুকে ঠুকে ডাকছে। গাছটা শুকিয়ে যাচ্ছে। তুলসী যখন শুকিয়ে যায়, তার পাতার ম্লানিমা, নেতানো ভীরুতা কেমন হোতে পারে, মহিমের চোখে স্পষ্ট হচ্ছিল। পিসি মহিমকে অনুরোধ করে কিছুদিন থেকে প্রত্যহই বলছিলেন—মধুরকুলের আকুল সরদারকে খবর দিতে মাটির জন্য। মাটি আনবে মধুরকুলের আকুল। পিসি অন্য মাটি দেবেন না। গাছটি নাকি মধুরকুলের ঘোড়াপীরের আস্তানা থেকে ওপড়ানো। তুলসী হল নরম গাছ, আপন মাটি ছাড়া নেয় না। এই আপন-মাটি, পর-মাটি এই গ্রাম্যতা, মহিমের সহ্য হয় না। মহিম আকুলকে খবর দেবার কোনো তাগিদই মনে নেয় নি। অগ্রাহ্য করেছে। তাছাড়া পিসি ঐ মাটির অন্য কেত্তনও গেয়েছেন। পুলিনের কষার ধাত। পুলিন হলেন মহিমের বাবা। পিসি বললেন—মাটির উনুনে ভাত রেঁধে খেলে পুলিনের কাঠিন্য কমবে। আকুলকে বলবি, মাটি যেন একটু বেশি করে নিয়ে আসে।... মহিম গতকাল রেগে গিয়ে বলেছিল—আকুল তো চোর। চোরের চুরি-করা মাটিতে তোমার গাছ বাঁচবে, নাকি বাবার কষা ভালো হবে? যত্তসব আঁকাড়া সংস্কার। কেন যে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল ভেবে পাই না। কোথাকার ঘোড়াপীর, কোথাকার একটা চোর, এইসব ধ্যান করতে কী আনন্দ পাও আজও বুঝলাম না।

পিসি গতকালও দুঃখ পেয়েছেন। রেগে গিয়ে বলেছিলেন—মাটির মহিমে কী বুঝবি। মাটি চিনতে তোদের আরো সময় লাগবে।

গতকালের কথা আর আজকের কথা একই চালে স্ফুরিত, একই মর্মে বাঁধা। স্পষ্ট হচ্ছিল মহিমের কাছে। আবার বড় রহস্য হয়ে যাচ্ছিল সাথে সাথে।

পিসি বলেছিলেন—আকুল চোর। কিন্তু আমাদের কালের চোর তো! সেই চোরেরও একটা স্ট্যাণ্ডার্ড ছিল। তার কাছে যা আছে, তোদের তা নেই।

মহিম ক্ষেপে গিয়ে বলেছিল—চোরের কাছে অমৃতও যদি থাকে জানবে সেটাও সে চুরি করেছে। তুমি চোরের সাফাই গাও দেখে আশ্চর্য লাগে।

আঘাতটা খুব বেশি হলো বলে পিসি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর পাতলা হেসে বললেন—হ্যাঁ বাবা। আশ্চর্য আমারো লাগে। অত ভালো স্বপ্নাদ্য জিনিশ একটা চোর পেল কী করে?

—স্বপ্নাদ্য? সেটা আবার কী? অবাক হয়ে মহিম পিসির মুখে চাইল।

—হ্যাঁ। স্বপ্নের দান। আকুলের বাবা পরান ছেলেকে দিয়ে গেছে। নিশি-কাজল নাম। পিলুর মা সাঁঝ-কানা। আকুলের ঐ কাজল চোখে পরল এক সপ্তা। দিব্যি এখন দেখতে পাচ্ছে। চোরের জিনিশ। কিন্তু তারই মধ্যে যে মায়া লুকনো আছে, তার খোঁজ যুক্তি-তক্কে মেলে না। জীবনটা তো শুধু যুক্তি-তক্কে চলে না মহিম। তার অন্য মহিমেও (মহিমা) আছে। ঐ নিশি-কাজলের গল্পটা ভারি চমৎকার!

পিসির মুখ আনন্দে ক্রমশ উদ্ভাসিত হয়ে যাচ্ছে দেখে মহিম ভয়ানক বিরক্ত হয়ে বলে উঠেছিল—থাক। ঐ গল্প আর শুনতে চাইনে। জীবনটাকে কিসে মজিয়ে রাখলে পিসি, ভাবলে আমার লজ্জা হয়। হ্যাঁ। লজ্জা হয়। দুঃখ হয়। কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে করে। এত অন্ধকার! কী করছি আমরা! হায়! কিছুই যে হচ্ছে না!

মহিম চাপা বিহ্বল আর্তনাদ করে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল। অত্যন্ত তীব্র উত্তেজনায় নিঃশ্বাস বইতে চাইছিল না। তার এই হাহাকার ব্যর্থতা, কিছুই না হওয়ার উপলব্ধি ব্যক্তিগত ছিল না। কিন্তু উত্তেজনার পেছনে অন্য এক প্রত্যক্ষ যুদ্ধ স্নায়ুকোষে চারিত হচ্ছিল। কোর্টে কোরাণ তুলে দেয়ার মামলা, কোরাণের বাকারা সুরার মধ্যে গো-হত্যার বিদ্বেষ আবিষ্কারের মোহান্তীয় ব্যাখ্যা বা শরিয়তের সাম্প্রতিক কলরব ও দোলন কিম্বা সাবানের মধ্যে শুকর ও গোরুর চর্বি, দেওয়ালে দেওয়ালে ত্রিশুল সবই অবচেতনে রক্তাক্ত করে তাকে। কিন্তু সন্ত্রস্ত করেছে আরো এক প্রত্যক্ষ বর্তমান, নিকটবর্তী আসন্ন দাঙ্গার ছবি। দলুইডাঙ্গা, কাঁকুড়গাছি, বাজিতপুর, মেথিডাঙ্গা, নস্করপুর ফুঁসছে। বিশ বছর আগে এই গ্রামগুলিকে ঘিরে দাঙ্গা হয়েছিল। পিসির মুখে সেই বৃত্তান্ত শুনেছে মহিম। জীবনে সত্যিকার দাঙ্গা কখনও দেখেনি। সেই ভয়াবহ আগুন কেমন করে জ্বলে উঠে জীবনকে

ছাই করে দেয় সে জানে না। জানে না, কী করে সেই আগুন নেভাতে হয়। সত্যিই যদি দাঙ্গা বেধে যায়, কী করবে মহিমের দল ও রাজনীতি? কী হবে তখন? এখানেই নিহিত ছিল উত্তেজনার বাষ্প ও বীজ। মহিমের সামনে পিসিই হয়ে উঠেছিলেন হঠাৎ এক অযথা প্রতিপক্ষ। আসলে মহিম পিসির সাথে কথা বলতে বলতে নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে করছিল সম্প্রতি। মনে হচ্ছিল, সে যেন শূন্যে হাওয়ায় ফোঁসাচ্ছে বিষেল সাপের মতো, জীবনের সব বিষ তার কণ্ঠে উঠে এসেছে। এখানের অপরাধতত্ত্ব সমাজের গভীর কন্দর থেকে মহিমকে পুড়িয়ে দিচ্ছিল। মহিম বড় একা হয়ে গিয়েছিল।

বিশ বছর আগে দাঙ্গা হয়েছিল। পিসি সেই হিসেব কণ্ঠস্থ রেখেছেন। তখনকার দাঙ্গার চরিত্র যত সিধে ছিল, এখন তা নয়। লোকগুলো, যারা তখন মাতলামী করেছিল, তাদের চেনা যেত ধুতি আর দাড়িতে, লুঙ্গিতে আর টিকি-পৈতেয়। এখনকার দাঙ্গার কোনো চিহ্ন না হলেও চলে। বা চিহ্ন বদল হয়ে গিয়েছে। মোটা গোঁফ, গলায় ঝুলন্ত ডোরে যীশুর মেডেল, হাতে পাঞ্জাবী-বালা গুরুগণ। হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়।

মহিম ভাবতে ভাবতে শিউরে ওঠে। ভাবছিল, বিশ বছর আগে, কোর্টে কোনো মামলা ছিল না, সাবানে চর্বি মেশেনি, বাকারা সুরায় গো-হত্যার নির্দেশ আবিষ্কৃত হয়নি, শরিয়ত নিয়ে বন্ধ্ করার সংকল্প মনে আসেনি কারো। তখনকার দাঙ্গায় পিসি একটি নৈসর্গিক কারণ আবিষ্কার করলেন। বললেন—ঈদ আর দোল একই দিনে। আরবি মাস আর বাংলা মাসের হেরফের। আরবের ঋতু আর বাংলার প্রকৃতি তো আলাদা। ঘুরতে ঘুরতে দোল আর ঈদ একই তিথিতে, একই চাঁদে এসে মিলে গেল। ব্যস্!

মহিম বলল—দুটিই তো খুশির উৎসব। কালার্ড ফেস্টিভ্যাল।

পিসি বললেন—তা হলে কী হয়! শশাঙ্কর ছেলে নেতাইয়ের পিচকারির রঙ গিয়ে বুড়ো মুসলমান মোবারকের আতর-মাখা ঈদের পোশাকে ছিটকে পড়ল। ব্যস! এই ছিল প্রত্যক্ষ কারণ। বুঝলি মহিম! কিন্তু ভগবান ঈদ আর দোলকে একই দিনে টেনে আনলেন কেন, মানুষের ধর্মবুদ্ধিতে তার বিচার ছিল না। মানুষের ধর্ম ভালো। ধর্মবুদ্ধি খারাপ। বোধ আর বুদ্ধি তো এক কথা নয়। বোধের মধ্যে থাকে মায়া, বুদ্ধিতে থাকে যুক্তির আস্ফালন। হ্যাঁ রে! জীবন থেকে সেই মায়া, বাবা বলতেন মায়া-বোধি সেইটে হারিয়ে গেল যে!

মহিম দাঙ্গার প্রত্যক্ষ কারণের হদিশ চায় আজ। মানুষের ধর্মবোধ কিম্বা ধর্মবুদ্ধির ফারাক নিয়ে নিজেকে চিন্তায় উত্ত্যক্ত করার কোনো মায়া-বোধি তার নেই, যুক্তির সৌন্দর্যই তার কাম্য। সে মনে করে, দাঙ্গা কখনও নৈসর্গিক হয় না। এই যুক্তিতে পিসির সান্ত্বনা থাকতে পারে, মহিমের অবলম্বন নেই।

তাই কিনা মহিম? মহিম নিজেকে প্রশ্ন করল। ধীরে ধীরে সূর্য পশ্চিম আকাশে নেমে যাচ্ছে। আলো কমে আসছে। তুলসীমঞ্চের ম্লানিমা আরো বেড়েছে। তুলসীমঞ্চের পাশে সন্ধ্যামণি ফুলের করুণ বাহার আলোকিত হচ্ছে ক্রমশ। পিসির ফুল সন্ধ্যামণি, করুণ আর স্নিগ্ধ। আচ্ছা, পিসির মায়া-বোধি কিংবা নিশি-কাজল কিম্বা মাটির আত্ম-পর যা কিছু, কীভাবে মনের মধ্যে ভাবের বিহার করে, কী তার ছল ও রহস্য জানা হয়নি কখনও! কিন্তু কেন? মহিমের হঠাৎ আজ মনে হয়, পিসিকে সে একটুও চেনে না। দাঙ্গার যিনি নৈসর্গিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে জীবনের মায়ায় চলে যান, চোরেরও একটা স্ট্যাণ্ডার্ড ছিল বলে দুঃখ করেন, মাটির উনুনে ভাত খেলে কষা ভালো হয়, যাঁর আয়ুর্বেদ, তিনি আসলে কে? অস্তরাগ মুছে যাচ্ছে আকাশ থেকে দ্রুত। আসন্ন দাঙ্গার প্রস্তুতি কি সেখানে আছে? অন্ধকার ঘনিল হয় ধীরে মন্থরে। কী বুড়ো এই পৃথিবী! গোষ্ঠীযুগের মতো এই আকাশের সীমানা স্থির। পূব আকাশের তলায় চাঁদ ঠেলে উঠছে একটু, যেন একটা ম্যাজিক। মহিম রকে দাঁড়িয়ে চাঁদ দেখে। পিসি তুলসীমঞ্চে হালকা হাতে ঘটি থেকে জল ছিটোচ্ছেন। মুখ দেখে বোঝা যায়, তাঁর রাগ পড়ে গিয়েছে। বললেন—একটু জল-ছল করছি মহিম। তুলসী তো জলে বাঁচে না। মাটিতে বাঁচে। আকুল তো এল না।

দীর্ঘশ্বাস পড়ে। মঞ্চে তেল-প্রদীপ হয়। ঘাড়ে আঁচল ফেলে পিসি গড় করছেন। প্রদীপের আলোয় পিসিকে আরো নরম আর শুদ্ধ দেখাচ্ছে। অস্ফুট পিসি বললেন—এই সময় রোজই একটা বিরহের ভাব আসে মহিম। লজ্জার মাথা খেয়ে বলছি, কষ্ট হয় রে! আমার একটাই পুজো।……আজ কিন্তু আজান হল না। দাঙ্গা সত্যিই হবে তাহলে। ইমামের গলা শোনা গেল না মহিম। রোজার চাঁদটা দ্যাখ্ কেমন কালো হয়ে গেছে! ইস্! মহিমের বুকে দুটি অভিঘাত হাতুড়ি পেটাতে লাগল। চাঁদ কালো হয়ে গিয়েছে। দাঙ্গা হবে। পিসির একটিই পুজো।

কী অবাক-কথা। পিসির আর কোনো পুজো নেই। আজ মহিম, বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো ধাক্কায় কেঁপে ওঠে। পিসি কী আশ্চর্য বলেন, খেয়াল করেন, মসজিদে আজান হল না। বিরহ-নিষিক্ত প্রতিমা মহিমকে বলে দেয়, আমায় তুই কী চিনবি রে! তুই তো কমিউনিস্ট! মহিম দ্রুত ঘরে ঢুকে পড়ে। ভীষণ বিষণ্ণ লাগে তার। পিসি ধূপ দিচ্ছেন মঞ্চের ঝোপে। সেখান থেকে ঘরে আসবেন। এ-ঘর সে-ঘর করে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে সরস্বতীর ক্যালেণ্ডারের তলায় তাকে রেখে দেবেন। ধূপের কমে আসা উদ্গিরণ। পিসির ছায়া বারান্দায়। ধূপের ছায়া পড়ছে দেওয়ালে। মনে হচ্ছে, পিসির ছায়ায় আগুন লেগে পুড়ছে, ধুঁয়ো বেরুচ্ছে হু হু করে ক্রমাগত। পিসি কি সত্যিই

পড়ছেন? তবু পিসি এত হাসিখুশি থাকেন কী করে? পিসি ঘরে ঢুকেই বললেন—প্রতিদিন এই সন্ধ্যেবেলা ইমাম আলির আজান শুনতে শুনতে আমার একটা গল্প মনে পড়ে মহিম। সেই যে বিরহের কথা বললাম তখন, সেইটে, সেই গল্প। কখনও তো শুনতে চাইলি নে কিছু! কিন্তু আমাদের জীবনেও অনেক দুঃসাহস ছিল। হ্যাঁ রে!

মহিমের কোমর সটান শক্ত হয়ে উঠল পিসির কথায়। গল্প? দুঃসাহস? কীসব বলছেন পিসি? তুলসী-মঞ্চ-পূজারিণীর মুখে এ-কথা সত্যিই যে বিস্ময়াবেশ তৈরি করে এই বেলা।

—সারদা? সারদা আছো নাকি?

খুবই নতুন গলায় কেউ ডাকছেন বলে মনে হয়। খুব মোলায়েম শান্ত সুরে পিসির নাম ধরে সন্ধ্যার পর কে অমন করে ডাকছেন? মহিম আর পিসি উৎকর্ণ হয়ে চুপচাপ। কোনো কথা হয় না। আবার ডাক শোনা যায় কিছুক্ষণ নিঃশব্দ সময় বাহিত হয়ে গেলে। উপর তলার জানালা গলানো আবছা আলো উঠোনে। সেই ছায়ায়-আলোয় মানুষটি এসে দাঁড়ালেন। দোতালায় বিছানাগত পুলিন মুখগুঁজে থাকেন। মহিমের সাথে খুব কম দেখা হয়। পিসির সেবা গ্রহণ করেন পুলিন, আর একজন সেবা দেওয়ার মাইনে বাঁধা মেয়েও রয়েছে। মেয়েটি সংসারের কাজও কিছু করে দেয়। উপরতলার সাথে এ-গল্পের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। তাই এই ধারা ডাক শুনে উপর থেকে কোনো সাড়া আসে না। মহিমের মা নেই। পিসিই সেই স্থলে মায়ের মতন ছায়া দিয়েছেন। আবার তিনিই মহিমের বন্ধুও নিশ্চয়। মহিম বাইরে আসে। পিসিও। উঠোনের ব্যক্তি বলেন—আমি একটু তোমার কাছে এসেছিলাম সারদা। মহিমের সাথে দুটি কথা বলতাম। সারদা কতকাল পরেও ইমাম আলির কণ্ঠস্বর চিনতে পারলেন। উদগ্রীব শোনাল গলা—ইমাম ভাই, তুমি? তুমি এসেছ? বিশ্বাস করতেই পারিনি। তবু দ্যাখো, তোমায় অন্ধকারেও চিনে ফেলেছি। এসো, এসো। উপরে উঠে এসো। উঠোনে দাঁড়িয়ে থেকো না। একটু আগে তোমার কথাই বলছিলাম মহিমকে।

ইমাম আলি ঘরের আলোয় এসে পৌঁছলেন। বললেন—আমার কথা হচ্ছিল? আমার কথা? অবিশ্বাসের সুর ফুটে ওঠে ইমামের গলায়। ফের বললেন—আমার কথা কেন হবে? আমি সামান্য খতিব। দরিদ্র মুসলমান। তুমি চারুলতার বোন। বড়লোকের মেয়ে। তোমরা ব্রাহ্মণ। আমার কথা কেন?

মহিম লক্ষ্য করল, পিসি থতমত গলায় কথা ঘুরিয়ে নিচ্ছেন—না। মানে। তোমার কথা ঠিক নয়। তোমার আজানের কথা। তোমার আজানের কথা হচ্ছিল। কৈ আজ তো তুমি আজান দিলে না?

ইমাম বললেন—দিয়েছি। শুনতে পাওনি।

—সেকি! কোথায় দিলে, কখন?

—দিয়েছি। রোজ যখন, যে সময় আজান হয়, তাই হয়েছে। শুনতে পাওনি। খালিগলায় দিলাম কিনা! তাই শুনতে পাওনি। থানার দারোগাবাবুরা এসে মাইক বন্ধ করে দিয়ে গেছে। আজ থেকে ভোররাতে রোজার শেহরীর * আজানও শুনতে পাবে না। আমি সেই জন্যই মহিমের কাছে এসেছিলাম, যদি কোনো ব্যবস্থা হয়! দ্যাখো, আজান দিই বলেই আমার কথাটা তবু তোমাদের গলায় উঠল। ভাবতে মন্দ লাগে না।

মহিম ফাঁক বুঝে বথা বলল—হ্যাঁ, খতিব সাহেব, আপনার আজান নিয়ে কথা হচ্ছিল, পরে আপনাকে নিয়ে কথা শুরু হতে যাবে, এমন সময় আপনি এলেন।

—না মহিম। আমি উনার কথা বলিনি। অন্য একটা গল্প বলছিলাম, হঠাৎ ছোড়দির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। বললেন পিসি। মুহূর্তে পিসির মুখে রক্তোচ্ছ্বাস ভরে গিয়েছিল। মহিম লক্ষ্য করল। তারপর পাতলা হেসে বলল—হ্যাঁ, একটা গল্প শুরু হবে, তখনই আপনি এলেন। অবিশ্যি সেটা যে চারুপিসির গল্প, এইমাত্র শুনছি। তাই না পিসি? পিসি মিষ্টি করে বললেন তোর ঐ এক স্বভাব, ঠাট্টা করবি। ইমাম ভাইকে শুধিয়ে নে, আকুলের নিশি-কাজলের গল্পটা কী চমৎকার! কী গো, তোমার মনে নেই? সোফায় বসেছেন ইমাম আলি, কাঁচা-পাকা চুল-দাড়ি, এক সৌম্য পুরুষ। ঠোঁটে লেগে আছে ঈষৎ রঙিন হাসি। চোখ দুটি দীঘল টানা উজ্জ্বল। বাতাসে ধূপ আর দোক্তার গন্ধ মিশে গেছে। প্রশস্ত কপালে সিজদার ধুলোট দাগ। গায়ে কলিদার জামা। পরনে লুঙ্গি। ডানহাতে বাঁধা ঘড়ি। বুক-পকেটে পার্কার পুরনো কলম। মহিম আর পিসি খাটে বসেছেন, পাশাপাশি। পিসির কথা শুনে ইমাম আলি ঠোঁটের হাসিকে আরো একটু গাঢ় করলেন। বললেন—আজ সন্ধ্যায় নামাজে বসে, বুঝলে সারদা, আমি প্রায় কেঁদেই ফেলেছি, বুকটা হুহু করে উঠছিল বারবার। মধুরকুলের আকুল কেন, কতজনের কথাই মনে পড়ে যাচ্ছিল। আজ মসজিদে আজান বন্ধ হয়ে যাবে, স্বপ্নেও কি ভেবেছি? আমরা মুসলমানরা সংখ্যায় কম, এতগুলো

* শেহরী—দিনের বেলা রোজা (উপবাস)-র জন্য রাত্রির তৃতীয় প্রহরে খানাপিনা করার ধর্মীয় বিধি। শেহরীর আজান বলে কিছু হয় না। শেহরীর পর রাত্রির চতুর্থ প্রহরে ফজরের আজান হয়। এখানে সেই আজানকেই শেহরীর আজান বলা হয়েছে।

গাঁয়ে একটাই বড় মসজিদ, তার আজান যদি বন্ধ হয়, কোথায় গিয়ে আঘাতটা লাগে, মহিম তুমি ভেবে দ্যাখো বাবা!

মহিম বলল—কথাটা আমিও প্রথম বিশ্বাস করিনি খতিব সাহেব। আমার দলও সেকথা বিশ্বাস করে নি। থানার আচরণ আমাদের তাজ্জব বানিয়েছে, আমরা বেকুব হয়ে গেছি। এটা ভারি অন্যায়। কথা দিচ্ছি, আমরা দলের পক্ষ থেকে যতখানি বলার করার তা অবশ্যই করব। থানায় যাব। ডেপুটেশন দেব। হিন্দুরা, ঠিক কোন্ হিন্দুরা এইসব করছে, আমরা দেখছি, বুঝলেন।

ইমাম বললেন—আজান দিলে হিন্দুদের নাকি ঘুমের ব্যাঘাত হয়, শেহরীর সময় আমরা মাইকে রোজদার যারা, তাদের ডাকাডাকি করি বলে, শুনলাম, হিন্দুরা, কিছু হিন্দু খুবই তেতে আছে। অথচ মধুরকুলে ছেলেবেলায় দেখেছি ···একটুখানি থামলেন খতিব। কেমন অন্যমনস্ক দেখাল তাঁকে। বললেন—আমি জ্যাঠামশাইকে, সারদার বাবা, দেখেছি খুব মনোযোগ দিয়ে আজান শুনতেন, আজানের সময় বাচ্চারা গোলমাল করলে ধমকাতেন, ভারি বিরক্ত হতেন। জ্যেঠিমা, 'আজান শুনছে তোদের বাবা' 'গোলমাল করিস না' বলে বাচ্চাদের সাবধান করতেন, সামলাতেন, এইসব দেখেছি আমরা। কী গো সারদা, তোমার মনে পড়ে না? আমরা মুসলমানরাই বরং অবাক হয়ে জ্যাঠামশাইকে, কেন তিনি অমন করে আজান শোনেন, প্রশ্ন করতাম। উনি তেমন কোনো জবাব না দিয়ে, কেবল নিঃশব্দে হাসতেন আর বলতেন, খুব ভালো, খুব ভালো, সুরটা শুনে মনটা যে কোথায় চলে যায়! সুরের তো জাত নাই হে! আমি সুরটা শুনছি আর কথাগুলো তো ভগবানের নামগান হচ্ছে, আজান কি আমার জাত মারতে পারে!

—দাঁড়াও ইমাম ভাই, আমায় বলতে দাও। সহসা পিসি কেমন উদ্বেল হয়ে উঠলেন। অতীত-স্মৃতিচারিতার বিশ্বস্ত অতিথি মিলেছে এতদিনে। মনের সহস্র অর্গল খুলে দিয়েছে কেউ, বর্তমানের চাপা রুদ্ধ বেসামাল জীবন ওঁদের ধাক্কায় ধাক্কায় অতীতে টেনে নিয়ে চলেছে। মহিম অনুভব করতে পারে। পিসি বললেন—আমাদের চণ্ডীতলায় সম্বৎসর বাবা তোমাদের দাওয়াত (আমন্ত্রণ) দিতেন মহরমের সময়। ফি-সন তোমরা দল নিয়ে এসে লাঠি খেলে যেতে। আমার মামাত ভাই শ্রীকান্ত ছিল ওস্তাদ ছেলে। চমৎকার ঢোল বাজাত, পাঁচ পাঁচটা ঢোলের সোঁক তালকাচাইরি বুকের মধ্যে গুরগুর করত। মহরমের তাজিয়ার কী ঝিলিমিলি, জুলুসের সে কি সমারোহ! বাবা হঠাৎ লাফিয়ে নেমে লাঠি ধরতেন, দ'চারটে পাক মেরে বলতেন, ইমাম আলি খেলবে এবারে, বাজি লাগাও শামসুদ্দি! পুজোর মণ্ডপে লাঠি খেলার আসর, এ-নিয়ে গল্প লেখা যায়, মহিম। জীবনকে আজ বিশ্বাস করানো যায় না।

এক দফা দম নিয়ে পিসি বললেন—ইমামের লাঠি খেলা একেবারে প্রসিদ্ধ ব্যাপার। বানা-পাটার খেলা। আসরে নামছে ইমাম। সবাই উদ্‌গ্রীব। বানা-পাটা তো না, একেবারে বিজলি হানাহানি, অমন সম্মোহন ভাবা যায় না। ইমামের লাঠি-খেলা দেখে ছোড়দি তো মনে মনে এমন বিষম চোট খেয়েছিল, অবিশ্যি ইমাম আজও সে-কথা জানে না, আসলে আমি ছাড়া কেউ সেকথা জানত না। এ-কথা বলাতে আজ কোনো ঝক্কি নেই বলেই বলছি। তুমি কি লজ্জা পাচ্ছ ইমাম ভাই? ইমাম মাথা নিচু করলেন। বললেন—সেই আমলে তোমার বাবার মতো হিন্দুরা সংখ্যালঘু মুসলমানদের সব দিক থেকেই রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এই এলাকায় মুসলমান চিরকালই কম। সেই অবস্থায় একজন হিন্দুমেয়ের যা সাহস ছিল, একটা মুসলমানের ছেলের তা ছিল না। মনের শক্তি হিন্দুদের চিরকালই বেশি। জ্যাঠামশাইয়ের মনের জোর সেই যুগে তো কম ছিল না! কারণ তাঁরা ছিলেন অন্য মানুষ। পিসি বললেন—তোমার সাথে আমাদের শেষ দেখা শিবতলার বটতলায়। আমি আর ছোড়দি ঘটিভর্তি দুধ নিয়ে শিব-চিহ্নে পুজো দিতে গেছি। ছোড়দির বিয়ের কথা চলছে। তখন মেয়ের বিয়েও খুব তাড়াতাড়ি হোত। ফেরার পথে তোমার সাথে দেখা। তোমায় দেখে প্রথম আমরা চিনতেই পারি না। সারা মুখে ভয়ানক দাড়ি একদম ছেয়ে ফেলেছে। তোমার হঠাৎ এই চেহারা দেখে ছোড়দি চমকে উঠল। বলল, 'ইমাম! তুমি এতবেশি মুসলমান হয়ে গেলে কেন?' সাংঘাতিক কথা! ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল ছোড়দির! তুমি বললে, 'চারুলতা! তুমি বড্ড হিন্দু হয়ে গেছ।' আমার মনে আছে। শুনতে বোধহয় খুব তুচ্ছ কথা। কিন্তু সেই সময় তার মানে ছিল কতখানি! তখন মুসলমান ছেলেরা হঠাৎ-হঠাৎ এই ধারা দাড়ি রেখে, কলিদার জামা আর কিস্তি টুপি পরে মুসলমান হয়ে যেত। তাতে হিন্দুদের কোনো আপত্তি ছিল না। বরং খুশিই হোত তারা। উল্টে হিন্দুও বেশিমাত্রায় হিন্দু হয়ে গেলে মুসলমান ভয় পেত না। কারণ সবই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু সেদিন ছোড়দি তোমার মুসলমান হওয়ায় যে আপত্তি করেছিল, তা যে কেন করেছিল আজও ভাবি, ঐ কথার মধ্যে কী ছিল সেদিন!

কথা শুনতে শুনতে মহিম মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। পিসিকে সত্যিই তো সে কখনও চেনে নি। তথাপি সে শঙ্কিত হচ্ছিল, পিসি তাকে কোন্ সম্মোহনে নিয়ে যেতে চাইছেন? অচেনা এক বিপুল রহস্যময় বিস্ময়ের পৃথিবী মহিমের চোখের সামনে কক্ষ-কক্ষান্তরে উন্মোচিত হচ্ছিল। মহিম বলল—আজও একজন মুসলমান ছেলে আচমকা একদিন সব ফেলে দাড়ি রেখে টুপি পরে নেয়, আমাদের দলে এ-জিনিস ঘটেছে। সিরাজুল হঠাৎ করে লাল ঝাণ্ডার শ্লোগান দিতে দিতে মসজিদের খতিব হয়ে গেল। লজ্জার কথা

তোমাদের কাছে স্বীকার করছি পিসি। আমরা সিরাজুলকে রক্ষা করতে পারি নি। সে এখনও দলে আছে, কিন্তু মুসলমান হয়ে গিয়েছে।

পিসি বললেন— কিন্তু এই যে হয়ে যাওয়া, তুমিও বুঝবে ইমাম ভাই। সেদিনের হওয়া আর আজকের হওয়া এক কথা নয়। দুটি আলাদা ঘটনা। সিরাজুল আর ইমাম আলাদা লোক। আমি যা বুঝেছি, তাই বলছি।

মহিম বলল—লোক দুটি আলাদা ঠিকই। কিন্তু ঘটনা একই। সেই ধর্ম, সেই সংস্কার। টানটা যে কোথায় থাকে, চিন্তা করি, কোথায় সে থাকে।

পিসি বললেন—তাগিদ তো ভেতরের মহিম। আর সে স্বাভাবিক ব্যাপার। ইমাম যা হয়েছিল, ভেতরের মায়া থেকে। আমাদের মধ্যে একটা জাদু আছে, আমরা সেই জাদুতে পূর্ণ। কিন্তু সিরাজুল ধাক্কা খেয়েছে। তোদের তাড়া খেয়ে পালিয়ে গিয়েছে। মানুষকে কী দিয়েছিস তোরা যে মানুষ থাকবে? এক কিলো গম? একটা লাইসেন্স? পুলিশী মদত? ঐ তো কিলো গম? একটা লাইসেন্স? পুলিশী মদত? ঐ তো. তিনজন হিন্দু দারোগা এসে মাইক বন্ধ করে গেল? খালি নিশেনের রঙ লাল হলেই কি মানুষের মন ভরে রে মহিম! মানুষ তার আত্মার খোরাক চায়, পূর্ণতা চায়। কী দিয়েছিস তোরা? উত্তেজিত হয়ে খাট ছেড়ে নেমে সারদা পাশের ঘরে চলে গেলেন। দুদণ্ড পর ফিরে এসে ধূপচিতে গুঁড়ো ধূপ ছড়িয়ে ফুঁ দিতে লাগলেন। তাবৎ ঘর ধূপের ধুয়োঁয় আচ্ছন্ন হয়ে ভরে গেল। পিসিকে ধুয়োঁর কুণ্ডলি আঁকড়ে ধরেছে। মহিম জিজ্ঞাসা করে—তাহলে আমরা কিছু দিই নি? কিছুই করিনি?

—হ্যাঁ করেছ। করেছ বৈকি! পিসি জবাব দিতে চান। বলেন—জীবন থেকে সেই মায়া নষ্ট করে দিয়েছ, যুক্তির তাড়া খেয়ে জীবনের এক কোণে সেই মায়া লুকিয়ে পড়েছে। কিন্তু মরে নি। মারতে পারনি। আছে। আছে। সেই মায়ার টানে, সেই জাদুতে রত্নাকর বাল্মীকি হয়। দেখেছি পরানকে, আকুলকে। চোরের কাজল, মন্ত্রতন্ত্র-করা ডাকিনী-যোগিনীর ছল। তাহলে কী হয়, ওরই ছোঁয়ায় পরান বদলে গেল। চুরি ছেড়ে দিল। ছেলেকে শোধন করে বললে, এই নিশি-কাজল আর কখনও চোরের কাছে বিক্রি করো না। মানুষকে দিয়ো, চোখের রোগ সারবে। তা কী করে মানুষ চোর থেকে সাধু হয়? মায়ায় হয়, জাদুতে হয় মহিম। যেমন হয়েছিল নসুহা ডাকাত। হাদিস কুরানের কথা। ইমাম ভাই ভালো জানে। বাবাকে বলেছিল পরান। তো চোর নিশি-কাজল পরে অমাবস্যার রাতে চুরিতে যায়। রাত তখন দিনের মতন ফর্সা। কিন্তু সেই মায়া তো আর রইল না।

ইমাম বললেন— জুম্মাবারে (শুক্রবারে) আমরা খুদবা পাঠ করি। খুদবার একটা ভাগ আছে, নাম হল তৌবাতুন নসুহা। নসুহা ডাকাত যেমন করে তৌবা

করেছে, একটা চোর, যে কিনা কবর থেকে কাফন চুরি করে বিক্রি করত, এমনকি মেয়ে-মর্দার সাথে কবরে ঢুকে ব্যভিচার করত, বলাৎকার করত, সেই নসুহা তৌবা করেছিল, তার মতো কাঁদতে হবে, অনুশোচনা করতে হবে, সেটা এক দৃষ্টান্ত।

পিসি বললেন—আজকের দিনে একটা গুণ্ডা কী হয় ? আরো গুণ্ডা হয়। পরান হয় না। নসুহা হয় না। কেন হয় না ? আজ যারা দাঙ্গা করবে, তারা কারা ? তাদের চোখে নিশি-কাজল কে পরাবে ? সব জোচ্চর। মুসলমানেরও কেউ না। হিন্দুরও কেউ না। আমার দুঃখ অন্যখানে ইমাম ভাই। শুনবে ?

ইমাম আলি উৎসুক হলেন। মহিম পিসির দিকে ধূপের আচ্ছন্নতায় চোখ মেলল। পিসি বললেন—ছেলেবেলায় আমি, তুমি আর ছোড়দি কতদিন ঘোড়াপীরের থানে গিয়েছি। সেখানে পীরের কবর। শুনতাম, জাগ্রত পীর কবরে শুয়ে আজান দিচ্ছেন। সেখানে তুলসীমঞ্চ ছিল। তেল-প্রদীপ হোত। মানতের বাতাসা খেতাম আমরা। সেই তুলসীমঞ্চের মাটিতে কান পাতলে আজান শোনা যেত। আমরা কান পেতে সত্যিই একটা ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পেতাম। বিয়ের পর সেই মাজার ( থান ) থেকে আকুল আমাকে তুলসীর চারা দিয়ে গিয়েছিল। সেই মঞ্চে কান পাতলে আজান শুনতে পেতাম। পরে স্বামী হারিয়ে সেই তুলসীর চারা মহিমদের মাটিতে পুঁতেছি।

—এখন কি শুনতে পাও সারদা ? জানতে চাইলেন ইমাম। পিসি চুপ। বললেন দুদণ্ড পর। না। পাই না। পেতাম। আর পাই না মহিম। ধীরে ধীরে সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিসের চাপে সেই সুর থেমে গেল জানি না। আজ কি আমি খুব বেশি হিন্দু হয়ে গেছি ? যদি তাই হয়ে থাকি, মনে আরো শান্তি পাওয়ার কথা। কিন্তু এত যন্ত্রণা হচ্ছে কেন ? সেই মায়া কি সব শেষ হয়ে গেল ? নাকি যন্ত্রণার অন্য কোনো কারণ আছে ? কেন এত কষ্ট রে মহিম ? বলে দে !

ইমাম শুধালেন—আমাদের ব্যবস্থা তবে কিছু হবে নাকি মহিম ?

এই সময় কাজের মেয়েটি ট্রে-তে চা আর বিস্কুট নিয়ে ঢুকল। মহিম গম্ভীর হয়ে বলল—হবে। আপনি চা খেয়ে মসজিদে চলে যান। অত উতলা হবেন না। নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

ইমাম বললেন—কী করে নিশ্চিন্ত থাকি ? আমার নামে যে চারিদিকে বদনাম ছড়ানো হচ্ছে, আমি নাকি আরবের দালাল। আমি নাকি গুপ্তচর। আমি নাকি মসজিদের ছবি তুলে আরবে পাঠিয়ে, মসজিদের সংস্কার করবার জন্য আরব-সরকারের কাছে টাকা চেয়েছি। আমি নাকি পাকিস্তানের অনেক টাকা খেয়েছি। আচ্ছা, সারদা ! এইসব কি সত্যি হতে পারে ? অথচ,

এইসব প্রচার হিন্দুদের অনেকেই বিশ্বাস না করলেও, আমাকে সন্দেহ করছে কিছু কিছু। ভাবছে, হবেও বা। মানুষকে বিশ্বাস কি? ফলে আমার খুব উদ্বেগ হচ্ছে। কলিজা শুকিয়ে যাচেছ বাবা!

পিসি কথা শুনতে শুনতে ট্রে থেকে কাপ-প্লেট উঠিয়ে ইমামের সামনে রাখলেন। বললেন—খাও!

পার্টি অফিসে তারপর কথা শুরু হয়। সুদীপ্ত বললেন - সমস্ত পরিস্থিতি খুঁটিনাটি খোঁজখবর নিয়ে দেখতে হবে কিসে কী হয়েছে। কারা থানায় গিয়ে ও. সি-কে বুঝিয়েছে, মাইক বন্ধ করার যুক্তি কোথায়, ও সি-ই বা মসজিদ অব্দি জীপ হাঁকিয়ে ছুটল কেন? মুসলমানরা এই অবস্থায় কী ভূমিকা নিচ্ছে। সব কিছু বিচার করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। থানায় গিয়ে কথা বলতে হবে। দরকার হলে পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় বৈঠক করে পাল্টা একটা সুস্থ আবহাওয়া গড়ে তুলতে হবে।

ইমরান ঈষৎ উষ্ণ গলায় বলল—কোনো সুস্থ আবহাওয়া গড়ে তোলা যাবে না কমরেড! গ্রাম-বৈঠক করে, পথসভা বা হ্যাণ্ডবিল ছড়িয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাবে না। ইমামের মসজিদে মগরেব থেকে এশা-তাহাজ্জুদ* অব্দি, মাঝরাত পর্যন্ত মুসল্লীর ভীড় জমে থাকছে। আগে এত লোক নামাজ পড়তে জমায়েত হতো না। এই লক্ষণ দেখে যথেষ্ট শঙ্কিত হতে হয়। ভীষণ সেন্টিমেণ্টাল ব্যাপার ঘটে গেল। আমরা মোটেও তৎপর ছিলাম না। আমি নিজেও খুব ভয় পাচ্ছি, রাত করে বাড়ি ফেরা অত্যন্ত রিস্ক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমি মুসলমানদের বোঝাতে পারছি না। হিন্দুরাও গোপনে মিটিং করছে। শুনলাম কোন্ এক প্রসিদ্ধ ধর্মগুরুকে আমন্ত্রণ করে হিন্দুরা ধর্মসভা করবে। মুসলমানরাও পাল্টা জলসা করতে উঠে পড়ে প্রস্তুত হচ্ছে। আপনি পরিস্থিতি অত লঘু করে দেখছেন কেন?

সুদীপ্ত বললেন—আমি মোটেও কোন কিছু লঘু করে দেখছি না ইমরান সাহেব। তাহলে বলুন, এই অবস্থায় আপনার সাজেশন কী?

ইমরান বলল—আমার কথা হচ্ছে, থানার ও. সি. বদলানো। ললিতবাবুর বদলে সুলতান খাঁ-কে নিয়ে আসা। এই ধরনের একটা কথা ঢের দিন থেকে হচ্ছে। সুলতান খাঁ-র চমৎকার ট্যাক্‌ল্ করার ক্ষমতা। খাঁ সাহেব, তেজি লোক, বেপরোয়া। ও এলে একটা পুলিশী নিরপেক্ষতা না হোক, অন্ততঃ একটা ব্যালান্স হয়। কারণ থানার তিনজন দারোগাই হিন্দু। সুলতান খাঁ এলে মুসলমানরা ভরসাও পায়।

* মগরেব—সন্ধ্যাকালীন উপাসনা। এশা—রাত্রির প্রথম প্রহরের উপাসনা। তাহাজ্জুদ—মধ্য বা গভীর রাত্রের উপাসনা।

সুদীপ্ত শুধালেন—আপনি নিজেও কি তাই পান ?

ইমরান গলার কলারের প্রান্তভাগ মুঠোয় ধরে টেনে আহত গলায় বলল—পাই বৈকি !

সুদীপ্তর প্রশ্ন—কীভাবে পান ? একজন মুসলমান হিসেবে, নাকি একজন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে ?

ইমরান থতমত খেয়ে মুখ আমতা আমতা করে বলে—বুঝেছি !

সুদীপ্ত নেতৃত্বসুলভ মৃদু ধমকানী দিয়ে ওঠেন—না। আপনি কিছুই বোঝেন নি। সুলতান খাঁয়ের তেজ, বেপরোয়াভাব, কর্মক্ষমতা সবই কি মুসলমান বলে, নাকি একজন দারোগা তাই ? আমরা কীভাবে বিচার করব ?

—কিন্তু আপনি পরিস্থিতি বুঝছেন না। মুখ ভার করে ইমরান।

মহিম বলে—হঠাৎ এইরকম জটিল ঘোরালো পরিস্থিতিতে সুলতান খাঁ এলে দাঙ্গা বাধবার সম্ভাবনাই বেশি। তাছাড়া, আমাদের নীতিই বড় কথা, তিনজন দারোগা হিন্দু হলেই বা কী এসে যায় ? আমরা চাইব, থানা তার ডিপার্টমেণ্টাল নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে। মুসলমানরা যদি দ্যাখে, আমাদের চাপে বাধ্য হয়ে হিন্দু দারোগা তাদের জান-মালের দায়িত্ব নিয়েছে, ধর্ম পালনের অধিকার রক্ষা করছে, সেটা কি ইমরান ভাই আরো ভাল হয় না ?

ইমরান বলল—আপনার কথা বরাবরই শুনতে বেশ আরাম লাগে মহিম ভাই। কিন্তু তা দিয়ে জীবন বাঁচে না। বলুন, আমরা কি কম্যুনিস্ট হতে পেরেছি ? ভোট করতে করতে তো শেষ হয়ে গেলাম। আমি হিন্দু না কম্যুনিস্ট নাকি মুসলমান, এই দ্বন্দ্বের যে কবে শেষ হবে। উঠি কমরেড ! বলেই ইমরান লাল সেলাম জানিয়ে অফিস ছেড়ে পথে নেমে জনস্রোতে মিশে গেল।

…পরের দিন পার্টির পোস্টারে দেয়াল ছেয়ে গেল। সুলতান খাঁ দূর হটো। দলুইডাঙ্গা এসো না। পরে আরো একটি পোস্টার। ললিত দারোগা নিপাত যাও। পরে আরো একটি। একই থানায় তিনজন দারোগা নিয়োগ করা হল কেন, প্রশাসন জবাব দাও। দলুইডাঙ্গার মসজিদে মাইক চালু করতে হবে।

মহিম পোস্টার পড়তে পড়তে সর্বাঙ্গে আশ্চর্য যাতনা অনুভব করতে থাকে। পার্টি-অফিস যাচ্ছিল, পথের ওপরে পা থেমে পড়ে। দ্যাখে, সবই তার পার্টির পোস্টার। বুঝতে পারে উপর নেতৃত্ব থেকে নির্দেশ জারি হয়েছে। পোস্টার পড়তে পড়তে পার্টির ভাষায় সে দ্যাখে সুবিধাবাদী কী মারাত্মক চাতুরি ! হিন্দুকে খুশি করে। মুসলমানকে খুশি করে তারা। ভোট আসে ভোট যায়। জীবন বদলায় না। সন্ধ্যা হয়। হঠাৎ-ই গলিপথে একটি ছেলেকে উর্ধ্বশ্বাসে জিভ বার করে দৌড়ে প্রাণভয়ে পালাতে দ্যাখে। পেছনে

তিনজন চকচকে হেঁসো হাতে তাড়া করে তীরের মতন বেরিয়ে যায়। মহিমের পিঠ ঘেঁষে চলে গেল তারা। হিন্দু-না-মুসলমান চিনতে পারে না মহিম। মহিম বাড়িতে ঢুকে পড়ে। পরের দিন ভোরে খবর আসে মসজিদের মধ্যে ইমাম আলির মুণ্ডু ঘাড় থেকে নেমে গিয়েছে। যুগীপাড়ায় নগেনের কিশোর ছেলে হারাধনের গলা-কাটা দেহ তাঁতের গর্তে পড়ে আছে।

মহিম সারা দিন ঘরের মধ্যে বসে থাকে। কোনো কথা বলে না। পিসি তার চেহারা-ছবি দেখে আঁৎকে ওঠেন। রাতারাতি মহিম যেন বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছে। পিসির তুলসীগাছ আরো শুকিয়ে যায়। সন্ধ্যা আসে। সন্ধ্যামণি আলো হয়। ধূপ জ্বলে। মহিম পিসিকে দ্যাখে। পিসি কখন তুলসী-প্রণাম করবেন। সন্ধ্যা যে উত্তীর্ণ হয়ে গেল। পিসি কি কোনো কিছুর জন্য অপেক্ষা করছেন? পিসি কি তেল-প্রদীপ করবেন না? পিসির কী হল আজ? মহিম শুধায়—তুলসীগাছে জল-ছল কর পিসি?

পিসি বলেন—করি বাবা।

—কখন করবে? সাঁঝ তো পার হয়ে গেল? প্রদীপ কোথা? তেল দিয়েছ?

—দিই।

—কখন দেবে?

— আজান হোক তবে তো।

—আজান যে হবে না পিসি!

বলতে গিয়ে মহিমের গলা বুজে গেল। পিসি প্রদীপে দিয়াশলাইয়ের কাঠি ছোঁয়ানোর আগে বললেন—জীবনের অভ্যাস কী অদ্ভুত দ্যাখ্। ভুল হয়ে যাচ্ছে রে। আজান পড়বে, প্রদীপ ছোঁয়াব। তাই না? ভুল তো হবেই। ছন্দটা যে হারিয়ে যাচ্ছে রে! বড় পুরনো সেই নিয়ম। আজান পড়বে। জল-ছল হবে, প্রদীপ ছোঁয়াব। সুরটা যে কেটে গেল বাছা! মনের মধ্যে আজান বাজবে, মন তখন বলবে, আলো দাও। আলো দাও। বলতে বলতে পিসির প্রদীপ জ্বলল। সেই আলোয় পিসিকে অন্য রকম লাগল। মনে হল, এ-মহিলা সারদা নয়, চারুলতা। মুহূর্তে মনে হল মহিমের। চারুলতা এখনও আজানের জন্য কান পেতে আছেন। গড় হতে পারেন নি।...মহিম দেখল, এই মায়াময় ছবিখানি অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। কিন্তু সাথে সাথে কোথাও আলো চোখে পড়ে না। চাঁদ একখণ্ড ভয়ানক কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে। নড়ছে না। আকাশে প্রাচীন গোষ্ঠীযুগের আকাশ স্থির। মহিমের বুক খালি। কোথাও কেউ নেই। সহসা নিজেকে তার সাঁঝ কানা মনে হচ্ছিল।

———

# কাসীদ

বন্ধু নয়নের কাজল
তিলক দণ্ড না দেখিলে
মন হয় রে পাগল। (পূর্বরাগ, রাঢ়ী বিয়ের নারী-গান)।

কুরুর ঢোলে রাঢ়ী-বউ ফুলমনের হাতের সোহাগী টোনা লেগেছে ভাতঘুম ভাঙানো পূর্ণিমা রাতে। গা-হলুদের রাত। বিহানে বিবাহ! বিহান বলতে তখন কিন্তু বেলা চড়ে যাবে। এদিকে চাঁদ উঠেছে সাফা আসমানে, যেন ঢোলিয়ার চাঁদ, ইংরেজি 'ওয়াই' অক্ষরের মতন ঊর্ধ্ববাহু দু'হাতী গাছের শুখা ডালের ফাঁকে তীব্র চাঁদের মুখ। ঢল-ঢলানো জোছনার তেজী আলো টইটই করছে। বাইশ ইঞ্চি সাইজের হাত-ঢোলকে ফুলমনের এঁটেলী দানা খপ্‌খপ্‌ করছে রক্ত-দোলনের মুদ্রায়। গাইছে ঃ

ছেলে লালের মাথায় রে
কাঁচি-কাটা বাবরী হে;
ছেলে লালের গায়ে রে
টেরিলিনের জামা হে।

কে সেই বাপের লাল? রাজশাহীর পোলা এতিম-বান্দা কাশেম কোরেশী শিয়াপাড়ার নৈনিহালের দোস্ত। নৈনিহাল শিয়া। কাশেম কিন্তু কোরেশী। তার মানে সে-ও শিয়া। সুন্নী নয়। কথাটার মধ্যে যে কোন প্রকার গুমর নেই ইয়াকুব ছড়াদার বোঝে। বোঝে দু'ভাবে। কাশেমের কথার টানে উর্দু ভান একেবারে গা-লাগা নয় বটে, কিন্তু যেমন রেশ আছে। আর নৈনিহাল

মীর্জা পাকা সৈয়দ না হলেও নশীপুরের শিয়া। ওদের দোস্তালীই বলে দেয় ওরা এক ঝাঁকের মছলী। এলাহিগঞ্জের মৌলবী মসলেম মীর ঐ কোরেশী শুনে জ্বলে গিয়েছে। কাশেমকে ধাঁ করে চড়াও হয়েছিল পয়লা পয়লা। উর্দু টিপ্পনি করেছে ঃ

সব সৈয়দ হ্যায় গোরে গোরে
তুম্ সৈয়দ কিউ কালে ?
হো কিসিকে খরিদা গুলাম
( ইয়া ) হো কিসিকে শালে !

তা বটেই তো ! সৈয়দরা তো সব গোরা গোরা। যেমন নৈনিহাল। কিন্তু কাশেম কোরেশী যে মাজা-মসৃণ চকচকে তেলী রঙের পিছল-কালো হে। তাহলে সে কোন সৈয়দের কেনা গোলাম অথবা শ্যালক। বটেই বা। মীর বলেছে, দুই বাংলায় মিলে দেড়খানা সৈয়দ আছে। বাকি সব মেকি ! এ-ছেলে ঠিক ও-পার থেকে খুন করে পালিয়ে এসেছে। সে কথায় কাশেমের চোখ ছলছল করে উঠেছে। নৈনিহাল দোস্তের কণ্টে প্রতিবাদ করেছে—আপনিই বা কিসের মীর মসলেম মিঞা ? এলাহিগঞ্জের সেখ আপনি, চিনি না ? শিয়াদের সহ্য করতে পারেন না। পদবী ভাঁড়ালেই কেউ নবাব হয় না।

গঙ্গা ওরফে ভাগীরথীর দু'পারে এক অদ্ভুত শিয়া-সুন্নীর বিভেদ-মিলনের পারাপার। এলাহিগঞ্জের ইয়াকুব ছড়াদারের জানালায় চোখ রাখলে নদীর পাড়ে ঝুলন্ত নবাবী সৌধের ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে। চোখে পড়ে মহরমের রোশনী, ব্যারার আতস। পদ্মা পেরিয়ে চর ডিঙিয়ে ভাগীরথীর খেয়া টেনে তিন চার সন আগে মহরমের রাতে এলাহিগঞ্জের কাসীদের দলে রক্তাক্ত কোরেশী এসেছিল একদিন। কাশেম এসেছিল সকিনার কাছে। কোমরে ঘোড়ার ঝুনঝুনি ঘণ্টা-বাঁধা ভালবাসার অশ্ব-শক্তি পিয়াস-নামার স্বাদু পানি, ফোরাতের স্নিগ্ধ অশ্রুময় জল। বাপের লেখা জারীদারী গান। মর্সিয়ার বেদনা শোক-মাখা ছড়ার পয়ারে গুনগুনিয়ে উঠেছিল আশ্চর্য জলুয়া ( শুভ-দৃষ্টি )। সেই পয়ারের ছন্দের ঝাঁকিতে জীবন দোলে আদি কারবালার পিয়াসায়। সকিনা বাপ ইয়াকুবের ছড়ায় গানে ঝাঁকিতে মাতমে জীবনকে দেখতে পায়। কাশেম অবশ্যই কোরেশী ( কোরেশ বংশের জাতক )। জীবনের নয়া মাতম। ছুরি-গাছার পৃষ্ঠ-প্রহারের জখম, হৃদয়ের তলে তুমুল মার। আমার জলুয়া। হায় ! আমার ছাঁদনা হে ! আমার এয়োতি, আলমতলা ( ছাদনাতলা ) হে নবী। সকিনার মন গেয়ে উঠেছিল সেই রাতে। কী আশ্চর্য, আমারও নাম যে সকিনা ! কেমন করে ইতিহাস বই থেকে জীবনটা উঠে আসে বাস্তবের ভিটায় ? দু'টি নাম অব্দি ? সংসারে এমন ঘটে কিনা ইয়াকুব ছড়াদারও অবাক মানে। মেয়ের নাম সকিনা। ছেলে লালের নাম কাশেম। গায়ে শোকের গন্ধ। রক্ত-

মাথা রুমাল। ডেটল আর গুলাব-পানির মিকশ্চার, খুনের ঔষধি। গন্ধ নাকে এসে লাগে, লালের পিঠ ছুরি-গাছার মাতমে দাগা-মারা ছিন্ন। সেই গন্ধে বুক হুহু করে ওঠে, তৃষ্ণায় ফেটে যায়। শোকের আলোয় কামনার চিরাগ জ্বলে উঠেছিল সেই রাতে। আর আজ সেই চাঁদ ঢোল বাজাচ্ছে, পূর্ণিমার কাঁসি বাজছে যেন। শাদী। শাদী। বিহা। গায়ে হলুদের রাত।

ভাঙ্গা ঘরে হলুদ লাগাইলাম
হলুদ আমার জলদি হয়।
যে শহরে বাঁশি বাজে ভাইরে
সেই শহরে চলে যাই।

মনটা সত্যিই যেন কোথায় চলে যাচ্ছে সকিনার। মনে পড়ছে সেই রাতের কথা। উপুড় হয়ে চৌকিতে শুয়েছিল কাশেম। গুলাবপানির ভেজা তুলোয় পিঠের রক্ত মুছে দিয়েছিল, চিৎ করে বুকের লহুতে সেই তুলো টান দিতে দিতে মনে হয়েছিল, কোথাকার লাল কিসের ধাক্কায় আর কিসের টানে হেথায় এসে পড়ল আজ। দুই নয়নে কি মায়া গো। মাঝে মাঝে তুলোর টানেও কাতরাচ্ছিল কাশেম। অস্ফুট ক্ষীণ বেদনার ঝাঁকি মাঝে মাঝে। বারবার সকিনাকে দেখছিল কৌতূহল আর মুগ্ধতায়। তারপর সহসা কষ্টের চোটে কেমন কাতরানির ধাক্কায় সকিনাকে জাপ্টে ধরেছিল দুই ডানার গোঁড়া খামচে দু'হাতে। ইস্! কী সাংঘাতিক জোর। তারপরই লজ্জা পেয়েছিল কাশেম কোরেশী। সেই দৃশ্য মনে পড়লে এখনও শরমে রাঙিয়ে ওঠে সকিনা।

কিন্তু কিসের ধাক্কা সেটা? মানুষ কিনা বাতরাজ, ভাসমান কচুরি-পানা, স্রোতের ধাক্কায় ভেসে আসে। তাই কি? অমন বুঝানীতে মন শান্তি পায় না। বিয়ে তো করছি। কিন্তু কাকে? কে এই লোক? সত্যিই কি এতিম? নাকি একাত্তরের জয় বাংলার যুদ্ধে বদরবাহিনীর ঘেরা টোপে বাপ গেছে নিকেশ। এই ছেলে তো নশীপুরের জাতক। যুদ্ধের কতকাল আগে যেন ওরা পাকিস্তান চলে যায় এমন কথা নৈনিহাল সকিনাকে বলেছে। ওপারে গিয়ে ওরা মীর্জা থেকে কোরেশী হয়েছে, সে কথাও। যা হোক। কাশেম কি খুনে? কেন এপারে চলে এল একলা একলা?

—তুমি ওপারে যাবে না?

—না।

—কেন?

—আমাকে নফরত না করলে বলব সব কথা।

–বল!

—বদরবাহিনী ঠিক নয়। আমরা ছিলাম খান-সেনার লোক। উর্দু ছাড়তে পারছিলাম না বলে বাঙালি খুন করি।

—খুন করেছ ?

—আমি নই। বিশ্বাস কর, একিন কর সকিনা, আমি খুন করিনি।

—তবে চলে এলে কেন ?

—আমার বাপ তো খুন করেছে। ইসলিয়ে।

—খালি সেজন্যে ?

—হাঁ। ইসলিয়ে।

—কেন ?

—সে কথা বুঝবে না। সমঝনা মুশকিল হোগা।

—জানি।

—কি জানো ?

—তুমি খুন করেছ !

—এই লকেট ছুঁয়ে বলছি, খুন করিনি।

—লকেটের মধ্যে খোমেইনির ফটো লুকনো ?

—হাঁ।

—তাহলে ?

—তাহলে কী ?

—তোমাদের রক্ত খুব গরম কাশেম। প্রথম যেদিন দেখি, ভয় হয়েছিল।

—ঐ মাতম তো সুন্নীরাও করে। তোমার বাপ ছড়াদায়।

—সেটা নেশা।

—আমারও নেশা সকিনা।

—কিসের ?

—নিজেকে খুন করার, রক্ত ঝরানোর নেশা। খুন বহানা ইক নাশা হ্যায়, সিরফ নাশা।

—ঐ নেশায় কী পাও ?

—হজরতকে পাই, ফতিমাকে পাই। এজিদকে দেখতে পাই। তোমাকেও তো পেলাম ঐ লহুর নিশানায়।

—তাই বুঝি ?

—হাঁ বেগম। সহী বাত !

—কিন্তু এজিদ ?

খানিকক্ষণ অদ্ভুত দম ধরে থাকে কাশেম। তারপর ওর ঠোঁট আর কণ্ঠস্বর কেঁপে যায়। গলায় ডুকরানো স্ফুরণে কথা ছুটে বার হয়—আমি খুন করেছি সকিনা। আমার এক চাচাত ভাইকে খুন করে পালিয়ে এসেছি! কোন বাঙালি নয় গো। আপন জ্ঞাতি ভাই। ও আমার ব্রাদারকে নষ্ট করেছে।

রেপ করেছে সকিনা! আমার নামে ওপারে এন্দিন হুলিয়া ছেড়েছে পুলিস। আমাকে ঠাঁই দাও সকিনা।

—না। ছিঃ! তুমি খুনী? হায় খুদা!

ভয়ে ভুকরে ওঠে সকিনা। এই কথা শুনে সারা রাত ঘুমাতে পারে না। কিন্তু পিয়াসনামার তৃষ্ণা যে ভয়ানক কামুক! কারবালার যুদ্ধের গোড়ায় তো সেই নারী। জ্ঞাতি দ্বন্দ্বের নাম যে জিহাদ। বাপ তো সেই কথাই লেখে। এজিদকে বলে কমিনা। কাফের। কিন্তু কেন? স্বল্প শিক্ষিতা, মাধ্যমিক পড়া, সকিনার মাথায় ঢোকে না। মহরমের মাতমে কিসের অভিনয় করে শিয়াসুন্নীর দল?

বাহাত্তর শহীদের জারীদারী। সকিনার মর্সিয়া। আলম পাঞ্জার সোলা-কাগজের কারিগরি, কারবালার পুজো। দুলদুলির হাহাকার করা ফোটো। মঞ্জিল মাটির শোক। পাঞ্জা কি পাঁচ পঞ্জাতন? হাতের পাঞ্জা। কার পাঞ্জা? কাশেমের না আলির না রছুলের? দুলদুলির ঘোড়ার সাথে শূন্যে ভাসন্ত হাত, কাটা-হাত। পাঞ্জা। পাঁচ আঙুল। পাক-পাঞ্জা। ফতেমা জোহরা, নবী এবং খলিফা আলি আর তাঁর দুই পুত্র হোসেন হাসান। এঁরাই কি পাঁচ পঞ্জাতন? তারই ছাপ, মূর্তি'র বদলে কিছু চিহ্ন, যেমন তরবারি ও কাটা-হাত ইত্যাদি দিয়ে ঘরে ঘরে কারবালা সাজায় শিয়ারা। সব কাগজ আর সোলার কাজ। মক্কার কাবা ঘরের ফোটোও থাকে। ফতেমার দোলনা থাকে। তাঁর সংসারের সব গেরস্থির চিহ্ন শিল্পী তৈরী করে দেয়। দামে বিক্রি করে। মানুষ কেনে। তা দিয়ে মানত-পুজো হয়। ধূপ আর মোটা মোম পোড়ে সারা রাত। কাসীদ ছাড়ে না। গুলজার করে। কাসীদ হল সুন্নীরা। সংবাদ-বাহক। পিয়ন। তাদের আপ্যায়ন করে শিয়ারা। খিচুড়ি খাওয়ায়। ওদিকে ইমামবাড়ায় ফতেমার দোলনায় ফতেহা-সিনী, চিনির ঘোড়া আর পয়সা চড়ায় মানসা করা নরনারী। কাসীদ মারফত সেই মানতের দান গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে এসে পৌঁছায় মহরমের দশ তারিখ। মেলা বসে। ডালিতে ফতেহা বিক্রি হয়, অর্থাৎ চিনির ঘোড়া বিক্রি হয়। আলম পাঞ্জা বিক্রি হয়। ইত্যাদি বিক্রি হয়। বাপজান ইয়াকুব ছড়াদার নিজেই এক কাসীদ। যাক গে। কত কথা, কত কেচ্ছা। কিন্তু রক্তের নেশাটা কেমন ধারা ধন্দ যে দুলদুলি। কাশেম কোরেশী খুনী মা গো! মা ফতেমা, তোমার কাশেম তো খুনী ছিল না। হায় পুড়ামুখী সকিনা, এই তোর প্রেম? ফুলমন গাইছে ছেলে লালের মহিমে। ঢোলিয়া চাঁদের কাঁসি কাঁদছে আর তারই তাপে পুড়ে যাচ্ছে এলাহিগঞ্জের হলুদ-রাত্রি।

এ-গাঁয়ে রাঢ় আছে। ভড় আছে। বাগড়ী আছে। শিয়া কালচার আর সুন্নীর নবাবী আছে। ঘোড়া নাচও এসেছে মহরমীধারায় বা মহরমীধারায় এসে

যুক্ত হয়েছে। কে নেই? শ্মশান মেলাও বসে হর সন। ছড়াদার ইয়াকুবের অহংকার ঐ কাশেম কোরেশী। সে-ও যে এসেছে। আজ রাতে দামাদ হবে সেই রাজশাহীর পোনা। গত হপ্তায় মহরম শেষ হয়েছে। চালশে আসছে সামনে। তখনও জারি মর্সিয়া বাঁধতে হবে তকে। সারা বছরই বাঁধে। আর এরপর থেকে দামাদ নাচবে, গাইবে। ছুরি মারবে বুকের পাটায়, পিঠের গড়ানে। শিয়াসুন্নীর বিভেদ কি ভাল হে ছড়াদার? ইয়াকুব মনে মনে বলল—না বাপজী। শুনছি সেই কথা। নখনুতে (লখনৌ) কি আরব-দেহাজে নাকি এ-পাড়া ও-পাড়া বিবাদ। লাঙলের ফাল কুটাতে গেলে ও-পাড়ায় যেতে শিয়া সাজায় জুলুস, লাঠিসোটা চাল, সুন্নীরও সেই তৈয়ারী। কামারের কাছে ফাল কুটাতে এত দূর বিনাশী বহর বাপজী। ভাল লয় সোনা। সামান্য ফাল-ফলা, তলোয়ার তো লয় হে মনুষ্য! হায় রে!

কিন্তু লোকটা যে খুনী বা'জান। ঐ যে দ্যাখো, চোখ মুদে কেমন বুঁদ হয়ে ঢুলছে, গায়ে চাদর ঢাকা জোয়ান লাশ। নিজের রক্ত-ঝরানো নেশা ওর, ছুরি-গাছে পিঠবুক ঘায়েল করা খুনী। গায়ে এখনও ওর মরণের বাস ছুটছে, শোকের ছায়ামাখা ওটা কে। সকিনা ডুকরে অস্ফুট কেঁদে ওঠে একা। সে-এক আশ্চর্য কান্নার গলন।

২

নৈনিহাল কথার অর্থ নানীর বাড়ি। অর্থাৎ নানীর বাড়িতে জন্ম হওয়া আর বেড়ে-ওঠা থেকেই ঐ নাম। নশীপুরের রাজবাড়ির কাছে নৈনিহালের বাপের নবাবী গেরস্তি। সেই বাড়ি এখন ভেঙে পড়ে আছে। পেটের দুঃখে শিন্নারা বাড়ির ইট বেচে খায়। কথাটার চল আছে লালবাগের মাটিতে। নৈনিহালের বাপ শ্বশুরালে আছেন, সেখানেই নৈনিহাল জন্মেছে, বাংলা শিখেছে, সুন্নীবাচ্চার মতন পড়াশুনো, তাদেরই মতন পুলিসে চাকুরি। যারা বাঙালি হয়নি, তারা নবাবী পোলাও খেতে ঘরের ইট বেচবে বৈকি! সে কথা কাশেমের বাপ বোঝেনি। ও-পারে পালিয়ে, নবাব হয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু বাঁচেনি। যাক গে।

একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে কাশেম সেটা মোচন করে ভাবে, হোমগার্ডেও যদি একটা চাকুরী করে দেয় নৈনিহাল, জিন্দেগিটা খানিক থিতু হওয়ার জো পায়। নৈনিহাল কী করবে? পেছনে হুলিয়া, সামনে ফোরাত নদীর অববাহিকা। আর সকিনার নাকের নোলক। চাঁদের আলোয় ঝিলিক দেয়। এই ঝিলিক শব্দে ওপারের জনৈক রাজবংশী গাইয়ের গান ভাসে স্মৃতির তলায়।

'ঠিকানা তার পাই যদি ঠিক চিনব তারে দেখেই ঝিলিক।' আহা! ঝিলিক শব্দেই যেন জোছনা ঠিকরোয়। যেন সকিনার নোলক বুঝিবা। সেই ঝিলিক

এখন ঝাপসা দেখায় কেন ? চাঁদের গায়ে কুয়াশা জড়িয়ে যাচ্ছে কেন ? আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন ? কাশেম ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। শীত করছে। কাশেম ঢুলছে। বাঁ বুকের উপর খাদালো গহর, তুলো গোঁজা। হাড় আঁকড়ে ধরেছিল ছুরির গোছা থেকে বাঁকা দাঁত। কী হবে ? আমি কি মরে যাব ? কাশেম সহসা হিক্কা তোলে দুবার। ভয় পায়। সকিনা কিছুই জানতে পারে না। চোখের উপর রাস্তার জুলুস বইতে থাকে গত হপ্তার। লাঠি খেলেছিল কাশেম। নৈনিহাল বলেছিল, অর্থাৎ মন্তব্য করেছিল শিয়ারা লাঠি খেলে না। মাতম করে। মর্সিয়া গায়। কালো পোশাক পরে। মহরম মাসে খালি পায়ে হাঁটে। এই মাসে বিয়ে শাদী করে না। তুই কি সুন্নীর বাচ্চা রে কাশিম ? সন্দ হয়, তুই কোরেশী না। তুই ভড়ের বাঙাল। নশীপুরের ছেলে বলেছিলি, এখন দেখছি সেইড়ে ঝুঠবাত। তুই রাঙা জামা পিঁদেছিস, পাট্টা পাজামা, পায়ে সস্তা নাগরা, গলায় বেঁধেছিস রঙিলা রুমাল, আহা ! পারিস তো গা কেটে দেখা, তুই শিয়ার ঝাড়। মাতম দে উন্নত। মাতম দে। শালা শোগে মরে না ভোগে মরে, বাপোৎ সুন্নীর পোনা ! মহরম মাসে শাদীর আলমতলায় গাঁট বাঁধবি শালা। আমি ঘোড়া নাচব বলেছিলাম, দুলদুলির নাচ, তোর শাদীর বাসরে, ছেঃ ! আমি থুতু মারি তোর ইয়েতে ! শালা হুলিয়াবাজ এজিদ। লাগা লাগা, লাঠি খেলে যা, কী করবি দোস্ত ! দুঃখু হয় ! ...

শুনতে শুনতে ক্ষেপে ওঠে কাশেম কোরেশী। সে কিনা এজিদ ! হুলিয়াবাজ ! কিন্তু কাশেম তো কোন জয়নবকে ছিনিয়ে নিতে চাইছে না। জয়নব ছিল জব্বারের ( আব্দুল জব্বার ) বউ। ভারি সুন্দরী। এত তার রূপ যে এজিদ মহাপাতক, তাকে ভোগ করবার লালসায় টাকা আর আপন বোন সালেহার সাথে শাদী দেওয়ার লোভ দেখিয়ে জব্বারকে বশ করেছিল, জয়নবকে তালাক করিয়ে নেয়। পরে জয়নবের কাছে মসলেম নামক কাসীদের মারফত বিয়ের প্রস্তাব পাঠায় পত্র লিখে। পথে দেখা হয় আক্কাশের সাথে। সে-ও জয়নবকে বিয়ে করতে চায়। সে-ও মসলেমকে বিয়ের প্রস্তাব লিখে পত্র দেয়। পথে দেখা ইমাম হাসানের সাথেও। তিনিও জয়নবকে বিয়ে করতে চান। পত্র লিখে মসলেমের হাতে গুজে দেন। ভারি এক পাল্লাদারী ঘটনা। বেহেস্তের লোভে নবীর নাতীকে জয়নব বরণ করে নেয়। এজিদ যায় ক্ষেপে। ময়মনা কুটনী দাসীকে হাত করে হীরে চূর্ণ বিষ পাঠায় ইমামের বাড়ি। ময়মনা ইমামের বউয়ের হাত দিয়ে শরবতে মেশানো জহর ইমামকে খাইয়ে মেরে ফেলে। তারপরই তো হোসেন আলির সাথে কারবালার যুদ্ধ। এখন জুলুসে সেই কথা মনে পড়ে কাশেমের। সকিনা তো জয়নব নয়। আমি কি এজিদের মতন লোভী ? ভাবতে ভাবতে উত্তেজিত হয় কাশেম।

কী লজ্জা দিচ্ছে দোস্ত। এই মহরম কি নারী-ঘটিত? আমার লাঠি-খেলা কি সাকিনার কাছে হিরো সাজা? ভাই নৈনিহাল, তুমি পার না ব'লেই হিংসে করছ। ঐ দ্যাখো সকিনা আমার বানা পাটার বিজলিঘাত দেখে কেমন বুক ফুলিয়ে মঞ্জিল মাটিতে যাচ্ছে। (কবর দিতে যাওয়া গোর-পর্ব। ঐদিন শিয়ারা নকল কবর দেওয়ার অভিনয় করে, যেন কারবালার যুদ্ধে হত শহীদদের কবর দিচ্ছে। প্রতীকী সোলা-কাগজের কারুকাজগুলিই কবরে পুঁতে দেয় তারা। এই কবর-অনুষ্ঠানকেই মঞ্জিল-মাটি বলে। সুন্নীরাও শিয়াদের পশ্চাত অনুসরণ করে লাঠি খেলতে খেলতে। শোকাহত সেই অবস্থা অভিনয়যোগ্য বলেই মহরম এত রক্তাক্ত ও বীরোচিত উল্লাসে ও শোকের বিকারে অদ্ভুত!) শোকের মিশেলে গর্বের দানা হে দোস্ত! তবু যখন অমন নফরত দাও, শিয়ার শিলশিলা নিয়ে কথা তোলো। বেশ। মাতম হোক। লহু ঝরিয়ে দেখাতে পারি কোরেশ বংশ আমার কউম। বাপ বাঙালি মেরেছে, আমি তেমন লেখাপড়া শিখিনি। ভিটে-খাকী ছোকরা, ইট বেচে নবাবী করত বাপদাদা। হোমগার্ডের চাকরিও কপালে জুটবে না। তুমি গোরা পুলিশ। আমি ফেরার। আমার এই লহুর তাকত ছাড়া কীইবা আছে সাকিনাকে দেখানোর, আমি তো কালো সৈয়দ। আমি আমার লাভারের মোহে খুন অব্দি করেছি। আমি সব পারি।

ভাবতে ভাবতে একটা ঝটকা টানে চলতি মর্সিয়া গায়কের হাত থেকে ছোরার জঞ্জীর ছিনিয়ে নেয়। সামান্য ঘাড় নিচু করে পিঠে বসিয়ে দেয় ছুরি-গাছার তীব্র ঝনাৎ। বুক চিতিয়ে মারে ছুরির যেন জহর মেশানো জঞ্জীর। নৈনিহাল খুশিতে ডগমগায়, মুখে স্ফুর্তির উলাস। বাহবা। বাহা। লাগাও দোস্ত! দেখি তোমার শিলশিলার জোর। ভাই তুমি নশীপুরী শিয়া। আলি-মওলা হোসেন-অলার জাত! বাহবা রে ভেইয়া, চমৎকার! ('লেখা-পড়া শিখলি না রে ভিতর অন্ধকার' লোক-গানের ভাঙ্গা কলি।) তাই তো ফেরার। হে মোমিন! বাহবা। বাহা! মুরোদ নেই যে একটা টিউশনি করে খাবি। তোকে আমি সাকিনার হোমগার্ড করে দেবো। মাগ আগলাবি। বাহবা। বাহা। হাহা!

শুনতে শুনতে কাশেম কোরেশী হিক্কে তুলে আদিম গলায় ঝাঁকি মেরে ওঠে—হায় রববানা। লে লহু, মা ফতিমা! জহরে কহরে ম'লো তোর পোলাপান। লে রাক্ষুসী খা।

গা গলিয়ে খেজুর রসের মতন গাঢ় রক্ত চুঁইছে। গোপালজল ছুঁড়ে মারছে কেউ। লে লে দুখুয়া, জারীমর্সিয়ায় পাগল, নিজেকে খতম করে দেখা তুই কোন্ বাপের লাল। কী আছে দোস্ত, এই জিন্দেগী ফুঁকে দিলেইবা কী হয়?

কে দেখে? সকিনা কি দেখে? ঐ তো চলে যাচ্ছে ঘাড় গঁুজে। ফিরেও চাইছে না।

এ-কেমন কাফেরার দেশ গো। জহর মিলে পানি মিলে না।

সুন্নীদের জারী-কণ্ঠ পেছনে শোনা যায় ভাসছে। কাশেমের তেষ্টা পায়। ধীরে ধীরে জুলুস ভাগীরথীর মঞ্জিল মাটির গোরস্তানের দিকে এগিয়ে যায়। তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে যায় কাশেমের। দোস্তকে বলে—এক ফোঁটা পানি দোস্ত, আর পারছি না।

—এই জুলুসে পানি কোথায় দোস্ত। তিয়াসা লাগলেও পানি তো পাবে না। পানি হারাম।

—না। আমাকে এক জরা দাও নৈনিহাল।

—পাবে না। এ হ'ল মরুভুমি। সামনে ফোরাত। চলো।

—জুলুসের মানুষ তো কাফের নয় নৈনিহাল।

—কে বলেছে কাফের নয়। এই জুলুসে সব আছে। সব রকম। এখন আমরা কুফা নগরী পার হচ্ছি ভাই। এই যে লাঠি খেলা খেলছে সুন্নীরা, দ্যাখো দ্যাখো। কার সাথে কার খেলা বল তো? কে এজিদ আর কে হোসেন লেখাজোখা আছে?

—পানি দাও ভাই নৈনিহাল, ছোরা চালাতে পারছি না।

—শহীদের দর্জা কি সহজ? চালাও। সামনে তো ইউফ্রেটিস টাইগ্রিস। হা হা। হেসে ওঠে নৈনিহাল মীর্জা। সেই হাসি কী বিষাক্ত। সকিনা কিছুই দেখছে না।

কাশেম কাতরায়—তাহলে দেবে না।

গম্ভীর ভারি জবাব—না।

—বেশ, তবে তাই হোক!

বুকের কারবালায় সহসা তৃষ্ণার্ত ঘোড়ার চিৎকার শুনতে পায় কাশেম। কাশেম কোরেশী ভয়ানক ক্রুদ্ধ মাতাল হয়ে ওঠে। রক্তের নেশা ফুঁসে ওঠে। দেখতে পায় যে-লোকটা ওপারে খুন করেছে, সে কী ভয়াল মূর্তিতে ভেতরে ভেতরে জাগছে। গাছা মারে বেদম দিশেহীন। নৈনিহাল বাহবা দেয়ঃ সহসা বেকায়দার প্রহারে ছোরা আটকে যায়। প্রবল বেগে টানতে থাকে কাশেম, টানাটানি চলতে থাকে। নৈনিহাল হাত লাগায়। মুখে সেই মজাদার বিদ্রূপের ভাষা—ইইফ্রেটিস, টাইগ্রিস। টানে আর বলে—ইউফ্রেটিস! টাইগ্রিস! হা হা! গিয়েছে তুমি চাঁদ! শহীদের দরজা কি সহজ ভাই।

তখনও সকিনা পিছন ফিরে দেখে না। জুলুসের অন্য প্রান্তে কচুরিপানার মতন সরে গেছে। মানুষ তো পানা বৈ না! কোথায় যেন ভেসে যাচ্ছে

কাশেম। মাথা ঘুরে বসে পড়ে জুলুসের নিচে। ওকে হাসপাতালে তুলে আনা হয়।…

ইউফ্রেটিস! টাইগ্রিস! কী চমৎকার নাম। মোমিন বান্দা যেমন জেকের (নামজপ) টানে, সে হল দমের কাজ। টানতে 'আল্লা' ফেলতে 'হু'—আল্লাহ। তেমনি ইউফ্রেটিস। টানতে। টাইগ্রিস। ফেলতে। জনম আর মরণ। ভারি মধুর এই দম তোলা আর ফেলা। এখন সেই খেলা খেলছে কাশেম কোরেশী। মনে পড়ছে নৈনিহাল এমন এক মোচড় দিয়ে বুকের হাড়ে গাঁথা ছোরা টেনেছিল যে তখনই আজরাইলের ভয়াল তৃষ্ণার্ত দুটি চোখ চকিতে ভেসে ওঠে মাথার মধ্যে। বুকের মধ্যে ফোরাতের (ইউফ্রেটিস টাইগ্রিস) দু'কুলপ্লাবী জল। ছোঁয়া যায় না। জীবনের তাড়া খেয়ে প্রেমের কারবালায় মানুষ কি এমনি করে পোঁছায়! ভুল পথে। ভুল ঘোড়ায়। হোসেন তাই পোঁছেছিলেন। সব কেমন ঝাপসা হয়ে আসে। কার সাথে কার খেলা? বলেছিল দোস্ত। এ-যে ভাই নিজেরই সাথে নিজের। মনে মনে বিড়বিড় করে কোরেশী। মনে হয় ভুল এক সকিনাকে দেখছে কাশেম।

৩

এবার জলুয়া। শুভ-দৃষ্টি। আলমতলার গাঁট-ছড়া। কখন সেই ভোরে। নৈনিহাল দুলদুলি সেজে এসেছে। কথা নয়। তবু এসে পড়ল।

নাচছে উঠোন জুড়ে নৈনিহাল। একদল জারীর লোকও জুটেছে। তাদের দেখে মেয়েদের ঢোল থেমে যায়। ইয়াকুব ছড়াদারকে দলের ভেতর থেকে কে একজন আহ্বান করে, এসো বাপজী। ধরো গান।

ইয়াকুব ছড়াদার আপত্তি করে বলে—আজ বাছা শোগতাপের দিন নয়। আজ হাসিখুশীর রাত। মেয়েরাই করুক। ঢোলের তালে নৈনিহাল নাচ করুক বাহির উঠানে। তোমারা গোল করো না।

কে একজন মানা শোনে না। বাহির উঠোনেও যায় না। সুর ধরে এবং সেটা জারী নয়, মর্সিয়ার তান:

কারাবালাতে কাঁদছে বসে কাঁদছে বিবি সকিনা।
খালি দুলদুল দেখে তাহার কাঁদন থামে না।

সকিনা চমকে ওঠে। বুক শিরশির করে ওঠে, সে কি! আমি কাঁদব কেন? এই দুলদুল কে? ঐ তো কাসীদ বটে। ইয়াকুবের ছড়ায় ঘোড়া কথা বলে। কারবালা থেকে খবর বহে আনে। সকিনা আপন-ঘরে কারবালা সাজিয়ে বিলাপ করে। ইতিহাসে কি এমনই ঘটেছিল? কী খবর এনেছে নৈনিহাল? আজ কাঁদন কিসের বাজনা। ভোরে হবে জলুয়া। আলমতলা তৈরি। এমন কেন করে নৈনিহাল? কী ঢঙিলা ছেলে বাবা।

৮

আবার টুকরো সুর ছুঁড়ে দেয় ছেলেরা। নৈনিহাল ওদের সাথে করে এনেছে হয়ত। এবার মর্সিয়া নয়। জারীর দানা। শহীদনামার গান।

বনে কাঁদে বনের পশু গো
পাখি কাঁদে বিলে। ওরে দুনিয়াজাস
কাঁদে সব
হোসেন হোসেন বলে গো! (ইয়াকুবের রচিত ছড়া)।

ইয়াকুব ছড়াদার বিরক্ত হয়ে ধমক দেয়—থামবে তোমরা? মেয়েদের গাইতে দাও বাছারা।

ফুলমনি ঢোলে টোনার সোহাগী হাত ফেরায়। তখনও একজন টুকরো জারীর ছুটকলি গেয়ে ওঠে:

বেদের খাঁচায় প'লে পাখি-উচ্চস্বরে কাঁদে,
কারবালাতে গিয়ে কাশেম পড়ে গেল ফাঁদে।

সকিনার বলতে ইচ্ছে করে চেঁচিয়ে—থামো নৈনিহাল, অমন করছ কেন? কী দোষ করেছি আমি? স্কুলের ছেলেরা আমাকে চিঠি লিখে বিরক্ত করত, মাস্টারজীকে সেই চিঠি দাখিল করি একবার। তারপর একটা ছেলের খুব কড়া শাস্তি হয়। ফলে স্কুল ছেড়ে চলে আসি। মাধ্যমিক দিয়েছি বাড়িতে পড়ে। কত সাধ ছিল আরো পড়ব। হল না। দেহে রূপ থাকলে চাষীঘরে মুসলমানের বিদ্যে ঢোকে না। রূপ যে পথ আটকায় নৈনিহাল। আজ, তুমি কী চাও হে নবাব? অমন কেন করো?

তৃষ্ণার্ত চোখে কাশেমকে খুঁজতে থাকে সকিনা। ও এখন কেমন আছে?

আবার টুকরো মর্সিয়া:

কাল হয়েছে আমার সাদী ওগো রাম্বানা,
হাতে আমার রইল দেখ বিহের কাঁগনা।
বিহের কাঁগনা ফেলে দিল হাতে রাখল না,
তেল হলুদ গায়ে মাখা রেখা উঠল না।
বলি হায় হোসেনা।

ইউফ্রেটিস! টাইগ্রিস!

ঝেঁকে উঠল যুগল শব্দে নেশাতুর নৈনিহাল। শব্দ-জোড়ে কী মজা পেয়েছে নিজেও জানে না। মিলিটারি প্যারেডের মতন কাকে যেন হাঁকছে সে। কাশেমের গায়ে মরণের বাস ছুটছে। বুকের গহ্বরে রাঙিয়ে উঠেছে তুলো। মৃত্যু তাকে চারিদিক থেকে জারীর দোহারের মতন গোল করে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। সে আচ্ছন্নতা কাটিয়ে নিজেকে সামলে উঠে দাঁড়ায়। পা টলে। চাদরখানা গায়ে ভাল করে জড়িয়ে নেয়। হাতে-ধরা চাদর-ঢাকা ধারালো হাত-ছোরা। বারবার সে মৃত্যুকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছিল।

কিন্তু নৈনিহাল তাকে মৃত বলে ধরে নিয়েই দাপাচ্ছে। বারবার বোঝাতে চাইছে, কাশেম মরে গেছে। কিন্তু দুনিয়া তো জানবে না, কাশেম কেন মরে গেল, সেটা জানান দেওয়া দরকার। কাশেমকে উঠতে দেখে কেমন সন্দেহে সকিনা দ্রুত ছুটে আসে। নৈনিহাল স্থির। সবাই থেমে পড়েছে। কথা নেই। গান নেই। কেবল চাঁদের হাসি তীব্র কাঁসির গলায় বাজছে আকাশে।

কাশেম কিন্তু পারে না। ছোরা তুলে ধরে। হাত-শূন্যে থেমে যায়। গড়িয়ে পড়ে উঠোনে। মেহদি রাঙা সকিনার হাত সেই ছোরা ধরে ফেলে। কাশেমের চোখ পলকহীন। উঠোনে কাত হয়ে শুয়ে থাকে। সবাই দেখছে কাশেম শুয়ে আছে। উঠছে না। চোখের পলক ফেলছে না। তাহলে? রাত্রেই কবর খোঁড়া হয়। মাটি হয়। আকাশের চাঁদ ডুবে যায়। ভোরে আলমতলায় গাঁটছড়া বাঁধা হয়। দুজনে শুভদৃষ্টি হয়। কলমা পড়া হয়। কাশেম শহীদ হয়।

ঘরে নৈনিহাল সকিনাকে বলে—সামান্য ছড়ে গেলেই টিটেনাস হয়, দোস্ত তো বুকে গাবলা ফেলেছিল! খুনের নেশায় পাগল না হলে আমাকে কাটতে আসে? কী বল, তুমি? কিন্তু কী অবাক কাণ্ড। কবরে শোয়ানোর পরও মনে হচ্ছিল দোস্ত আমার বেঁচে আছে। গা গরম!

—গা গরম? দেখেছ তুমি? আঁতকে প্রশ্ন করে সকিনা।

—হ্যাঁ। জবাব দেয় নৈনিহাল।

সকিনার চোখে অশ্রু ঘনিয়ে ওঠে। সারা গা সৌন্দর্যে ঝলমল করে। পাশের ঘরে ফুলমনের ঢোকেল বেজে ওঠে। সকিনার মনে হয় কাশেম মরেনি। তাই তো ফুলমন গাইছে ঃ

কাঁচা সোনা পাকা সোনা ছিল আঁচলে।
হারিয়ে গেল আমার শপেরই তলে।

সকিনা ভাবে, তাহলে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। তারপর ফুলমন গাইছে ঃ

সাগর দীঘির ইস্টিশনে ছেলে লালের সঙ্গে দেখা হয়।
আজিমগঞ্জ ইস্টিশনে ছেলে লালের সঙ্গে দেখা হয়।
বহরমপুর ইস্টিশনে ছেলে লালের সঙ্গে দেখা হয়।
পাকিস্তানের বর্ডারে ছেলে লালের সঙ্গে দেখা হয়।

কারণ কাশেম ছিল ফেরারী।

———

# কান্নার কল

মা রি মা

ধান দিবে কি

পাতান দিবে।

দিবেই কি না? (মৃতের বাড়িতে গ্রাম্য কান্নাদার নারীর প্রতি বিদ্রূপাত্মক ধুয়া। লোক-চলিত ঠাট্টা।)

সেটা একটা কুপক্ষী, সেটাকে চিনতে পারে সতী। গায়ের রঙ কালো-নীলে মেশানো, কৃষ্ণের মতন মাজা কালোর সঙ্গে গাঢ় নীল। এই ধরণের কাকগুলি মৃত্যুর খবর বহে আনে! সেই সময় আকাশের নীচে মাটির উপর থাকে কুণ্ডলি পাকানো অদ্ভুত কুয়াশা, দলা দলা কুয়াশায় পথ আচ্ছন্ন থাকে। সেই কুয়াশাও নীল আর সাদা। সাদার সঙ্গে নীল মাখামাখি হয়। সামান্য সামান্য পাক খেয়ে পথের উপর নড়াচড়া করে, সেই নীল আর সাদার ভিতর দিয়ে কুপক্ষীটা উড়ে আসে, তাকে দেখলেই চেনা যায় শমন এসেছে। এই যে কুয়াশার সমাচ্ছন্নতার ভিতর কাক উড়ছে, কাকটা খা খা করে, ভয়ানক সেই আর্ত-ডাক, অস্বাভাবিক সেই কান্না। শুনলেই বোঝা যায় একটা সঠিক মরণের কথা ঘোষণা করছে সে। অনড় না-ছোড় মৃত্যু ছাড়া কাক অমন করে ডাকবে না।

আজও সেই রকমই একটা নীল কাককে দেখতে পায় সতী। কুয়াশার গ্রাম্য নাম মোহ বা মোহ্যা। মউ থেকে মোহ। আকাশী মধু। আসমানী মৌ। গা-চিটেল সেই মোহ-কুণ্ডলির ভিতর সেই কুপক্ষী উড়ছে। সতী

দেখতে পায় মোহ্যার ভারী পর্দা ভেদ করে ভোর ফুটে উঠতে পারছে না। গায়ের কাপড় চট চট করছে মোহ্যার জলীয় স্বভাবে। মাথার উপর নীল পাখি মুহূর্তে শাঁ করে পাখা ঝাপটে চলে যায়। হাত নেড়ে পাখিটাকে তাড়াতে চেষ্টা করে সতী, হা-হুস্ করে। তখন পাখি গা মেরে সামান্য অন্যদিকে গিয়ে সিধে হয়, কাত ডানা ঠিকঠাক মেলে নেয়, দ্রুত কোথায় মিলিয়ে যায়।

সতী গিয়েছিল লগড়াজল। তিনক্রোশী ধূলি-পথ পায়ের তলায় মেরে এনেছে প্রায়। ভোর-রাতে লগড়াজলের মিঞাবাড়ি থেকে এক প্রকার নিঃশব্দে সে পালিয়েই এল বলা যায়। মিঞা-গিন্নিকে জানান করে 'যাই মা' বললে সতী আটক হয়ে যেত চোখের পানিতে। গিন্নি-মা পাগলের মতন তাকে জড়িয়ে ধরত, ডুকরে উঠত যাসনি সতী। যাসনি বহিন।

কেন বলত? না, মানুষ একলা কাঁদতে পারে না। একলা কান্না করা আরো কষ্টের। সতী থাকলে, গিন্নি এক সঙ্গে কাঁদবে, গিন্নির সঙ্গে সতী কাঁদুক। আর সেইজন্যই তিনক্রোশী পথ ডিঙিয়ে লগড়াজল গিয়েছিল সতী।

সতীর সেই রকমই জীবনের যাতায়াত। কোথায় কখন মানুষ মরে সতী খোঁজ পায়। তার একটা নীল কুপক্ষীও মোতায়েন আছে। সেই পাখিটাও খবর বহে আনে।

মুসলমানের সম্বন্ধ ডালে-পালায় পাতায়-লতায় শেকড়ে-বাকলে। খুঁজে বার করতে পারলে সবাই আপনার নিকটজন জ্ঞাতি-গুষ্টি, সেই সম্বন্ধের জট জড়িময় তল্লাশি করলেই একটা সূত্র মেলে। হিন্দুদের বেলা তেমন হবার জো নেই। ওরা সব আপন আপন একলা একলা, খুব খাটো করে সম্বন্ধ চায়, বেশি দূর যেতে চায় না। মুসলমানেরা অমুকের তমুকে কথাটায় গুরুত্ব দেয়, সেটাই বাঁচোয়া যে পর মনে করে না। আর তখন ওরে আমার ভাইজান গো, বাপ গো, ফুপা, মামু গো বলে কাঁদা যায়, চোখ-ভাসানি কান্নায় আপ্লুত হতে পারে সতী। সতীর শরীরে আছে জলরেণু কোষ, তা দিয়ে বানানো দেহ বড়ই দুঃখী। জন্ম-অভাগী এই মেয়ের চোখের পেছনে কোন একটা অদৃশ্য গহিন ঝোরা-কুম (ক্ষুদ্র জলাশয়) স্থাপন করেছেন আল্লাতালা। অন্যের জন্য কাঁদবার অনায়াস ক্ষমতা সেই অফুরান অশ্রুরাশি জোগান দেয় বলেই না সতী টিঁকে আছে। চোখের জল যে শুধুমাত্র একটা অভ্যাস, সেকথা মানুষ বোঝে না। বোঝে না বলাও ভুল। সতীর চোখের পানি মানুষের কাছে মহার্ঘ নয়। আক্রা নয়। সামান্য পেট-ভরায় কতজনের বাড়িতে স্বেচ্ছায় মৃত্যুর জন্য কেঁদে আসে সে। কিন্তু সেকথা মুখে কখনও উচ্চারণ করতে নেই. এমনিতেই আমচান (রামচন্দ্র) পুরে গত সন মুন্সীবাড়ি কাঁদতে গিয়ে আলম মুন্সী, বাড়ির মুরুব্বি, ওকে 'কান্নার কল' বলে ঠাট্টা করেছিল, সে কথা সতী ভুলতে

পারে না। কান্নার কল বলাটা যে কান্নারই অপমান। অথচ জোয়ান ছেলে মরার শোক তো বাতুল নয়, দামী জিনিস, সে যে কী ধারা হুতোশ, কেমন একটা ধাধোশে মানুষ কাঠ-মেরে থাকে, কাঁদতে পারে না, সেকথা মুন্সী-বউ ছাড়া লোকে তো বোঝেনি। সতীর চোখে কান্নার পানি আর গলার সহসা বেগ ধরা কান্নার আছাড়ি পিছাড়ি তীব্র ফিনিক দেখেই না মুন্সী বউ কেঁদে উঠতে পেরেছিল, নইলে বেচারি বাঁচত কি করে, দম আটকে, শোকের চাপে, কলিজা ফেটে মারা পড়ত। এত সত্ত্বেও বুড়ো লোকটি তাকে কান্নার কল বলে টিপ্পনি করেছে,—এতই আহাম্মক! মানুষ যে কী নিষ্ঠুর হয়! তা কতজন কত রকম বলে। নলবাটার করীম মিঞা তাকে বলেছিল জমজমার পানি (আব-এ জমজম)। বলেছিল, বিটির চোখের পানি শস্তা লয় গো। সে কথাও ঠাট্টা হতে পারে, সুনামও হতে পারে। জমজম তো জঙ্গল-মরু পাষাণের কুম। মরু ফোয়ারা। কোন এক নবীজীর পায়ের ঘাত লেগে সেই জমজমা তৈরী হয়েছিল। নবী তখন এতটুকুন জাতক, সামান্য মাংস-পিণ্ড, সদ্য বিয়োনো ছানা, ছাতি-ফাটানো তেষ্টার পানি তেনার তুলতুলে পায়ের ধাক্কায় মরুতল থেকে পিচকারি দিয়ে জাগল, সেই বেত্তান্ত বড়ই সুবচন, চারুমৌলবী কেচ্ছা করে মিলাদের রাতে, শুনেছে সতী। পাকসাফ তেমন পানি চোখের নিচে লুকনো থাকলে নিজেকে ধন্য ধন্য করে অভাগী সতী। সেকথায় ঠাট্টাও আছে, যশও আছে। জমজম হল বলেই না পোয়াতির মুখে দু'ফোঁটা পানি জুটল। সেই পানি কে জোগাত তখন? মানুষ তো বোঝে না, কান্না কত কঠিন। কাঁদতে কাদতে ভয়ানক খিদে পায়। মানুষ কেঁদে দেখলে জানতে পারবে, সেটা কতখানি খাটুনির কাম। পেট-পিঠ লেগে যায়, কোমর টনটনায়, বুকে ব্যথা হয়। আবার সবসময় কাঁদাও যায় না।

সেই কথা ভাবতে ভাবতে ফের আকাশের দিকে চোখ তোলে সতী। পুব-পারে গাঢ় কুয়াশার হৃদয়ে রাঙা আভা খুবই ক্ষীণ। এত ক্ষীণ যে বোঝাই যায় না সূর্য সত্যিই উঠবে কিনা। কাকটা আবার উড়ে আসছে। খা খা তীব্রতা গলায় আরো স্পষ্ট করছে কাক, নীল পক্ষি। কৃষ্ণরাঙা কুপক্ষী একটা। মরণের প্রচারক, বক্তা। আজরাইলের মাইম। এইসব কথা ভাবতে ভাবতে পথ ভাঙে সতী। বানু না বেওয়া, সেকথাও স্থির নাই। আধোবাধো তালাক তার হয়েছে, ফের একধারা স্বামীসঙ্গও আছে। স্বামী এখন বলে, তালাক সে করেনি, কিন্তু সে-কথা মিছা। অন্তর জানে, লোকটা আসলে ভয়ানক কুট। খেতে পরতে দেবে না, কিন্তু সতীর তলপেটে ডিম পাড়বে, বিছন ফেলবে, পাউলি পুঁতবে, সব দায় সতীর চোখের জলের। যত দুঃখ বাড়ে, কান্নায় ততই শস্তা হয়ে আসে। সে-কথাও মরদ মিনসেরা বুঝল না কখনও। আর মাগীরা তো জটিলা-কুটিলা, কাঁদিয়ে নেয়, আর মনে করে

আবাগীর ঝি কাঁদতেই জন্মেছে, ওইটাই পেশা। হায় খুদাতালা, এই কি জিন্দেগানী!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ মোছে সতী, চোখে জল নেই, কী আশ্চর্য লগড়া-জলে সব জল নিষ্কাশিত হয়েছে, জমজমা খালি। গলার তলায় অদ্ভুত শুকনো ক্ষীণ আর্তনাদ করে সতী, মুখে বলে—আসছি সুনা, বাপধন! থাকো, থাকো। দুদণ্ড স্থির হও। হা-হুস। পালা, পালা!

পাখি তাড়ায় সতী আর মনে পড়ে কোলের বাচ্চার গায়ে জ্বর, সিঁদুরা খাতুনের কাছে রেখে তাকে লগড়াজল যেতে হয়েছিল। বড় দুটি বাচ্চা গেরস্তর আঙিনেয় চরে খায়, কোলেরটাকে নিয়েই ভাবনা। অবশ্য বড় দুটির প্যাণ্ট-পিরহান সতীকেই জোগাতে হয়। সবই করতে হয় কান্নার বিনিময়ে, আর রাতে শুকনো স্বামীর হুড়ো সামলাতে হয় ঘরের ঝাঁপবন্দী ঠেকনোয়। পারে না সতী। মনে হয় সে-ও এক বেবুশ্যার জেবন। স্বামী তার আগলদার, নইলে গাঁয়ের কামুক পাবলিক ছিঁড়ে খেত। স্বামীর তরফে সেটাই এক মন-বুঝানি যুক্তি বটে।

স্বামী তার দায়হীন নির্জলা ভবঘুরে মেঘ। বাংলাদেশ পালিয়ে গিয়ে একটা কয়রা বিড়ি-বাঁধনী মাগীকে ধরে এনে কাছারিপাড়ায় ঘর তুলেছে। বিড়ির ধুঁয়োয় যখন কাশাকাশি করে, তখন বুকের খাঁচায় হৃৎপিণ্ড ওঠে নামে। ধুমল পিণ্ডটা দেখা যায়। মনে হয় মরে যাবে। কিন্তু মরে না। দেহদানও যে একধারা নারী-দয়া, সেকথাও মরদ বোঝে না। এত বড় কাফের। তবু তার উপর মায়া হয় কেন, সতী সেই ধন্দ বুঝতে পারে না। কান্নার তৈরি এই দেহে কেবলই করুণা ছলছল করে। সন্তানে করুণা, তালাক খেয়েও অবৈধ পাপে ভেজা চোখের পানির করুণা স্বামীতে।

তালাকের ঘটনা বড়ই ঝাপসা হয়েছিল, গলার খাদে, লোকে ভাল মতন শুনতে পায়নি। চারু মৌলবীকে সেকথা বুঝিয়ে বলে একটা মছলা চাওয়া উচিত জেনেও সতী চাইতে পারে না। সেটা এক আশ্চর্য বাধক মানে মন। বাপ-মা নেই। ছেলেবেলায় খেয়ে ফেলেছে। নানীর কাছে মানুষ। মানুষ হতে না হতে নিকে। তারপরই নানীও চলে গেল। নানী মরে যাওয়ার পর থেকেই সে কাঁদতে শিখল। প্লুতস্বরে টেনে টেনে মাঝরাত্তিরে কেঁদে ওঠা একাকী নিশুতির পর্দায়। সেই একটা স্বভাব তৈরি হল। এই কান্না সকলের চেনা হয়ে গেল। কোন প্রেতাত্মা বা জিনপরী কাঁদে না। মানুষই কাঁদে। মানুষের অভ্যস্ত কানে কান্নার সুর স্বাভাবিক গ্রাম্য রাত্রির আর্দ্র ভাষা হিসেবে গণ্য হয়ে গেল।

প্রতিটি গাঁয়ে এমন একটা কান্নার কল থাকে, নরম আত্মা থাকে, ঝোরা কুম থাকে, উদ্গত বুঝিবা অকারণ রোদন থাকে। মানুষ জানে। সেই কান্নার

প্রতি মানুষের দয়ালু মন উৎকর্ণ হয় একদণ্ড, মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ চলছে, চলবে। কখনও থামবে না। রোজ কেয়ামত অবধি এই কান্না ভেসে যাবে। এইভাবে কেঁদে বেড়াতে বেড়াতে সতী কান্নাকেই করল জীবন-অস্তিত্বের আশ্রয়। লোকেরা মেনে নিল এভাবে যে, সতীর কান্নার অধিকার আছে, অন্যের জন্য কেঁদেকেটে দু'মুঠো অন্নের সংস্থানের দাবী আছে। আশপাশের পাঁচটা গাঁয়ের মানুষও সে কথা জেনে গেল। সেই সুবাদেই সতীকে লগড়া-জল যেতে হয়েছিল গত সন্ধ্যায়। এ যেন এক কান্নার অদ্ভুত ঠিকেদারী সেকথাও ভাবছিল সতী। কোথায় কতটা কাঁদতে হবে তারও একটা হৃদয়গত মাপ আছে। সেটা মন বুঝে, শোকতাপের বহর বুঝে স্থির করতে হয়।

সামনে চাইল সতী। রোদ আসছে না। কিন্তু সামান্য ঈষৎ তরল হয়েছে মোহ। দূরে দেখা যাচ্ছে কী যেন একটা নড়ন্ত বস্তু হয়ত এদিকে সরে আসছে। সরু চোখে বুঝতে চায়, কী নড়ন্ত ঝোপের মতন জিনিসটা? মাথায় তারস্বরে কাকটা ককায়। কাকটা কী খবর এনেছে আজ? এত চেঁচাচ্ছে যে কানের পর্দা দহকাচ্ছে। নড়ন্ত বস্তুটা ধীরে ধীরে খোলসা হচ্ছে। অবয়ব রেখা চোখে চেনা লাগে। ক্রমশ চেনা যায় গাড়ি। গরু-গাড়ি আসছে। কালো দুটি মোষকে এতক্ষণ দেখা যায়নি, মনে হচ্ছিল দুটি কালো প্রকাণ্ড ঢিবি গাড়ি টেনে আনছে। মোষের রঙও নীল। মোষ দুটি বিখ্যাত।

বুকটা ছ্যাঁতায় অসম্ভব। অদ্ভুত শংকায় চোখের তারা কেঁপে ওঠে। সতী ভয় পায়। সুখদেবমাটির রাঙাবুবু বাপের বাড়ি যাচ্ছে। তাহলে কি সর্বনাশ হয়ে গেল! ভাবলেই গলায় কান্নার দলা পাকিয়ে বুক মোচড়ায়। এমন সর্বনাশ প্রাণে ধরে সতী চায়নি। খোদা জানে, রাঙাবুবু কত ভাল মানুষ। কত নরম। কান্নার সংকটে আপদে পড়ুক কোন সহজ অবলা, সেই কামনা কখনও করে না সতী।

সতী, তুমি সত্যিই কি কর না? সতী নিজেকে শুধায়। মাথার উপরের পাখিটাকে ফের হা-হুস করে। দূরে নদী পাড়ে এক ঝাঁক মাছরাঙা উড়ছে, ঠোঁটে নিশ্চয়ই সাদা কুচি মাছ ছটফটাচ্ছে। সেদিকে চাইল না সতী। তার ভয় করতে লাগল। সে আরো দ্রুত হাঁটতে লাগল। পায়ে ধুলোর ছাপ। পরণের কাপড়ে মধুর আঠা। গতরে চিটেল বাস। রাঙাবুবু কাঁদবে কেমন করে? লোকে কি বিশ্বাস করবে? রাঙাবুবুর স্বামী জড়িবুটি করে, গাছড়ার ওষুধ বানায়, তাবিজ কবজ করে এখন, এই সবই এই মৃত্যুর পক্ষে সন্দকর। লোকে জানে লেবাস মণ্ডল ধূর্ত, কুটিল, স্বার্থ-সেয়ানা পাজী লোক। সব পারে।

একলা একলা ভয়ে সিঁটিয়ে যায় সতী। লেবাস কি নাদিরাকে বান মেরেছে? লোকে সেইরকমই বলে। লোকে সব সময় মিছা বলে না। এই

যে দিশেহারা তাজ্জব ঘটনা সে কথা কি ঠিক ? রাঙাবুবু মুখ খুলে কখনও সেকথা স্বীকার করেনি। কেবল কেঁদেছে। সেই কান্নাও সন্দকব। ভাবতে ভাবতে হাঁটতে হাঁটতে পায়ে হোঁচট খায় সতী। লেবাস মণ্ডলের শালীর নাম নাদিরা। রাঙাবুবুর বাপের দ্বিতীয় পক্ষের মেয়ে নাদিরা। তাহলে ঘটনা কি দাঁড়াচ্ছে ? না, ওরা দুই বোন। দুটি বোন মাত্র, আর কোন সন্তান-সন্ততি নেই তাদের বাপের। সব সম্পত্তির আধাআধি সমান সমান ভাগ। এ কারণে লেবাস চাইত না নাদিরার শাদী হোক। বলত, তার নাকি বর পছন্দ হচ্ছে না। ভাল বর। সাধের শালীর তোফা বর। এম. এ পাশ বিলাত পড়া বর। ডাক্তার বর। বি.ডি.ও. বর। চাইত ব্যালেষ্টার ( ব্যারিষ্টার ) বর। এই রকমই মুখে আলকাপ করত লোকটা। সেকথা রাঙাবুবু রোজই কেঁদে কেঁদে বলত। কেন বলত ? না তেনারা হলেন দুই ভগিনী। শুধুই কি এ-কারণে কেঁদে কেদে বলা, যখন নাদিরা বিছানাগত হয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে, দুলা ভাইয়ের খাটে জড়িবুটি হেকিমী দাওয়াই খাচ্ছে আর ক্রমশ ম্লান হয়ে যাচ্ছে, গলায় মিয়ানো ক্ষীণ মৃত্যুর গন্ধ। সবই দেখেছে সতী। তখন সতী কী যে দুর্বোধ্য একটা কামনা করেছে, সেই জানে। সে কথাও ভাবল এখন সতী। দেখল কাকটা দক্ষিণ পাড়ার দিকে উড়ে যাচ্ছে। নাদিরা দুলাভাইয়ের সংসারেই বাস করত বছরের বেশির ভাগ সময়। কেন থাকত সে খুব গুহ্য কথা। নিজেকেও এখন সেকথা শোনাবে না সতী। পায়ের ছাদ আরো দ্রুত করে লয়কারীতে পেঁছায় সে। গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। গাড়ির পর্দা ফাঁক করে রাঙাবুবুর করুণ মুখ, শান্ত দীঘল বিষন্ন চোখ উঁকি দেয়। ডাকে – আয়।

সতীর বুকের ভেতরটা কানাতে কানাতে সিরসির করে। তার চোখে অপরাধের নীরব লজ্জা কেন আসে নিজেও সম্পূর্ণ স্পষ্ট নয়। মনে হয় রাঙাবুবুর ঐ দুটি প্রশান্ত সরল দুঃখী চোখের সামনে সতী পাপী। সতী চোখ নামায়, মাথা নিচু করে। রাঙাবুবু ডাকে—আয় না, আয় !

রাঙাবুবুর চোখে মৃত্যুর খবর লেখা আছে কিনা দেখতেও সাহস হয় না। আবার বুবু যে তাকে অমন কাঙালের মতন ডাকছে, তার কী হবে ? অথচ এমনই একটা ঘটনা কল্পনা করত সতী। ভীষণ সেই দোষী মন যা কল্পনা করত আজ সেই রকমই বুঝি ঘটে যাবে। কাকটা আজ কোথায় বসে দেখা যাক। সতী দক্ষিণপাড়ার দিকে চাইল। কোথাও কাকটাকে দেখা যাচ্ছে না। হাহাকার করা বিমর্ষ কর্কশ কাক, কুপক্ষীর সরদার, নষ্টপাপ, মহামরণ, কোথায় যে গেল ? দেখা যায় না কেন ? সহসা সতীর চোখ উত্তরপাড়ার আপন কুটিরে গিয়ে লাগে। আপাদমস্তক শিহরিত হয়, বুকের কলিজা লাফিয়ে গলায় উঠে আসে।

কান্না নানান ধরণ হলেও, সতী নজর করেছে, মূলে দুইধারা। কান্না না

হওয়ার কান্না আর বে-আগল কান্না হয়ে যাওয়া কান্না। একটা হতে পারছে না, গলতে পারছে না, জমাট বাঁধা আটক কান্না, অন্যটি বাঁধ না-মানা আকুল ঢালু ফোয়ারা। একটাকে হওয়াতে হয়, আটককে মুক্ত, জমাটকে ভাঙতে হয়, তার জন্য বেশুমার আঘাত করে কাঁদতে হয় সতীকে। যেমনটা সে লগড়াজলে কেঁদে এল! মিঞা বউ নিঢাল নিথর বোবা হয়ে গিয়েছিল সন্তান শোকে, জোয়ান ছেলের মৃত্যুতে এমন আকাট হয় মানুষ, কিসে যেন আশ্চর্য বুক খামচে ধরে কাঁদতে দেয় না, গলায় বরফ চাপা থাকে। তখন সহসা আচম্বিত শুনশান আগড় যেন বা, মূর্তির সামনে ঝড় তোলে গলায়, নানান ভাষায় কাঁদতে শুরু করে সতী। তার হাজার এক কান্নার বয়ান মুখস্ত আছে, উননাসিক নানান স্বর আয়ত্ত আছে, চন্ডরোখ আর মায়া ভাষার মীড়ে মীড়ে। যথা—সাধের স্বাদ, পরানের পরান, জানের জান, চোখের তারা, কলিজার টুকরো, নয়নের পুতলি, বেহেস্তের মেওয়া, নাড়ির ধন, কব্বরের কাফন, পুলসেরাতের বুররাক, আদরের ভাইজান আবুরে। তুই ভাই কুতায় গেলিরে!

আরো আছে নানা ঠমক গমক গন্ধিলা বয়ান। আছে সুদীর্ঘ পরিভাষার তীব্র উষ্ণতা, স্ফটিল স্বাদু রোদন। সেই মর্মাঘাতে গত রাতে মিঞা-বউ কাঁদলে সহসা উচ্চকিত, তখনই গলন শুরু হয়। অপর পক্ষে কান্না থামানো সহজ। সহসা কেঁদে উঠে এমন মর্মপীড়ণ দিতে হবে যে চমকে উঠে স্তব্ধ হবে, জুড়িয়ে আসবে শোক-পিন্ড, হুঁশ আসবে। বলতে হবে চোখের জল এক মস্ত পারাবার। তোমার অমুক, আমার তমুক, সেই সমুদ্দরে ভেসে যাবে, পার পাবে না, সেই আত্মার সামনে এই অশ্রুপাত করলে তাকে কেবলই নিরুদ্দেশে ভেসে বেড়াতে হবে। তুমি থামো। নিজেকে মোচন কর। আমিও আর কাঁদব না। যে যায় সে তো আর ফেরে না। কাজটা অপেক্ষাকৃত সহজ।

কিন্তু গত রাত্রে একটা তীব্র ফিনিক দিতে গিয়েই প্রথম গমকেই সতীর গলা ফেঁসে গেছে। বুকে এমনই চাঁড় খেয়ে গেল যে তীব্র ব্যথা হচ্ছে। মনে হচ্ছে সে আর কাঁদতে পারবে না। দেহ বিকল। তাবত কোষ শুষ্ক। স্বর ফুটবে না, গলার নালী খরা। বুকে জোর না পেলে তো কাঁদা যায় না। কান্না এক ধরণের ভার, যা গলায় তোলা বিষম শক্ত, দেহের এক ঘনিষ্ঠ দুর্বহ ক্রিয়া। একটা দামী রিহার্সিল (অনুশীলন)। একটা চর্চা, সেকথা নিজ ভাষায় মনে মনে জানে সতী। নইলে সে এতদিন এক নাগাড়ে কাঁদছে কী ক'রে! অথচ তাই কি পুরোপুরি? নিজেকে আজ প্রশ্ন করল সতী! কাকটাকে দেখল তার কুটিরের চাল-মুকুটে চুপচাপ নৈঃশব্দে খড়ের কাকের মতন ব'সে আছে। ডাকছেও না। পর্দা তুলে সতী গরুগাড়ির ছইয়ের তলায় গিয়ে ঢুকল। রোদ উঠেছে।

গাড়িতে তাবত পথ কোন কথা নেই। অসম্ভব ভয় করছিল সতীর। বুকে

জোর নেই। কেমন আঁকড়ানো ব্যথা করছে। গলা ফেঁসে গেছে। এই অবস্থায় সে কাঁদবে কেমন ক'রে ? নাদিরা কি ম'রে গেছে ? ঠিক সে কারণেই কি বুবু এত চুপচাপ অকাট্য নিঃসাড়তায় স্থির ? বুবু যে তাকে 'আয়' ব'লে ডাকল, সে তো উচ্চারে নয়, চোখের তারায়। বুবু কি কথা বলবে না ?

যে শালীর সঙ্গে খারাপ গুহ্য সম্বন্ধ ছিল ব'লে লোকচর্চা ছিল, সেই সাধের সাদ শালীকে এভাবে নষ্ট করল কেন লেবাস মণ্ডল সেটা এক ধন্দকর অবস্থাই মানুষের। আর এই ধারা কুআচারী স্বামীর বউ কী অবস্থায় দিশে হারায়, কী ক'রে কাঁদে আর সব ঘটনার জন্য নিজেকে দায়ী করে, তারই মূর্তিমতী হ'লেন রাঙাবুবু। সেই বুবু কথা কয় না সারা পথ। পর্দার সামান্য ফাঁকে চোখ মেলে কোথায় যাচ্ছে কোন গহনতায়, কিসের বিবাগের বেদনায়, খোদা জানে। মানুষ জানে, বুবু যাচ্ছে সুখদেবমাটী। আর কিনা সতী এই ধরণের একটা ছইগাড়ির ঢুকুর-ঢুকুর পথ চলার মন্থর কল্পনা করেছিল মনে মনে। চেয়েছিল নাদিরা মরে যাক। অত সুন্দরী হুরিপানা রূপ, পটল-চেরা চোখ, লম্বাদাম ঘন কালো গোছাগুছির চুল, ফর্সা ধবলিমার নরম প্রতিমে ম'রে যাক, একটা কাক উড়ে আসবে নিশ্চয়, এমনই কল্পনা করেছিল সতী। কিন্তু কেন করেছিল ? হায় ! এখন যে সে উচ্চারণ ক'রে কাঁদতেও পারবে না।

ভাবতে ভাবতে গাড়ি চলতে চলতে সন্ধ্যা হয়ে আসে। সন্ধ্যার মুখে বুবু সামান্য কথা কয়। একজোড়া রাঙা জামা-প্যাণ্ট সামনে রেখে বলে—নে। আঁচলে বেঁধে রাখ সতী। তোর বাচ্চার কাপড়। সাতদিন আগে হাট থেকে কিনে আনিয়েছি।

এমন দান-ধ্যান অল্পবিস্তর করে রাঙাবুবু। এটা তার আত্মীয়তার ধরণ। তারপরই রাঙাবুবু বললে—আমি পারব না। আমি পারব না কাঁদতে সতী। আমি কাঁদতে পারি না রে! মণ্ডলজী নাদিরাকে গুণ করেছিল, পরে বান মেরেছে। আমরণ আমি জ্বলব। ধুঁকে ধুঁকে ম'রে যাব চুন্নুর মা। তুই কাঁদবি তো ? ভাল ক'রে কাঁদিস বহিন। আমি তোকে আরো দেব। কস্তাপাড় শাড়ি, বুটিদার ব্লাউজ, হাওয়াচটি সব দেব সতী। বল্ তুই ? নিংড়ে নিংড়ে কাঁদবি। ঝুরে ঝুরে কাঁদবি। আমাকে দহকাবি, কলিজা পুড়াবি, শাপ দিবি। বল্ না, বল্ !

বলতে বলতে কাঁদবার চেষ্টা করল রাঙাবুবু। কিন্তু গলায় কেমন একটা বিদ্ঘুটে স্বর বের হল। কান্না হয় না। কান্নার উদ্দেশ্যটাই কেমন ঠাট্টা ঠাট্টা লাগে। আসলে বড়লোকেরা কাঁদতে পারে না। তাদের এই অভিজাত অক্ষমতা আরো বেশি বিদারক, আত্মমানহীন। সেকথা সতী নিজের ভাষায় বোঝে। তখনই সতী কেমন ভয় পায়।

গাড়ি এসে বাহির-উঠোনে দাঁড়াতেই নাদিরার জান কবজ হয়। নাভিশ্বাস আগেই উঠেছিল। মুখে ফেঁপরা উঠেছে। চোখ যে ডাকরায় ধরা, ফেটে বেরুচ্ছে, মেয়েটা শুকিয়ে শুকিয়ে ম'রে গেল। সতী কান্না শুরু করল। নিজেকে আছাড়িপিছাড়ি করল। বুক থাপড়াল। মাতম করল। দহকাতে লাগল। চোখের পাতা ভিজিয়ে তুলতে কী বিষম যুদ্ধ করতে হ'ল তা তার খোদা ছাড়া কেউ জানে না। চক্ষু দিয়ে যেন লহু বার হয়। তারপর সম্পূর্ণ নিঃস্ব হ'য়ে গেল সতী। গলা সম্পূর্ণ ব'সে গেল। বুকে খোঁচা খোঁচা ব্যথা। মুখের ভাষাও তার ফুরিয়ে গেল। সে বোবা হয়ে গেল।

কান্নার একটি স্থায়ী ঠিকানার সন্ধান করেছে সতী কতকাল যাবত। কারণ সামান্য দু'মুঠি অন্নের জন্য তামাম দিগর ছললড়ি ক'রে তন্নতন্ন মৃত্যু খুঁজে ফেরা, দেহ মুচড়ে মুচড়ে বুকে ঘা মেরে মেরে কাঁদা আর সহ্য হচ্ছিল না। একটা কোন স্থির কান্নার বসতি চাইছিল! এমন ভ্রাম্যমান কান্না সে কাঁদতে পারছিল না। এমন মানুষ সে চাইছিল আর এমন মৃত্যু যা দীর্ঘতম কাল শোকের আঘাত পায়, সতীর কান্না যার কাছে জরুরী হয়, বিনিময়ে খেতে পরতে দেয়। রাঙাবুবুকে তার তেমনই মনে হ'য়েছিল। নাদিরাকে কী ভালই না বাসত। তার তো কোন ছেলেপুলে হয়নি। বোনটাই ছিল মেয়ের মতন। মনে হ'ত, বোনের যদি কোন অপঘাত হয়, তাহলে রাঙাবুবু বাঁচবে না। সারাজীবন ভুকরে ভুকরে কাঁদবে।

যখনই সতী তার বুবুর সামনে নানান কিসিমে দমকে-গমকে বিচিত্র বয়ানে বর্ণনা করবে নাদিরার রূপ আর গুণপনার কথা, তখনই রাঙাবুবুর কাতরতা আসবে, চোখে ঘনিয়ে উঠবে পানি। দুখ-জাগানিয়া একটা ক্ষতস্থান থাকবে বুকে, সেখানে নিয়ত খুঁচিয়ে দেবে সতী। সেটাই হবে কান্নার স্থায়ী জমজম। সেই স্মৃতি করুণাকে ভাঙিয়ে খাবে চুন্নুর মা। তাই তো সতী, নাদিরাকে চেয়ে দেখত আর ভাবত এই সুন্দরীর অপঘাত হোক। সে-কারণেই কি লেবাস মণ্ডল শালীকে বাণ মারল? সতীর মনে হচ্ছিল তারই কান্নার শাপে বেচারি নাদিরা ম'রে গিয়েছে। পান্তাভাত খেতে খেতে পরের দিন ভোরবেলা দুই চোখ ঝাপসা হ'য়ে যাচ্ছিল। চুন্নুর মাকে নাদিরা অত্যন্ত আকুল গলায় শুধিয়েছিল, এই তো সেদিনের কথা। বলেছিল

—আমি ম'রে গেলে তুমি খুব কাঁদবে তো সতী? একটু কেঁদে শোনাও না বুবু, কেমন লাগে শুনি। তোমার কান্না আমার খুব ভালো লাগে, চুন্নুর মা। খোদার কিরে।

সবই মনে পড়ছিল সতীর। কিন্তু সে কিছুতেই কাঁদতে পারছিল না। রাঙাবুবু কাছে এসে গা-লাগা বসল। চাপাসুরে বলল—অত হাপুস-হুপুস

খাচ্ছিস কেন সতী, নিঃসাড়ে খা। লোকে কী ভাববে? ভাববে, তুই আমার ভাড়া-করা লোক। তা যতটুকুন কাঁদলি, তাতে অমন ক'রে হাপ্‌সে পান্তাগেলা ঠিক নয় সতী।

শুনতে শুনতে গলায় ভাত আটকে গেল। এমন কথা মুখ ফুটে বলতে পারল বুবু? কেউ কি কারো জন্য কাঁদতে আসে এই দুনিয়ায়? তাই কি এসেছে সে? মনে হ'ল নাদিরার জন্য ভাড়া খাটতে এসেছিল কোন একটা কান্নার কল। হবেও বা। রাঙাবুবুর মন ভেজেনি। সতী যা খাচ্ছে, সব বিষ। কারো দুঃখের সমভাগী হওয়া কি ভাড়া খাটা? রাঙাবুবুকে যেন মানুষ ব'লেই চেনা যায় না। কান্নার এই স্বভাবটা কি বেহায়া! নলবাটার করীম মিঞা বা আমচানপুরের আলম মুন্সীও এমন ক'রে বলেনি। নিজের এই কান্নাময় দেহকেই দায়ি করে সতী। দায়ি করে নীল কু-পক্ষীকে। নানীজানকে। অদ্ভুত কান্নার তাড়না আর পেটের দুঃখকে। হায় সে কাঁদে কেন?

রাঙাবুবু তখনও বলে যাচ্ছে—তোর মায়া-দয়া নেই চুন্নুর মা? তোর রহম নেই? এমন ক'রে মেপে মেপে কাঁদিস তুই? আগে জানলে তোকে সঙ্গে নিতাম না।···

—সতী ভাত খেতে পারে না। উঠে পড়ে। আশ্চর্য লাগে, রাঙাবুবু কেমন রেগে আছে। এমন ক'রে রাগ করছে কেন? নিজে কাঁদতে পারছে না ব'লেই কি এত রাগ! একথা লোকে শুনলে মাথা কাটা যাবে। রাঙাবুবু কানে কানে বলল—নে, নাড়িতে জোর এল, এবার আমার মুখ রাখ সতী। কেঁদে কেঁদে আমার স্বামীর পাপ মুছে দে দুঃখী!

সতীর আর এক নাম দুঃখী। সতী দেখল, কেবলই পাপের ভয়, স্বামীর জন্য নিতান্ত মায়া, সম্পত্তির লোভ রাঙাবুবুকে করেছে কী রকম কঠোর আর সন্ত্রস্ত, রাগী, আর কাঁদতে না পারার ভয়ে কী কাতর!

লাশ ধোয়ানো হ'ল, জল সাবান দিয়ে ধুইয়ে সেই লাশ স্পর্শ করল সতী। গোপন গা ছুঁয়ে, লাশের করুণ চোখ ছুঁয়েও তার বুকে জোর এল না। কথা দিয়েছিল কাঁদবে। কেঁদে শুনিয়েছিল কাঁদবে (সে দিন কাঁদতে গিয়ে ভয়ানক লজ্জা পেয়েও নাদিরার জোরাজুরিতে সুর করেছিল), ঠিক সেই সব ভাষা মনে পড়ল। সে কাঁদতে গিয়ে হেসে ফেলেছিল। এবং এই ঘটনার পরে একলা একলা কেঁদে ফেলেছিল। সবই মনে পড়ল। এত ক'রেও এক ফোঁটা কাঁদতে পারল না। রাঙাবুবুর চোখের বাইরে চলে এল।

হঠাৎ অহেতুক এসময় মনে পড়ল, কুপক্ষীটা তারই চালে ব'সেছিল গতকাল সকালে। তার বাচ্চা, চুন্নুর গায়ে বেদম জ্বর, হুঁশহারা ছেলেকে সে পরের কাছে রেখে এসেছে।

বিদায় নেবার সময় জানালার কাছে গিয়ে ঘরের মধ্যে চোখ ফেলল সতী।

রাঙাবাবুকে ব'লে চলে আসবে, হাঁটা দেবে দীর্ঘ পথ। কিন্তু গলায় স্বর নেই, একি, দেখলে ভেতরে, রাঙাবাবু তার স্বামী লেবাস মণ্ডলের সঙ্গে কী কথায় চোখ পাকিয়ে মৃদু তরল গলায় হাসাহাসি করছে। দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে এসে পথে নামল চুন্নুর মা। আসার সময় আঁচলে ছেলের জন্যে দু'খানা হাত-রুটি বেঁধে নেওয়ার ইচ্ছা হ'ল। কিন্তু পারল না। কোথায় যেন বাধল খুব।

ক্ষীরসাতলায় এসে সতী পাশে বহমান ক্ষীণ-স্রোতা নদীকে ও কুমোর-কাটা নদীর পাড়কে চেয়ে দেখে দাঁড়িয়ে রইল। মনে পড়ল পাড়ের গর্তে নেমে গেলে একটা কাহিনী মনে পড়ে। ছেলেবেলা থেকেই ঐরকম হয়। রাজার ছেলের দু'কান কাটা। পাগড়ি বাঁধা থাকত সবসময়। নাপিতই কেবল সেই কানকাটা মাথার চুল কামাত আর দেখত যে রাজপুত্রের কান নেই। রাজা সেই নাপিতকে বখশিস দিয়ে ব'লেছিল—রাজপুত্রের কান নেই সেকথা কারুকে ব'লো না। বোকা আর পেট-পাতলা নাপিত এমন অদ্ভুত ঘটনা পেটে চেপে রাখতে না পেরে একটা বড় গর্তের কাছে উবু হ'য়ে বসে চুপিচুপি পেটের কথা উজাড় ক'রে ব'লেছিল—রাজার বেটার দু'কান কাটা।

তারপর সেই গর্তের মাটি এনে কুমোর হাঁড়ি বানাল। হাটে গেল সেই হাঁড়ি। যেই মানুষ সেই হাঁড়ির বাজনা শুনে হাঁড়ি ফাটাফুটো কিনা পরখ করতে যায়, অমনি শোনে হাঁড়ি কাঁদছে—রাজার বেটার দু'কান কাটা। কুমোর যতই হাত-টোনা দেয় হাঁড়ি ততই কাঁদে।

এটা একটা মজার গল্প। নদী পাড়ের গর্তে নামলেই মনে পড়ে। সতী নেমে প'ড়ে উবু হ'য়ে মাটিকে নিঃশব্দে বলল—মা গো! লেবাস মণ্ডল নাদিরাকে বান মেরেছে, মা। মা বসুমতি, তুমি শুনে রাখো মা, আমি ভাত খেনু, কিন্তুক কাঁদতে পারনু না। বান মারা, গুণ করার কথা তুমি পেটে রেখো মাজান। আমার নালিশ মা, রাঙা বহিন পাষাণ। এই কথাটুকুন হজম ক'রো মা-খাকি। (খাক অর্থ মৃত্তিকা, সেই বিচারেই মা-খাকি।) সবাই শুদুবে এই চুন্নুর মাকে, কী হ'য়েছিল র‍্যা? বলতে গেলে, জননী, এই সবই বলতে হয়। তুমিই বোঝেন মা, গলা কেমন শুকিয়ে যায়।

বলতে বলতে এদিক ওদিক সতর্ক চোখে চাইল সতী, তারপর গর্ত ছেড়ে উপরে উঠল। হনহনিয়ে হাঁটতে লাগল। আপনমনে বলল—আমি পাগল। তারপর পথে একলা হিহি করে হেসে উঠল। পায়ের গতি বেড়ে গেল। ফিসফিস করল—থাকো বাপধন। থাকো। আসচি সুনা। ময়না-মানিক-জাদু!

একলা একলা বক্তৃতা করতে করতে চলল সতী, যা শোনা যায় না। তাবত দিন পায়ের তলায় কাবার হ'ল তার। সন্ধ্যার মুখে লালঝাণ্ডা পার্টির

অফিসতলা দিয়ে পথ ভাঙছিল। দেখল, অফিসের প্রকাণ্ড ছাতে লোক জমেছে খুব। একজনকে শুধিয়ে জানতে পারল, কে একজন দামী কর্মী খুন হ'য়েছে অন্য দলের হাতে। তারই শোকসভা হবে। দেখল, পার্টি অফিসের চারপাশে সান্ধ্য কাক ঘোরাফেরা করছে, মাঝে মাঝে ডাকছেও মৃদুমৃদু। আর একজনকে শুধিয়ে জানতে পারল, কর্মী নয়, ইনি একজন গণ্যমান্য নেতা, তাই অত লোক ধরছে না।

বাড়ি এসে সতী দেখল, চুন্নু এন্তেকাল করেছে।

চোখে কিছুতেই জল আসে না। সতী বুঝতে পারে, কাঁদবারও শেষ আছে। পথশ্রান্ত অবসন্ন সতী বুঝতে পারে, কান্না একধারা দৈব-শক্তি। যা দেহ থেকে নিঙড়ে বার হ'য়ে গেছে। দেহ না কাঁদতে পারলে, চোখ কাঁদে না।

অতএব ছেলের জন্য কাফন লাগবে। পার্টি অফিসে দৌড়য় সে। সবাই তখন কাঁদবার জন্য তৈরী। শোকে মুহ্যমান। স্তব্ধ সব। সারিবদ্ধ সবাই। একপাশে দাঁড়ায় গিয়ে সতী। দেখে কেউ শব্দ করছে না। মৌনী সভা। কান্নার কোন ধ্বনি নেই। এদেরও কি চোখের জল ফুরিয়ে গেছে! সহসা সতী ডুকরে ওঠে শুকনো গলায়। তারই ছোঁয়ায় সারিবদ্ধ মানুষেরা হিস্ হিস্ করে। মনে হ'ল সব হিস্‌হিস্ করা ধ্বনি কোন একটা পুরনো জানোয়ারের চাপা থ্যাঁৎলানো রাগীল স্বর। মানুষ কাঁদতে জানে না। তথাপি কাফনের দাম পায় সতী। তখন মনে হয়, মানুষ তার কান্নার ধারা বদলে ফেলেছে। রাঙাবুবু যে তাকে বকাবকি করছিল, ওটাই তেনার কান্নার পুঁথি-কেতাব।

দুঃখিনী মেয়ের দিকে চেয়ে কমরেড রতন বক্সী অন্তত কেঁদে ফেলে আকাট ঠাট্টার গলায় নিজে নিজে। কেননা কিছু মানুষ বাস্তবিক ঐরকম কাঁদে। ফলে সতী দাম পায়। কাফন পরায় ছেলেকে। মানুষ দ্যাখে, সতী কাঁদছে না। একজন বুড়ো বলে—কাঁদ্ মা, কাঁদ্। পরের জন্যি এত কাঁদিস, নিজের বাছার জন্যি চোখে পানি নাই তোর?

সতী তথাপি কাঁদে না। মনে হয় ম'রে গিয়ে চুন্নু ভালই করল।

রাত্রে একলা শুয়ে থাকে সতী। হঠাৎ লক্ষ্য করে, তার তলপেট আশ্চর্য রকম কাঁদছে। যেমন ক'রে কাঁদে শুখা মাঠ, বৃষ্টি আর বিছনের জন্য। চুন্নুর জন্যই কাঁদছে তলপেট, বুকের স্তন। সর্বাঙ্গ। গভীর রাতে কান্নার কল প্লুতটানে খুলে যায়, নক্ষত্রর দিকে ছুটতে থাকে কান্নার রেণু-প্রবাহ। রাঙা জামা প্যাণ্ট সতী গুছিয়ে রাখে। খোকা এসে প'রবে ব'লে। সব শুকায়। কিন্তু তখনই দেহী জমজমে কান্নার পানি ফিরে আসে। কুপক্ষী

আসে ভোরের আকাশে। সে-কথা সতী তলপেটে টের পায়। সতী চোখ তোলে। কাঁদে।

রাতে নিবিড় নিকষ আঁধারে সেই প্রত কান্না সতীর স্বামী শোনে। শুনতে শুনতে বুঝতে পারে, সে আর স্থির থাকতে পারে না। হবা (ঈভ)-র কান্নার মতন শোনায় সতীর গলা। শোনে কোন এক পুরনো আদম। লোকটা তখন খলখল ক'রে হাসতে থাকে কয়রা বউয়ের পাশে শুয়ে কাছারি পাড়ার সিঁথানে।

একটা অদ্ভুত রহস্যময় দরিদ্র ভবঘুরে কৌপিন-কষা ক্ষেতমজুর হেঁপো, ভয়ানক পদবিক্ষেপে কান্নাকে অনুসরণ ক'রে সতীর উত্তরপাড়ার কুটিরের দিকে হেঁটে আসতে থাকে। আশ্চর্য! সেই লোকটাও অন্ধকার পথে দাঁড়িয়ে পড়ে এক-আধবার, একটুখানি। আকাশে চোখ তুলে হেতুহীন কান্নায় ভেঙে পড়ে। শুনতে পায় নক্ষত্র থেকে জল গড়িয়ে নামছে, দেখতে পায়।

আবার লোকটা হেঁটে আসতে থাকে। সতী কাঁদে।

তামাম নিশিকাল।

চুন্নু আর নাদিরার জন্য।

---